আল মাহমুদ ও অন্যান্য

তৌফিক জহুর

আমাদের নব্বই দশকের বাংলা সাহিত্য সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধময় আলোকিত দশক। বাংলা সাহিত্যে এত কবি এর আগে আর কখনো আসেনি। কথাসাহিত্য-গল্প-অনুগল্পও এ দশকে চর্চা হয়েছে বেশ। তবে প্রবন্ধ চর্চা এ দশকে হয়েছে নগন্য সংখ্যক মেধাবী তরুণের দ্বারা।

তৌফিক জহুর কবি হিসেবে যতটা পরিচিতি পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি পেয়েছেন প্রবন্ধ লিখে। তার প্রবন্ধের ভাষা, বাক্যগঠনের স্টাইল, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের উত্তর প্রজন্ম তিনি। যিনি কবিতার ব্যাখ্যা করেছেন তত্ত্ব, তথ্য ও কাব্যের রস আস্বাদন করে। যা তরুণ প্রাবন্ধিক হিসেবে তাকে একটি মর্যদার আসনে বসিয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি আল মাহমুদকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। কবি আল মাহমুদের সাহিত্য ভান্ডার আমাদের সামনে বিশুদ্ধভাবে পাখা মেলে দিয়েছে তৌফিক জহুরের ভাষার ঠাস বুননে ও চিন্তার সততায়। আল মাহমুদ গবেষক হিসেবে তাকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়।

প্রতিটি প্রবন্ধে রয়েছে আলাদা মেজাজ ও মননের ছাপ। সমালোচনামূলক প্রবন্ধ হলেও পাঠক শুরু করলে এর রস আস্বাদন না করে থামতে চাইবেন না। এটি আমাদের বিশ্বাস।

-জাকির ইবনে সোলায়মান

.....

প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

স্বচ্ছন্দ প্রকাশন
জিপি.চ- ৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

www.pathagar.com

তৌফিক জহুর

আল মাহমুদ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

© রুহানি চৌধুরী মেধা
প্রচ্ছদ | হামিদুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৩
স্কেচ | গোলাম নবী পান্না
প্রকাশক | জাকির ইবনে সোলায়মান
অক্ষর বিন্যাস | আবুল কালাম আজাদ
মুদ্রণ | আল মাদানী প্রিন্টারস
জিপি. চ- ৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৮৮৫৩৭১৫ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮১৪৯৬১

দাম ২০০ টাকা

AL MAHMOOD O ANYANA | (a collection of prosery) by **Tawfiq Zahur**
published by **Zakir Ibn Solaiman**
Saschanda Prokason
GP. Cha-56/1, Uttar Badda, Gulshan, Dhaka-1212
Phone: 8853715 Fax: 880-2-8814961

Price : Tk. **200** US$ **10** only

ISBN 984-721-024-1

www.pathagar.com

আব্বা আম্মা
আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি

www.pathagar.com

স্বচ্ছন্দ প্রকাশন এর অন্যান্য বই

- সকল প্রশংসা তাঁর # আবদুল মান্নান সৈয়দ
- শেকল কাটে খাঁচার পাখি # আল মুজাহিদী
- মেঘের খামে চুমকি দানা # সাজজাদ হোসাইন খান
- কে আছে কেউ কি আছে # মুশাররাফ করিম
- প্রথম বৃষ্টি # মুশাররাফ করিম
- একটি পাখি ডুকরে কাঁদে # আন্ওয়ারুল কবীর বুলু
- কুসুমে বসবাস # হাসান আলীম
- সুখের নহরে আগুন জ্বলে # শওকত ইসমাইল
- হিজলবনের পাখি # গোলাম মোহাম্মদ
- ঘাসফুল বেদনা # গোলাম মোহাম্মদ
- হে সুদূর হে নৈকট্য # গোলাম মোহাম্মদ
- নানুর বাড়ী # গোলাম মোহাম্মদ
- নির্বাচিত গল্প # কাজী এনায়েত হোসেন
- জাহান্নাম থেকে লিখছি # জাকির ইবনে সোলায়মান
- কাজলী # জাকির ইবনে সোলায়মান
- বিষদাঁত # জাকির ইবনে সোলায়মান
- যে চোখে ধূসর আকাশ # জাকির ইবনে সোলায়মান
- নির্মাণাধীন আলোর টাওয়ার # আল হাফিজ
- ভালোবাসা সব পারে # রফিক মোহাম্মদ
- গাঙচিল মন # সুমন মাহবুব
- ঢেউ ভেঙে যায় # সুমন মাহবুব
- তবু স্বপ্নের পাখিরা ওড়ে # নাসিমা সুলতানা শফি
- পাথর সময় # রওশন আরা বেগম রুশনী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রসংগ কবি আল মাহমুদ ৯
আল মাহমুদের সোনালি কাবিন পুন:পাঠ ১৪
চার বাগানের মালী ২২
সবুজের চাষবাস ৩৪
কাম প্রকৃতি ইতিহাস ও সমাজ চেতনার কাপ্তান ৩৯
আল মাহমুদকে আক্রমণ : কাকতাড়ুয়ার বচন-বিলাস ৪৬
বাংলা কাব্যের দুই গর্ব : শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ ৫০
ঈদ এবং একটি কবিতার গল্প ৫৯
ইকবাল কেন পড়ব ৬৫
অনন্য নজরুল এবং বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গি ৭২
স্ব-কাল ও সকালের গায়ক আব্বাসউদ্দীন ৮৬
আবদুল মান্নান সৈয়দ : বাংলা কবিতার আধুনিক কৃষক ৯৩
আল মুজাহিদী : স্বতন্ত্র এক কবিসত্তা ১০৪
ফরহাদ মজহারের ২০ এবাদতনামার তাফসির ১১৮
কবিতার জন্য জীবন ১২৯
কালের বিপ্লবী কাপ্তান ১৩৯
উত্তর আধুনিকতা ১৫৮
শিল্পের শত্রু শিল্পের মিত্র ১৬৪
প্রসঙ্গ : লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা ১৭২
প্রসঙ্গ কবিতা ১৭৮
আধুনিক সাম্প্রতিক ও আমাদের কাল ১৮২
কবির ভাষা কবিতার কথা ১৮৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসংগ কবি আল মাহমুদ

বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা কবিতার জ্যামিতিক পরিমাপে যে দিক থেকেই আল মাহমুদের কবিতার দিকে রেখাঙ্কন করি না কেন তা কবিতার বৃত্তে সর্বদা নব্বই ডিগ্রি কোণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পঞ্চাশের এই কবিপুরুষ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে কবিতার চাষবাসে আজ এমন এক আসনে উত্তীর্ণ যা তাকে বাংলা কাব্যের অঙনে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে। আজকের আল মাহমুদ একজন কবি, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাঁর কাব্যসত্তা তাকেই খোঁচায়, প্রকাশের জন্য, প্রসবের জন্য। তিনি জীবনানন্দ দাশ নন। কিংবা জসীম উদ্দীনও নন, তিনি আলাদা সত্তার, আলাদা মেজাজের, আলাদা ভাষার এক বাংলাদেশী বাঙালি কবি। তাঁর কবিতায় যে বিষয়-আশয় সর্বদা পাঠকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারে তা লোকজ ঐতিহ্যর চিত্রকল্পময় দলিল। তবে আল মাহমুদের লোকজ বিশ্বাসের মাঝে গ্রাম বিচ্ছুরিত হলেও তা এ সময়ের আধুনিক ঢঙেই রচিত। বাংলা ভাষাকে আল মাহমুদ কবিতায় নিয়ে এমনভাবে রচনা করেছেন তাঁর কবিতার ভাষা জমির জমির কাদা মাটির মতোন নরোম ও সারপূর্ণ মনে হয়েছে। পঞ্চাশের বাংলা কবিতায় ত্রিশকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে নতুন যে আধুনিক ধারা সূচিত হলো যেখানে অনেকেই 'নাইটম্যান' সেখানেই আল মাহমুদ মুখ ফেরালেন গাঁয়ের পথে। যে পথ তাঁর চেনা, যেখানে একজন আল মাহমুদের শৈশবের রাঙাস্মৃতি সবুজ জমিতে বাতাসে দোল খায়। আল মাহমুদ গ্রামে ফিরলেন। কিন্তু লুঙ্গি পরে নয় প্যান্ট পরে। অর্থাৎ আল মাহমুদের প্রত্যাবর্তন তাঁর সময়ে এক বিরাট বিস্ময়। যেখানে সবাই ছুটছে এরোপ্লেনে। সেখানে কবি চলেছেন গরুর গাড়িতে এবং আল মাহমুদ গ্রামের মেঠো পথ বেয়ে চলতে গিয়ে রচনা করলেন : এখন কোথায় যাওয়া যায়?

শহীদ এখন টেলিভিশনে। শামসুর রাহমান

সম্পাদকীয় হয়ে গেলেন। হাসানের বঙ্গ জননীর নীলাম্বরী বোনা

www.pathagar.com

আমার দ্বারা হবে না। জাফর ভাই ঘোড়ার গায়ে হাত বুলান।

অতএব কবির কোথাও যাওয়া হলো না, কেননা ঃ

আমার সমস্ত গন্তব্যে একটি তালা ঝুলছে।

[আমার সমস্ত গন্তব্যে]

আল মাহমুদ লোকজ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যে পটভূমি নির্মাণ করলেন তাঁর কেন্দ্রবিন্দু মানবতা ও আত্মবিশ্বাসের একাগ্রতায় পরিপূর্ণ। আল মাহমুদ খুঁড়তে শুরু করলেন। বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার লোকজ বিশ্বাস। আধুনিক কাব্যকর্মে এজরা পাউন্ড প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক ও চৈনিক সভ্যতার স্মৃতিধারক চিত্রার্পিত বর্ণলিপি ব্যবহার করে সেগুলোর রূপকল্পকে শ্বাশত চৈতন্যের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল মাহমুদ সেখানে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে যতোটা প্রয়োজন গ্রহণ করেছেন, বাকি সব তাঁর কবিতার মূল উপাদান এ অঞ্চলেরই ইতিহাস, ঐতিহ্য.

i. ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ-

তুলে মিশে যাই চলো আকর্ষিত উপত্যকায়

ii. বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ, ধানের দোহাই

দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর

লাঙল-জোয়াল কাস্তে বায়ু ভরা পালের দোহাই

হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।

পৃথিবীর ইতিহাসে একজন মিল্টন, একজন এলিয়ট, একজন ব্লেক, একজন বায়রন কিংবা একজন ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর কবিতায় যে ধরনের ভাবগাম্ভীর্যতা, ধর্মমুখিতা এবং সরাসরি ধারাকে অবলম্বন করে কবিতা রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের কবিতায় আল মাহমুদের ইদানীং কালের কবিতা সে সাক্ষ্য দেয়, একজন কবির একটি দর্শন থাকা চাই তাঁর কাব্যে। কবিতার বিষয়ে যদি ভাবগাম্ভীর্যতা, দিক-নির্দেশনা না থাকে তাহলে একটি কবিতার গতিপথের আয়ু বড়জোর এক ঘন্টা কিংবা বড়জোর ছেঁচড়িয়ে একদিন। কবিতার মাঝে যখন সুস্পষ্ট দিক-দর্শন উপস্থাপিত হয় এবং কবি কি বোঝাতে চাচ্ছেন তা যখন পাঠকের ইন্দ্রীয় বুঝতে সক্ষম তখন কবি আর পাঠকের বোধের মাঝে কোনো তথাকথিত দেয়াল থাকে না।

কবি ক্রমশ হয়ে ওঠেন আস্থাশীল এক কাপ্তান। পাঠকের স্থির বিশ্বাস জন্মে যায়, এই কাপ্তান আর যাই হোক গতিপথে ঠিকই চলবে এবং নির্দিষ্ট বন্দরে না পৌঁছানো পর্যন্ত জাহাজ ডুববে না। কবি আল মাহমুদ বাংলা কবিতাকে নিয়ে সাহিত্য সাগরে নেমেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আল মাহমুদ জাহাজের গতিপথ বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন দিকে পরিচালনা করেছেন। কিন্তু আল মাহমুদ এক সময় থামলেন। আবার

www.pathagar.com

চলতে শুরু করলেন একই গতিপথে তবে চলার গতি এবার দ্রুত। তাঁর কবিতা সহসা বাঁক নিলো। জাহাজ আকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে এমন একদিকে চলা শুরু করল যে পথে এদেশের কাব্যকর্মীরা খুব একটা চলাচল করেন না। তিনি ক্রমাগত সে পথেই চলতে লাগলেন এবং এক সময় পেয়ে গেলেন ঈপ্সিত সাফল্য। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিদের মধ্যে আল মাহমুদই আমাদের বিপুল জনসমষ্টির জীবনধারার অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

আমার বিষয় তাই, যা গরীব চাষীর বিষয়
চাষীর বিষয় বৃষ্টি ফলবান মাটি আর
কালচে সবুজে ভরা খানা-খন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।
চাষীর বিষয় নারী।
উঠোনে ধানের কাছে নুয়ে থাকা।
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী। (কবির বিষয়)

বাংলা জনজীবন, গ্রামীণ-অস্তিত্বের প্রতি যেন, সাধারণ মানুষের প্রতি সশ্রদ্ধ মমত্ববোধ তাঁর কবিতায় এমনভাবে হুড়মুড় করে প্রবেশ করে ভাবতে অবাক লাগে, নগর বাউল না সেজে আল মাহমুদ গ্রামে প্রবেশ করেন অথচ আধুনিক সাজ-সজ্জায়। যা তাঁর কবিতাকে করেছে আলোকিত। এবং মানব ধর্মকে আল মাহমুদ বড় করে দেখতে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। তবে কবি ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে যে কবিতাগুলো রচনা করেছেন তাতে গোঁড়ামির চিহ্ন নেই কোনো। ভক্তিকে চিত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেও আল মাহমুদ তাঁর কবিতাকে করেননি চর্বিত-চর্বণ। তাঁর কবিতা আগের মতোই তাঁর স্ব-ভাষায় সামনে এগিয়েছে।

বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল
গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল কবুল।

(সোনালী কাবিন)

বাংলাদেশে একটি বিষয় ইদানীং প্রকট আকার ধারণ করেছে। তা হলো, দ্বিধা-বিভক্তি, খণ্ডিত চর্চা। সাহিত্যে মিথ্যাচার। একজন কবি আল মাহমুদ তাঁর বিশ্বাস কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাঁর কাব্য শক্তি দ্বারা। এবং তিনি যদি উপস্থাপন করতে পারেন তাঁর মেধা, মনন দ্বারা তাতে ক্ষতি কী? পার্শ্ববর্তী একটি দেশে দেখা যায়, শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়া কবিতা, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাসে তাদের কৃষ্টি-কালচার দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা। তাদের পূজা, ঈশ্বর, দূর্গা, কালি এসব বিষয়ে চর্চা তাঁদের ঐতিহ্যগত অধিকার। যা তারা বংশ পরম্পরা পেয়ে

www.pathagar.com

এসেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কালচার ভিন্নধর্মী। এসব বিষয়-আশয় নিয়ে যদি কেউ রচনা করেন কবিতা-গল্প-উপন্যাস তাতে দোষের কী? নিজ দেশ, কাল, ঐতিহ্য নিয়েই তো একজন কবির স্বপ্নের জগতে বিচরণ। একজন আল মাহমুদ যদি নিজ বিশ্বাসকে জায়নামাজে বসিয়ে উপস্থাপন করেন তাতে কার কী? গ্রহণ-বর্জন সে-তো কালের ব্যাপার। তবে এ ক্ষেত্রে একটি কথা আছে। কবিদের রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা জরুরি। কিন্তু রাজনৈতিক গেরুয়া পরে রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে মিশে যাওয়া অনুচিত। কবির কবিতা সমাজ পাল্টাতে পারে না। কিন্তু কবিতা হৃদয়ের শান্তি আনে। চিত্তকে করে পরিশুদ্ধ। মস্তিষ্কের এন্টেনা করে সুদূর প্রসারিত। কারণ একজন কবি তাঁর সময় থেকে একশত বছর এগিয়ে থাকেন চিন্তা, চেতনায় সর্বদা জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী এক একজন কলম সৈনিক। আল মাহমুদ তাঁর লেখার মাঝে এ জাতিকে কি উপহার দিলেন সেটাই আজকের মূল কথা। আল মাহমুদ তাঁর কোনো সিদ্ধান্তের কারণে যদি বিতর্কিত হয়ে যান সেটা একান্তই ব্যক্তি আল মাহমুদের ব্যাপার। কিন্তু একজন কবি আল মাহমুদ, তিনি অবশ্যই এ দেশের গর্ব। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এই বীর বাঙালী কলম ছেড়ে অস্ত্র ধরেছিলেন, সে তো দেশেরই কারণে। তাঁর দেশপ্রেম তাঁর একাধিক কবিতায় ফুটে উঠেছে, তিনি এক সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। তিনি কোন পর্যায়ের কবি সেটাই দেখার বিষয়, আলোচনার বিষয়, সমালোচনার বিষয়। একজন দেশপ্রেমিক কবি তাইতো এ ভাষায় লিখে ফেললেন ঃ

(I) *জেনো, শত্রুরাও পরে আছে সবুজ কামিজ*
শিরস্ত্রাণে লতাপাতা, কামানের ওপর পল্লব।
ঢেকে রাখে
নখ/দাঁত/লিঙ্গ/হিংসা/বন্দুকের নল
হয়ে গেছে নিরাসক্ত
বিষ কাটালির ছোটো ঝোপ। [ক্যামোফ্লাজ]

(II) *এ মুখ আমার নয়, এ মুখ আমার নয় বলে–*
যতবার কেঁপে ওঠি, দেখি
আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে
দাঁড়িয়েছে পাশে। *[পালক ভাঙার প্রতিবাদে]*

স্পন্দমান আবেগের ভূগোল, দেশজচেতনা, লোককাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সৌন্দর্যে আপ্লুত আল মাহমুদও একজন মিথোলজিক্যাল রোমান্টিক কবি। যেমন ঃ আল মাহমুদ 'সোনালী কাবিন'-এ মাতৃভূমির ইতিহাস খনন করে তুলে এনেছেন ঐশ্বর্যময় ও বীর্যবান অনুষঙ্গসমূহ। এখানেই কবি শক্তিমত্তার সাথে রোমান্টিসিজম প্রবেশ করিয়েছেন। যা 'সোনালী কাবিন' সনেট গুচ্ছকে করেছে মহিমান্বিত। দিয়েছে অমরতা দান।

www.pathagar.com

'সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দুটি,
আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোন কালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রূকুটি;
ছলনা জানিনা বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি।

(সোনালী কাবিন)'

'সোনালী কাবিন' সনেটগুচ্ছ কবি উপমা-রূপকের চর্চার কুশলতার যে নিদর্শন রেখেছেন, আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে তা নতুন এবং আন্তরিক সততায় উজ্জ্বল। গ্রামের মাটি থেকে বিচিত্র আকুল আগ্রহকে কবি উন্মোচন করেছেন, ফলে গাঙের ঢেউ আর হৃদয়ের উদ্বেলতা এক সুতায় বাঁধা পড়েছে, নদীর চরের প্রতি কৃষাণীর পতির অধিকার প্রতিষ্ঠার রূপকল্পে প্রমাণিত হয়েছে নারীর প্রতি পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধার্ত নদীর উপমায় নর-নারীর কামনার চিত্র ফুটে উঠেছে। এই তো একজন শক্তিমান কবির বয়ান। এই আমাদের কবি আল মাহমুদ। এবং তাঁর গ্রামীণ প্রান্তরের উপঢৌকন। যেখানে যৌনতার আন্তরিক অভিব্যক্তি ঘটেছে।

'ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়।'

আল মাহমুদের কবিতার প্রসংগে প্রাবন্ধিক, কবি সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, 'আধুনিক জীবনের কর্মকাণ্ডের মালটিপ্লিসিটি (Multiplicity) বা বাহুল্যীকৃত অজস্র অনেক কবিকে অস্থির করেছে, তাই তাদের কবিতার ভাষায় অস্পষ্টতা এবং জটিলতা এসেছে। আল মাহমুদের কবিতা সংকট থেকে মুক্ত। আন্তরিক সত্যের সামীপ্যে তাঁর কবিতা স্পষ্টবাক প্রকৃতির মতো উন্মুক্ত ও স্বাভাবিক। কোনও অঘটনে নয়, কিন্তু হৃদয়ের লোক-লোকান্তরে তাঁর বসতি; তাই তিনি উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র এবং একনিষ্ঠ, আল মাহমুদ তাঁর কবিতা দিয়ে বাংলা কাব্যমণ্ডলকে যে সেবা দিয়ে যাচ্ছে তা অমরতা লাভ করুক এবং একথাও বলা যায়, বাংলাদেশের কবিতার মেজাজ ও মন বুঝতে হলে আল মাহমুদের কবিতার দরোজায় নক করতেই হবে। আল মাহমুদই বাংলা কবিতাকে সাজিয়েছেন একান্ত আপনার করে। মাটির কাছাকাছি থেকে উঠে আসা আধুনিক এই কবির চেয়ে বাংলাদেশকে আর কেইবা ভালো করে দেখেছেন? তাঁর কবিতায় প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায় এ কারণেই।

কবিতা কি?
কবিতা তো শৈশবের স্মৃতি
কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস
স্নানমুখ বউটির দড়িছেঁড়া হারানো বাছুর
কবিতাতো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।
[কবিতা এমন]

www.pathagar.com

আল মাহমুদের সোনালি কাবিন পুন:পাঠ

প্রাসঙ্গিক কারণে কবি আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' আমাদের পড়তে হয়, জানতে হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বাংলা কবিতার সমালোচনার হালফিল করুণ। বাংলা সাহিত্যে আলোচনা-সমালোচনায় সৈয়দ আলী আহসানের অবদান কখনও ভুলবার নয়। এরপর হাসান হাফিজুর রহমানই একমাত্র সমালোচক, যিনি প্রথম দেখালেন পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলার (তৎকালীন) কবিতার আলাদা মন, মেজাজ ও সত্তা। এরপর একজন আবদুল মান্নান সৈয়দ, একজন খোন্দকার আশরাফ হোসেন ব্যাখ্যাতা-বিশ্লেষণ দাতা হিসেবে বাংলা কবিতাকে যতোটা হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের জারক রসে চুবিয়ে পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন তা আমাদের অর্জন।

অগ্রজ এই চারজন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক-আলোচক কবি আল মাহমুদের কবিতার জমিনে লাঙলের ফলা দিয়ে কর্ষণ করেছেন। তাদের পথ বেয়ে আজকের 'সোনালি কাবিন' কবিতায় পুন:পদচারণা।

যুক্তির জেরার নিকট আমরা কবিতাটিকে সোপর্দ করি। ব্যক্তি মানসের নস্টলজিক চারিত্রিক ত্রুটি আর কাব্যের স্নিগ্ধ পথ একমুখী কী? আলোচনার প্রাথমিক পর্বে রাশিয়ান মার্কসবাদী সমালোচক জর্জি প্লেখানভরে উক্তি স্মরণযোগ্য ঃ 'একটি যুগের সামাজিক মানসিকতা সেই যুগের সামাজিক সম্পর্কসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একথা যেমন স্পষ্ট, তেমন আর কোথাও নয়।' আর সবচে বড় কথা মানুষের চেতনা তাঁর সত্ত্বাকে নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক সত্ত্বাই চেতনাকে নির্ধারিত করে। প্রত্যেক লেখকই ব্যক্তিগতভাবে সমাজে অবস্থান করেন এবং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের ঘটনাবলী অবলোকন করেন এবং ব্যাখ্যা দেন।

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই।
দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর

www.pathagar.com

লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোনো কবি করে না কসুর।'

কবির এই পংক্তি কটি বাংলাদেশের এলিট শ্রেণীর বিশেষ ক্ষমতাকে রূপায়ণ করেছে নাকি সমগ্র সমাজের সামাজিক অংশের বৃহৎ অংশের এক ঐতিহাসিক উপলব্ধির কাঠামোকে হাজির করেছে, তা আগে ভাবতে হবে। এ প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের 'জার্মান ইডিওলজি' (১৮৪৫-৪৬) গ্রন্থের বিখ্যাত অনুচ্ছেদ স্মর্তব্য ঃ 'ভাবনা, ধারণা ও চেতনার উন্মেষ প্রথমত সরাসরি যুক্ত হয়ে রয়েছে মানুষের সাথে তার বাস্তবের আদান-প্রদানে প্রকৃত জীবনের ভাষায়।' ধারণা করা, চিন্তা করার মতো মানুষের আত্মিক আদান-প্রদান মনে হয় স্বতোৎসারিত হয় মানুষের বাস্তব আচরণ, সমাজ জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপট অনুভবের মাধ্যমেই। বাংলাদেশের সাহিত্য প্রেক্ষাপট আর জার্মান মুল্লকের সাহিত্য প্রেক্ষাপট ভিন্ন লালিমায় গ্রথিত। বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ধর্মচর্চা চলে প্রচণ্ডভাবে। ধর্মের মাহাত্ম্য, ধর্মের উদারতা, কঠোরতা এদেশের মানুষ বুঝুক আর না বুঝুক ধর্মকে পুঁজি করে অনেকেই বাণিজ্য মহড়ায় লিপ্ত। এ অসকালের পরিস্থিতিতে একজন কবি আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' কবিতা শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করতে পারেনি। কারণ এখানকার মানুষের সংখ্যাগুরু অংশই পাঠ সম্বন্ধে উদাসীন; মার্কস 'ভিত্তি ও উপরিসৌধে'র নিয়ে আলোচনাকালে প্রসংগত উল্লেখ করেছিলেন ঃ 'শিল্পের ক্ষেত্রে একথা সুবিদিত যে কয়েকটি যুগে তাদের বিকাশের প্রাচুর্য সমাজের সাধারণ বিকাশ এবং ফলত সমাজের বাস্তব ভিত্তি বা মূল কাঠামোটির বিকাশের তুলনায় একেবারে অনুপাতহীন'। মার্কস এখানে যা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটি হলো, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত সমাজব্যবস্থায় গ্রীকরা যে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন, তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, উৎপাদক শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশের উপর মহৎ শিল্প সৃজন নির্ভর করে না। এপিক বা মহাকাব্যের মতো কয়েকটি মহৎ শিল্প আঙ্গিকের সৃষ্টি একমাত্র অনুন্নত সমাজেই সম্ভব।

আর এই কারণেই আধুনিক যুগে অতীতের সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সমাজের সাংস্কৃতিক উৎপাদনে আমরা আনন্দ পাই। মনে দোলা দেয় কল্পনা। নান্দনিক আনন্দে উদ্ভাসিত আমরা আধুনিক সমাজের বাসিন্দারা ইতিহাসের প্রাচীন সমাজের বেহুলা-লখিন্দর, পুন্ড্রনগর, লাইলী-মজনু, রাধা-কৃষ্ণ, বখতিয়ারের বিজয় কাহিনী কিংবা আরো প্রাচীন সমাজের স্পার্টাকাসের বিজয় অভিযানের কাহিনীতে সাড়া দেই। আদিম যুগের প্রকৃতি, মানুষের ছবি দেখি। সমকালীন মুহূর্তে সোনালি কাবিন অন্য কোন দেশে অন্য কোন ভাষায় রচিত হলে উঁচু মাত্রায় এর অবস্থান তৈরী হত। বিশ্বসাহিত্যের একটা উদাহরণ

www.pathagar.com

নেয়া যাক। টি. এস. এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'। মতাদর্শগত কারণে পশ্চিমা সভ্যতায় যা স্থূল মার্কসবাদী সমালোচনার সম্মুখীন। কিন্তু অসংখ্য আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু আজ অবধি 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগে 'মেঘনাদ বধ' 'বিদ্রোহী' এরপরই আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন'।

প্রথমে আল মাহমুদের সামাজিক অবস্থান প্রসংগে। এক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতা সাক্ষ্য দেয় টি,এস, এলিয়টের অবস্থান প্রসংগে। 'ইংরেজ সমাজের সাথে দ্ব্যর্থবোধক সম্পর্ক সম্পন্ন একজন লেখক, একজন অভিজাত আমেরিকাত্যাগী, যিনি সন্মানীয় ব্যাঙ্ক কেরানী হয়েও নিজেকে ইংরেজ মতাদর্শের বুর্জোয়া ব্যবসায়ী অংশের সঙ্গে না একাত্ম করে, সংরক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থি অংশের সঙ্গে একাত্ম করেছেন নিজেকে।' আর আল মাহমুদ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর সৈনিক। মুক্তিযোদ্ধা। পত্রিকার প্রুফ রিডার পদ থেকে আজকে পত্রিকার সম্পাদক। চাকুরী ক্ষেত্রে যে কোন জায়গায় কাজ করা যায়। চাকুরী জীবন-জীবিকার জন্য। আর সাহিত্যচর্চা আত্মার খোরাক মেটায়। আল মাহমুদ ঐতিহ্যপন্থি। এবার আসা যাক কবিতা প্রসংগে। কবিতা কোনো ধনতান্ত্রিক, সামন্তবাদীদের ফতোয়া নয়। একজন কবির শ্রেণীগত অবস্থান, মতাদর্শের বিভিন্ন ধরন, সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের সাথে সম্পর্ক, আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন কলাকৌশল নন্দনতত্ত্ব থাকতে পারে। কিন্তু তা বুঝতে হবে। আমাদের মনে আজ প্রশ্ন নেই বলে আমাদের এই অবস্থা। আমাদের প্রশ্ন নেই বলে আমাদের সংশোধন নেই, পরিকর্ষণ নেই। সংশোধন নেই, পরিকর্ষণ নেই বলে আমরা সংস্কৃত নই, মার্জিত নই। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চেতনার অভাব এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যহীনতার মূল কারণে আজ আমাদের সাহিত্যের এই ভগ্নদশা। বিকৃতি, বৈপরীত্য, নৈতিক অবক্ষয়, সম্ভাবনাহীন জৈবনিক হাহাকার সর্বত্র। মহান ভাষা আন্দোলন, শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা অর্জনকাল পটভূমিতে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী ও বোদ্ধা আলোচক দ্বারা আমাদের সাহিত্যের রূপান্তর ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শোষক গোষ্ঠীর নীল পরিকল্পনার রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি সমাজ সংস্কৃতিকে প্রতিনিয়ত সম্ভাবনার দুয়ার থেকে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সূত্রেপ্রাপ্ত হীনমন্যতাবোধের উস্কানিতে সাহিত্যসত্তার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে আজ। এর সাথে যোগ হয়েছে মহান জ্ঞানপাপীরা। আর সে কারণে আমাদের অর্জনকে আমরা লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দেই। আজকে শুধু আমাদের চেহারা, পোশাক, আচরণগত ঐক্য নেই। জীবন্ত সজীব সক্রিয় জাতির মহৎ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কোনো ঐক্যসূত্র এখন পর্যন্ত আমরা গেঁথে তুলতে পারিনি। নিস্তরঙ্গ, আদর্শহীন জীবনবোধে স্ববিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণপূর্বক পরমুখাপেক্ষিতা আজ আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে। শেয়াল, কুকুর, বানর, মানুষ আর কতিপয় বিষধর সাপ এক পতাকাতলে মানচিত্রের দখলদারিতে মুহুমুহু আক্রমণ। ফলে সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতা ও সার্বজনীন পৌছান অন্বিষ্ট হলেও

www.pathagar.com

জীবন বিন্যাসে মুনাফা লোভী অহংসর্বস্ব পেশীসবল নাগরিক আমরা। আর তাই, আল মাহমুদ 'সোনালি কাবিন' কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা হয়েও বিতাড়িত প্রগতি নামধারী লেখকের কলমের ডগা থেকে। "বাঙালীত্ব আজ এমনই এক বদ্ধমূল থাবার শিকার। ... প্রতিস্তরে তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে– ভাষার জন্য, স্বভাবের জন্য, স্বরূপের জন্য, অধিকারের জন্য, ভাব-প্রকাশের জন্য সর্বত্র। বিকাশ 'তো দূরের কথা, নিজস্বতাহীন ভিত্তিহীন শেকড়হীন হওয়ার সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখতেই আজ তার সর্বশক্তি ব্যয় হচ্ছে।' কিন্তু সত্য এই যে আমরা রক্ত দিয়ে ভাষা অর্জন করেছি, মানচিত্র এঁকেছি বিশ্বদরবারে নিজ রক্ত দিয়ে। সমাজ ও রাষ্ট্র অবকাঠামোতে শোষণের ষড়যন্ত্র যে জটিল জট পাকিয়েছে আপামর তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে সেই ভয়ানক পাক খুলতে পারে শুধু অব্যাহত অপ্রতিহত একত্রীকরণ ঐকমত্য। শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি নিতান্ত মুষ্টিমেয় কতকজনের সুবিধাজনক বর্তমান জটিল অবস্থার নিয়ামক। আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' সুগভীর ঐক্যচিন্তায়, মানবতাবাদী অভিনিবেশে তিনি দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ ও ক্ষতজর্জর এদেশের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন যা সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সক্রিয় সজাগ বিনির্মাণ।

'তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা–
সে কানেট পরে আছে হয়তবা চোরের ছিনাল।
পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেকে
মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।'

'সোনালি কাবিন' গ্রন্থে কবি একাধারে সাহিত্য বোধের তীক্ষ্ণতা, বিশ্লেষণ নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন, পাশাপাশি তাঁর বৈচিত্র্যগামী মানসপ্রবণতা মুখ্য হয়ে উঠেছে। যা কবির অন্বেষার সেই গভীর ও ঐকান্তিক অভিব্যক্তির দ্যোতক, যা দেশ-কাল ব্যাপ্ত জীবন পটভূমির অঙ্গীকারে তাৎপর্যপূর্ণ। 'সোনালি কাবিন' কাব্যে সূক্ষ্মভাবে একটি মতাদর্শে অবস্থান নিয়েছে। কাব্যে মতাদর্শ এ প্রসংগে-ফরাসী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লুই আলথুসারের একজন সহকর্মী পিয়ের মাশরী তাঁর 'পুরয়্যুন তেয়োরী দ্য লা প্রোদ্যুক্শিয় লিত্যেরার' গ্রন্থে বলেছেন- 'মানুষের সাধারণ মতাদর্শগত অভিজ্ঞতা– এটা হলো সেই কাঁচামাল, যাকে নিয়ে লেখক কাজ শুরু করেন; কিন্তু একে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি একে আকৃতি এবং কাঠামো দিয়ে ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত করেন। মতাদর্শকে এই নির্দিষ্ট আকৃতি দিতে গিয়ে তাকে কতকগুলো কাল্পনিক (Fictional) সীমার মধ্যে ধরতে গিয়েই শিল্প তার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং এইভাবে মতাদর্শের ঘাটতিগুলো ও আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে মাশরী দাবি করছেন শিল্প মতাদর্শগত বিভ্রম (illusion)থেকে আমাদের মুক্ত করে।'

'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত

www.pathagar.com

হিয়েন সাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা'

১৭৬৫ খ্রী: যন্ত্র বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ইংল্যান্ডের জনজীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। ১৮১৫ খ্রী: নেপোলিয়ানের যুগ শেষ হতেই বৃটেনে শিল্প বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া বণিক সভ্যতার প্রসার ঘটে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় বিপ্লব আসার পাশাপাশি মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের ধারণার জন্ম দেয়। সাহিত্যে ও সমাজতন্ত্রের সুর নতুন উদ্দীপনায় ধ্বনিত হয়। সাধারণ মানুষ অনুভব করে বিশ্ব কেবল মুষ্টিমেয় লোকের ভোগ বিলাসের জন্যই সৃষ্ট হয়নি। তাঁর সৃষ্টি সব শ্রেণীর মানুষের জন্য। ধনী-দরিদ্র-ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবাইর সুখ, শান্তি, ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এ পৃথিবীর সৃষ্টি। Maxim Gorky'র ভাষায় 'the beautiful habitat of man kind, united in one family' মানুষ যেমন গড়তে পারে, তেমনি ধ্বংস করতেও জানে। সেজন্য সমাজতন্ত্রের উদ্গাতারা মানুষে-মানুষে প্রতিযোগিতা, হানাহানি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত লোপ করার জন্য সাম্য-মৈত্রী ও একতার ভিত্তিতে একটি সুখি সমৃদ্ধময় পৃথিবী গড়ার আহবান জানান। মানুষের আবিষ্কার প্রতিষ্ঠা এবং মানবতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলাই সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য। আল মাহমুদ উপরের পংক্তির ফ্রেমে এই অমোঘ বাণীই স্থান দিয়েছেন। মেহনতি মানুষের পক্ষে আল মাহমুদের এ ঝাণ্ডা পত্-পত্ করে উড়ছে।

সভ্যতার বিবর্তন-পরম্পরা ও মানব প্রতিভার পরিকর্ষণ 'মানব সমাজের ওপর সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থাজনিত প্রতিক্রিয়ায় লালিত। আধুনিক কবিতার শিল্পচেতনা যুগচেতনা 'সোনালি কাবিন' কাব্যে সমগ্রতাসন্ধানী মাননশীল হিসেবে পরিস্ফুটিত। একদিকে ঐতিহ্য ধারা, মিথ, নিজের সমাজসত্তার অভিঘাত আন্দোলন, অন্যদিকে কবি সমাজতাত্ত্বিক অভিনিবেশে যুগচেতনার প্রতিফলনকে অপরিহার্য মনে করেছেন কাব্যে। আর সেই কারণেই নিরীক্ষা চালিয়েছেন সামাজিক পরিবেশে শিল্পচৈতন্যকে উজ্জীবিত করার মৌল শক্তিমত্তার দুর্দান্ত মহাপয়ার ঢঙে। এরিখ হেলার কাব্য আলোচনায় অসংখ্যবার বলেছেন : 'all great poetry is realistic' পঞ্চাশের সমসাময়িক কবিদের কবিতায় যে প্রবণতা আল মাহমুদ অবলোকন করেছেন তা থেকে আলাদা পথ বের করেছেন 'সোনালি কাবিন'– এ। যা জীবনানন্দ কিংবা জসিম উদ্দিনের পথ নয়। পরিশীলিত অভিজ্ঞতায় সুবিন্যস্ত প্রয়োগ চেতনায় এবং গভীরতর রসবোধে জারিত হয়ে মানবীয় অন্বেষায় চিরায়ত পথের মাঝে নতুনতর কোনো সত্য আবিষ্কার। যেখানকার আবহাওয়া প্রাণস্পন্দিত শেকড়ে গ্রোথিত এবং যা নিজস্ব অভিলাষা ও অভিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দেয় চেতনাগত অগ্রসরমানতার স্বাক্ষর হিসেবে।

মুসলিম সমাজ মানসের শিল্প অন্বেষার স্বরূপ উদঘাটন ও ইংগিতময় পটভূমি ও

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র্যের উৎস আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন কবি সঙ্গত কারণেই। এক্ষেত্রে কবির দৃষ্টিভঙ্গি যুগপৎ সমাজ নিষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এক আধুনিক কাব্য পংক্তি সংযোজন। যেখানে সামগ্রিক বাংলা কবিতার এ এক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উজ্জীবিনী শক্তি।

'বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরুষ আবৃত করে জলপাইয়ের পাতাও থাকবে না;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হবো চিরচেনা'

মহাকাব্যের সাদৃশ্য এই ১৮ মাত্রার মহাপয়ারে কবি অতীত গৌরব, সাম্য, মানসিকতা, রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, ইতিহাস থেকে ঐতিহ্য, কাম থেকে প্রেম, শস্য থেকে বর্গি, কামকলার অভূতপূর্ব চিত্রায়ন সবশেষে ধর্মের মিথলজিক্যাল অধ্যায়ে অনুপ্রবেশ, এভাবে আল মাহমুদ সযতনে ধীরে ধীরে আত্মউন্মোচন ঘটিয়েছেন নিজের কাব্যমেধাকে। আর প্রকৃত ইতিহাস-ঐতিহ্য টেনে তুলে আনার এই-স্রোতধারা আজকে অভিন্ন সাংস্কৃতিক দ্যোতকে পর্যবসিত।

যে সংক্ষুব্ধ দুঃখদহন অতীতকাল থেকে বাংলাদেশ তক্ সচেতন মানসে ক্রমাগত আন্দোলিত ও তরঙ্গিত হয়ে উঠছিল, যে অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়তি অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য হয়ে উঠছিল স্বতন্ত্র প্রকাশ বেদনার অনিবার্য কার্যকারণ– আল মাহমুদ সেই দুর্যোগের ঘনঘটা কালকে সমজা-মনীষার সার্থক অভিব্যক্তি রূপে নতুন স্বরে নির্মাণ করে বাংলা কবিতার অঙনে সহসা সম্পৃক্ত তরুণ কবিদের কাব্যভাবনায় লকলকে অগ্নিশিখার মতো উস্কে দিয়েছেন। এ এক সামাজিক দায়িত্ববোধ। রতঙ্গক্ষুব্ধ, পরিবর্তমান ও পরিণতি সন্ধানী জাতীয় মনীষার সুগভীর উপলব্ধির সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। যা তার মানবিক মেধা ও মননের পরিণত অর্জন।

অতীতে যাদের ভয়ে বিভেদের বেদিক আগুন
করতোয়া পার হয়ে এক কঞ্চি এগোতো না আর
তাদের ঘরের ভিতে ধরেছে কি কৌটিল্যের ঘুণ?
ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বার বার;
বর্গীরা লুটছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ।

বিশ শতকের কঠোর দারিদ্র ও সংকট বাঙালির জীবনে উনিশ শতকের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যেব পরিমাণ হ্রাস করে। সেই সঙ্গে তাদের মানসিক শান্তিও বহুলাংশে কমে

www.pathagar.com

আসে। ক্ষুধার রাজ্যের অধিবাসীরা তাই পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির আদলে দেখতে থাকে। দরিদ্রের করালগ্রাস মানুষের জীবন থেকে ন্যায়-নীতি সুন্দরের কামনা-বাসনা গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অথচ মানব মনের অদম্য কামনার প্রকাশ একালের সাহিত্যেরই একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। সাহিত্যের নর-নারীর দৈহিক সম্পর্কটিকেও অস্বীকার করা যায় না। নর-নারীর দৈহিক সম্পর্কের মধ্যে যখন প্রেম নামক একটি নির্মল চিত্তবৃত্তির জন্ম হয়, যার মধ্যে অন্তরের সমস্ত গোপন মাধুর্য লালিত, সেটি সুন্দর বলেই সাহিত্যে তার রূপায়ণ অসুন্দর নয়। হুইট ম্যানের কবিতায় ভাবের এক বে-আব্রু' প্রকাশ দেখে আমরা তাই আতঙ্কিত হলেও ক্ষুব্ধ হই না।

It is I, you women, I make my way

I am stern acrid, undissuable, but I have you

I do not hurt you any more than is necessary for you

I pour the stuff to starts Sons and daughters fit for these states.

I Press with slow rude muscle.

I brace myself effectually. I listen to no entreeties

I dare not with draw till deposit what has so long accumulated within me.

তখন আমরা মুগ্ধ হই এই ভেবে যে, মানব মনের একটি অদম্য ও আদিমতম কামনার জোয়ারকে কবি বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে তার প্রবাহমানতাকে আরো স্বচ্ছন্দ করে দিয়েছেন। আল মাহমুদ 'সোনালি কাবিন' কাব্যে শব্দ প্রতীক ও উপমার মাধ্যমে আদিমতাকে অপূর্ব চিত্রায়ন পূর্বক আদি ও অন্ত পর্যন্ত চিরন্তর রোমান্টিক ধারাকে প্রজ্বল করেছেন। যা বস্তুজগতে প্রতি মুহূর্তে বিশ্লেষণের দাবীদার।

১. তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ।

২. ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দুটি জলের আওয়াজ-
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,
চরের নাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়

৩. বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী

www.pathagar.com

জানতো না যা বাৎসায়ন, আর যত আর্যের যুবতী

৪. ফাটানো বিদ্যুতে আজ দেখো চেয়ে কাঁপছে ইশান
ঝড়ের কসম খেয়ে বলো নারী, বলো তুমি কার।

উনিশ শতক নানা কারণেই আলোকিত প্রহর। পঞ্চাশের আল মাহমুদের এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে বাংলার ও বাঙালীর আপামর ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষ সকলের সহজ ও আধুনিক গতিময় বিকাশের ভূমি তিনি প্রস্তুত করেছেন। সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং রুচিগত স্বীকৃতির এই সমন্বিত পরিচর্যা এই কাব্যের ধর্মনির্ভরতার প্রবণাকে গভীরভাবে সাফল্য এনে দিয়েছে।

একজন কবি সবকিছু ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়ার অভিপ্সায় এই এপিক সদৃশ সনেট লিখে বাংলা কবিতাকে করেছেন সমৃদ্ধ। ফরাসী কবিতায় এলুয়ার-আরাগঁর যুগ, ইংরেজী-আইরিশ কবিতার স্পেন্ডার-অডেন-সিয়ানো কেসীর যুগ; রাশিয়ান কবিতার আলেকজ্যান্ডার ব্লক-মায়াকোভস্কির যুগ যে বিবর্তনকে চিহ্নিত করে, আধুনিক বাংলা কবিতায় মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ পরবর্তী আল মাহমুদ সেই যুগের ধারায় প্রথাগত উৎসমূলকেই পাল্টে দিয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

১. মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা : টেরী ইগলটন।
২. আধুনিক কবি ও কবিতা: হাসান হাফিজুর রহমান
৩. বাংলা একাডেমী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় (১৩৯০)
৪. আধুনিক কবিতার দিগবলয় : অশ্রুকুমার সিকদার
৫. সাহিত্যে বাস্তবতা : আজহার ইসলাম
৬. কবিতা সমগ্র : আল মাহমুদ

www.pathagar.com

চার বাগানের মালী

আজকের বাংলাসাহিত্য বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেখানে যে অঞ্চলে যেভাবেই পঠিত হোক না কেন তার একটা নিজস্ব ঢং নিয়ে সেখানে আলোচিত। তেমনি বাংলা কবিতায় বহুমাত্রিক রং নিয়ে আমাদের সামনে বারে বারে ফিরে ফিরে একজন কবি এমনভাবে হাজির হন। আমাদের আবার প্রবেশ করতে হয় তাঁর কবিতার রাস্তায়। যে রাস্তা আমাদের কখনো নিরাশ করেনি। কব্জির জোরে আর দেখার নতুনত্বে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেন, আধুনিক বাংলা কবিতার ফর্ম কেমন হবে? আমরা কথা বলছিলাম, কবি আল মাহমুদ প্রসঙ্গে। পাঁচ দশকের কবি মাহমুদের 'প্রেম. প্রকৃতি, দ্রোহ আর প্রার্থনার কবিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ (২০০২) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে এমন কিছু কবিতা আছে যা একমাত্র আল মাহমুদের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

মহৎ কবিতা শুধু বিষয়ের গৌরবেই নয়, আঙ্গিকের গৌরবেও মহৎ। বাংলা কবিতায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা কবিতা যুগে যুগে কালে কালে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে, যেভাবে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে; বৃক্ষ যেভাবে তার খোল-পাতা পাল্টায়। আল মাহমুদের কবিতার ব্যাপারটিও ঘটেছে অনেকটা সেইভাবে। আল মাহমুদ পঞ্চাশের কবি। এই দশকের কবিরা প্রায় সকলেই চল্লিশের তথাকথিত সমাজ সচেতন কবিতার ধারাকে পরিহার করে প্রথম থেকেই ত্রিশের কবিদের অর্জিত আধুনিকতাকে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করেছেন সমাজ ও স্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে। পঞ্চাশের কবিরা প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রিশের অনুসরণ করলেও দ্রুতই তাদের কাব্যে নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। আর আল মাহমুদ জীবনানন্দ কিংবা জসীমউদ্দীনের পথে না হেঁটে বাংলা কাব্যে এমন এক ধারা প্রবর্তন করলেন, আজ তিনি কাব্য বিচারে এক ও অদ্বিতীয়। নগর ও লোকজ চেতনার যৌথ সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন একের পর এক কাব্য ইতিহাস। যা কালের মানদণ্ড উতরিয়ে মহাকালের

www.pathagar.com

কাতারে শামিল। কথ্যভাষাকে আমাদের চেনাজীবনের কবিতায় আল মাহমুদ যেভাবে রূপান্তর ঘটিয়েছেন তা অচিন্তনীয় এক শিল্পীর শিল্পিত ভুবন। চারটি ভাগে বিভক্ত এ গ্রন্থের প্রথম অংশ প্রেম।

আল মাহমুদ প্রেমের কবিতা যে স্টাইলে লিখেছেন তা অনেকের কাছেই আজ অনুকরণীয়। এখনকার নবীন লিখিয়েদের অনেকের কবিতায় আল মাহমুদের ক্ষুদে ছায়া লক্ষ্য করা যায়। আল মাহমুদের প্রেমময় কবিতায় শব্দের ঝংকার কিংবা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় না। সহজ সরল বাংলার বধূর আটপৌঢ়ে শাড়ির মত তাঁর কবিতায় শব্দ জড়িয়ে থাকে এক ধরণের শান্তির প্রতীকের মতো। পৃথিবীতে সবচে সূক্ষ্মতম শিল্পকলা কবিতা। এই কবিতা আল মাহমুদ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা ক্লান্তি, বিষণ্নতা, অবসাদ ও সকল প্রকার অনাচার করার হাত থেকে কোন এক অদৃশ্য মায়াবী টানে বেঁধে রাখবে পাঠকের বোহেমিয়ান হৃদয়। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করি:

১. তুমি তো ঘুমাও নারী নিরাশার নিঃস্বপ্ন বালিশে
যখন আমার চোখে সপ্তর্ষির মতন সজাগ
পূর্ণিমার চাঁদে দেখি এ হাতের চাবুকের দাগ,
ভ্রমরের গুঞ্জনে রাতজাগা পাখিদের শিসে
যখন গোলাপ ফোটে, ফেপে ওঠে ফুলের পরাগ [সনেট : ৩]

২. তোমার গোসল আমি দেখিনি কি একদা তিতাসে?
মনে পড়ে? শ্মাশান ঘাটের সেই সিঁড়ি ছুঁয়ে নেমে যাওয়া জল
ডোবায় সে পদে পদ্ম। সফরী পুঁটির ঝাঁক আসে
আঙুল ঠুকরে খেতে। নদী যেন নদীতে পাগল।
নদীর ভিতর যেন উষ্ণ এক নদী স্নান করে।
তিতাসের স্বচ্ছ জলে প্রক্ষালনে নেমেছে তিতাসই।
নিজের শাপলা লয়ে খেলে নদী নদীর ভিতরে
ঠাট্টা বা বিদ্রুপ নেই, নেই শ্যেন চক্ষু, নেই চারণের বাঁশি।
[নদীর ভিতরে নদী]

এবার আমরা আল মাহমুদের কয়েকটি খণ্ডিত পংক্তিমালা লক্ষ্য করি:

১। ইভের শরীর যত কেলি করে প্যাসিফিকে, ভূমধ্যসাগরে
নুনের দাহিকা হয়ে জ্বলে তারা অধরে, নধরে।

২। অবিশ্বস্ত শাষা যদি বীজ বুনে তোমার আবাদে
বিস্বাদ শস্যের আঁটি নিতে হবে ফ্যাসাদে, বিবাদে।

৩। আবার ভঙ্গিময় হয়ে
এগিয়ে আসুক তোমার গ্রীবা, যা লজ্জার, তীরে ছিন্নভিন্ন করে দেবে
আকাশে ভাসমান রাজহাঁসের মালাকে। উন্মুক্ত করো তোমার যুগল

www.pathagar.com

পয়োধর, দেখুক বরাহ মন্দিরের কুয়াশাচ্ছন্ন বার্ধক্য-পূজারীদের

অশ্রুসজল চোখ। তবেই না এ শহরে ফিরে আসবে প্রেমের ধারণা।

মানুষ পাগল হবে মানুষীর রূপে।

যে কবির শব্দজ্ঞান যত নিপূণ তাঁর কবিতা তত পরিপাটি। শব্দ দর্পণের মতো। তাতে ধরা পড়ে কবির ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ, দৃষ্টিভঙ্গি, যুগপরিবেশ। বাংলা কবিতায় সমসাময়িক কালে আল মাহমুদের রোমান্টিক চেতনা মানেই হলো প্রকৃতির মাঝে বিচরণশীল মনুষ্য প্রাণীকূলের জীবনরস, অথবা সৃষ্টিরহস্য ও সৃষ্টিকর্তার সাথে আধ্যাত্ম প্রেম। ইহজাগতিক ও পারজাগতিক এই দ্বি-মুখী সম্পর্ক ছাড়াও আল মাহমুদের প্রেমময় কবিতায় মার্কসবাদের একটি শক্তিশালী ধারা আমরা দেখতে পাই। যা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'সোনালি কাবিন' কবিতায় আমরা আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম দেখতে পাই প্রথাসিদ্ধ চিন্তাকে ওলট-পালট করে দিয়ে সমাজ চেতনার প্রতি আমাদের চিন্তাজাগ্রত করে দিচ্ছে। ইতোপূর্বে ত্রিশের দশকে ফ্রয়েড ও মার্কস এমনভাবে চিন্তার রাজ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, তৎকালীন কবিদের মনোজগতে ছিল বিপ্লবের অদম্য নেশা। অবশ্য আল মাহমুদ ফ্রয়েড, মার্কসীয় দর্শনকে এমনভাবে কবিতায় এনেছেন যা বিচিত্রতায় ভরপুর। বক্তব্য বদলানো, দৃষ্টি বদলানো, শব্দ নিয়ে খেলা কবিদের সহজাত প্রবৃত্তি। আর তাই একদিকে আল মাহমুদ সাম্যের বাণী ছড়াচ্ছেন প্রেমের কবিতায় এভাবে ঃ

'এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত

তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।

আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,

পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ।'

অন্যদিকে প্রেমের এক জলন্ত ঘোষণা দিচ্ছেন আধ্যাত্ম চেতনার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে।

'ও পুরুষ, রক্ত মাংসের চিরভাই আমার। দুঃখ পাপ শাস্তি অভাব

সান্ত্বনা সংগ্রাম আর প্রার্থনা ছাড়া, গ্রহ থেকে গ্রহান্তর ছাড়া, বল প্রভুর মহাসৃজনরীতির অর্থ

বোঝার জন্য প্রথম মানবী আমি, আমি ছাড়া আর কে আছে?

কোথায় আছে? [নারী শতাব্দীতে নাদিরার জন্য]

একটি বিষয় আমরা বলতে পারি, আল মাহমুদ তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতাকে ক্রমশ এমন এক অধ্যায়ে টেনে নিয়ে গেছেন, যা আমাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে স্পর্শ করে যায়। আমরা চিনতে পারি আমাদের সত্তাকে। বিশ্বসাহিত্যের দিকে আমরা দৃষ্টি দিলে এজরা পাউন্ডের এ বিশ্বাসের প্রতিবর্ণীকরণ পাই টি এস ইলিয়টের বক্তব্যেঃ 'অতীতের অতীতবোধ নয়, কিন্তু তার বর্তমানতা কাব্যস্বভাবে সক্রিয় থাকবে। এজরা পাউন্ড প্রাচীন

www.pathagar.com

মিশরীয়, গ্রীক এবং চৈনিক সভ্যতার স্মৃতিধারক চিত্রার্পিত বর্ণলিপি ব্যবহার করে সেগুলোর রূপকল্পকে শাশ্বত চৈতন্যের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।' আর আল মাহমুদ, ইসলামী সভ্যতার জাগরণের উৎস তথ্য সংরক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন কবিতায়। আমরা কখনও অতীতকে উদঘাটন করি অলংকৃত রূপ মেঘলায় আবার কখনও বর্জন করি নির্বিচার বিরুক্তিতে। কিন্তু আল মাহমুদ অতীতের অন্তর্লোককে আবিষ্কার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিক ক্রমধারাগত পরম্পর্যে।

আগুন উদ্দীপিত হলো। আমি বললাম
হে নচিকেত অগ্নি, তুমি যে ঋত্বিকের নামে
জগতের যাবতীয় বিষয়কে দাহ্য বলে প্রতিপন্ন করো,
সেই উদ্দালক-পুত্র নচিকেতার শপথ, তিনি যেমন
যমের প্রলোভনকে অতিক্রম করেছিলেন, তুমিও তেমনি
আমার সম্মুখস্থ মহালিঙ্গের লৌহ আচ্ছাদন ভেদ করে
বারুদের উদরে প্রবেশ করো।

আবার ইসলামী কাহিনী আল মাহমুদ টেনে এনেছেন এভাবেঃ

কিসের স্পর্ধায় তুমি নঞর্থক কেনানী বালক?
মরুচর ক্রীতদাস, মনফের সৌধরাজি দেখে
বিহবল বন্দির মতো নতদৃষ্টি।
নয়ন সার্থক হবে, যদি দেখো
আমালিক আজীজের কণ্ঠহারে বাঁধা
অবাধ্য হলুদ হীরা কি উষ্ণ আকুতি ছড়ায়।
কেন দ্বিধা বেদুঈন?
তুমি কি রাখাল নও?

আল মাহমুদ এর প্রেম বিষয়ক কবিতায় ব্যাপ্তময় অধ্যায়ে আমরা শেষ কথা বলতে পারি, আধুনিক কালের প্রবল উত্তেজনা বা টেনশনকে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাঝে নির্ণয় করেছেন প্রেমমূলক কবিতায়। যেখানে স্বচ্ছতা আছে। আছে গ্রামীণ প্রান্তরের উপঢৌকন। । এবং জীবনের অন্তর্গত শস্য, আদ্রতা এবং আদিম দেহ-কামনার স্বাস্থ্য উন্মুখর রিরংসায় বাঙময় হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রকৃতি ভাবনায় আল মাহমুদ ঃ প্রকৃতি ভাবনার শুরুতে একটি কথা বলা যায়– আল মাহমুদের প্রকৃতি চিন্তা আন্তরিক সত্যের সমীপে স্পষ্টবাক, উন্মুক্ত এবং স্বাভাবিক। কোন বাড়তি সংযোজন নয়। হৃদয়ের ঘর-বাড়িতে প্রকৃতি যেভাবে শিকড় গেড়েছে, কবি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন স্বতন্ত্র এবং একনিষ্ঠভাবে মনের মাধুরী মিশিয়ে।

কতদূর এগোলো মানুষ!
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ়মাটির নরমে
কোমল চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার
বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তা সর্ব উর্বর আধার।

(প্রকৃতি)

আদিমতাকে একটি প্রত্যয়ে উপস্থিত করার জন্য নিজের কাব্যচিন্তায় অহোরাত্র যৌনতাকে আন্তরিক অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করেছেন। কামস্বভাব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙিমায় স্নায়ু চাঞ্চল্যের তীব্রসত্যে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন কবিতায়। এখন এই আদিমতা প্রেম আখ্যান কি প্রকৃতি, দ্রোহ, প্রার্থনার আখ্যান তা কোনো বিষয়ই নয়। তিনি যেহেতু শব্দ নিয়ে খেলা করেন। তাই সুযোগ পেলেই পেখম উদাম করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যেভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয়, তেমনি যৌনতাকে কবিতার মাঝে সন্নিবেশিত করে দেন। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই 'খনার বর্ণনা' সনেটে। ছন্দের (৮+১০) মাত্রার যাদুকরী খেলার মাঝেও তিনি যৌনতাকে হাজির করেছেন প্রচণ্ড ব্যত্যয় নিয়েঃ

'নারীর দেহের চেয়ে নম্য কিছু নেই পৃথিবীতে
সব শাস্ত্র ঘেঁটে শেষে হে জ্যোতিষী নারীতে আরাম;
রোহিনী তারার ওম একমাত্র নারী পারে দিতে
মাতা-বধূ-কন্যা কহ, নারী এক রহস্যের নাম।

মেদিনীর সাথে শুধু স্ত্রী দেহের তুলনা সরস
সর্বংসহা তনুদেহা মানুষের তপস্যার ফল;

www.pathagar.com

কৃষির আরম্ভে নারী, পশুরাও নারীতে বিবশ
নারী শক্তি, নারী স্বাহা, জ্ঞানীদের পিপাসার জল।'

সময়ের প্রাণরসে সিক্ত আল মাহমুদ প্রকৃতি ভাবনায় শুধু নারীর কোমল ভালোবাসার কথা মেলে ধরেননি, আধুনিক চিন্তা জগতের প্রকৃতি ভাবনার যে সর্বশেষ অগ্রগতি, সেদিকেও তাকিয়েছেন। একজন কবি চিরটাকাল একই পথে হাঁটবেন এমন নয়। কবি পরিবর্তনশীল এক সত্তার নাম। সময়ের সাম্পানে উঠে কবি ক্রমশ এগিয়ে যান পরিণতির দিকে। প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' নামে 'প্রকৃতি' প্যারায় একটি কবিতা আছে। কবিতাটি সবকালের সময়োপযোগী। মিষ্টিক কবিতা এবং স্পঞ্জ কবিতার এক দারুণ সংযোজন দেখা যায় এই কবিতায়। ফিরে যাওয়া ও ফিরে আসার মাঝে দুই ধরণের যে রিক্রিয়েশন ঘটে তা কাব্যিক পরিভাষায় কবি এঁকেছেন এবং পাঠক সমাজকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন সঙ্গীত চিত্রকলার চাইতেও সূক্ষ্মতম শিল্পকলা হচ্ছে কবিতা। যদি সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় তাহলে কবিতা হয়ে ওঠে জীবন্ত। 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' সে অর্থে একটি জীবন্ত কবিতা। 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' কবিতাটি যে আঙ্গিকে লেখা হয়েছে তাতে ইউরোপের আধুনিক কবিতার ঢং দেখা যায়। পূর্ববর্তী সাহিত্যের ঐতিহ্যের কাছে কবি সর্বদা ঋণী থাকবেন এই এলিয়টী আপ্ত বাক্যের প্রভাব আল মাহমুদের মধ্যে বিদ্যমান। ইউরোপ-আমেরিকার কাব্যগুরু, বলে প্রতীয়মান এলিয়ট, পাউন্ড, বোদলেয়ার, মালার্মে, ভ্যালেরি, হাইনরিশহাইনে, রিলকে, হিমেনেথ, লিওপার্দি, আলেকজান্দর ব্লক, স্টিফেন ওয়ালশ, উইলিয়াম কার্লস উইলিয়াম, আদ্রে র‍্যাবো, সা ঝাঁ পল, প্রভৃতি বিদেশী কবির কবিতার নির্মাণ কৌশল আল মাহমুদের কবিতার বৃত্তের মাঝে ঘোরাফেরা করে। আর তাই আল মাহমুদের কবিতায় আমরা পাই চির নতুনের কর্মফসল। একজন বিদেশী কবি মাটির কাছাকাছি খুব একটা পৌঁছাতে পারে না। উন্নত সভ্যতার বস্তুবাদী চেতনা সবুজাভ মৃত্তিকাকে বদলিয়ে নির্মাণ করেছে উঁচু- উঁচু লোহা-লক্কড়ের দালান কোঠা। তাই কৃত্রিম স্বর্গে বাস করেই তিনি মাটির ঘ্রাণ নেন কবিতার মাধ্যমে। এখানেই ব্যতিক্রম আল মাহমুদ। শ্যামল মৃত্তিকার আধুনিক কবি শিকড়ের টানে বারবার ছুটে গেছেন গ্রামের বাঁকা পথে। বাতাস যেখানে নির্মল। মাটি যেখানে ফসলিময়। প্রকৃতির খুব নিকট থেকে তিনি দেখেছেন প্রাকৃতিক সুষমা। বোহেমিয়ান সাজ। আর সে কারণেই তরমুজ ফল নিয়ে বাস্তবতা সম্বলিত কবিতা লিখতে পরেন:

'তরমুজের মাঠে এসে একটু বিশ্রাম নিই। কি আর খুঁজবো? এখানে প্রাণ, পতঙ্গ ও উদ্ভিদের জবাবটা অনুবাদ করার মতো কাউকে তো পেলাম না এ পৃথিবীতে। ছোট্ট গোল পৃথিবী। তরমুজের মতো। শেষ পর্যন্ত একটা পাকা তরমুজের কাছে বসে

www.pathagar.com

ফলটাকে দু'খন্ড করে দেখি আমি যা চাই, তার চেয়েও অর্থবহ ফাক খুলে দিয়ে লাল হয়ে আছে তৃপ্তি।'

আল মাহমুদের দ্রোহ: এখন একটি বিষয় গভীরভাবে বিশ্বাস করি, কবিরা সমুদ্রের পাখির মতো, যে পাখি তিনদিন আগেই ঘূর্ণি ঝড়ের আভাস পায়। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দৌরাত্ব এবং আধুনিক সভ্যতার নিগড় ছাড়া জোয়ারের মাঝে বিজ্ঞানের নব নব বিজয়, তারপরও কবিতাই পারে মানুষের বিবেককে নাড়া দিতে অন্যভাবে। কারণ কবিতার ভাষায় মহাজাগতিক বিষয়গুলি নতুন মাত্রায় মানবমুখিতায় যথার্থ অর্থে হয়ে ওঠে বিশ্ব পল্লীর শিল্প উৎস। চৈতন্যের পুষ্পিত ইমেজের নাম কবিতা। যেহেতু যন্ত্র কখনো চৈতন্যকে গ্রাস করতে পরে না, শিল্পীর শিল্প যেভাবে টেনে নিয়ে যায় গভীর থেকে গভীরে, তাই কবিতা শিল্প মানুষের মনের মুকুরে গ্রোথিত হয়ে যায় অন্য এক বিশ্বাসের তরিকায়। আর সে কবিতার ভাষা যদি হয় দ্রোহ তাহলে তা আরো আচ্ছন্ন করে ফেলে মানুষের বোধের সীমানা। একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে পুঁজিবাদ যখন বিশ্বসমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রবল পরাক্রান্ত দানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ তখন আধুনিক কবিরা আকাশ-মাটির বায়বীয় দিবাস্বপ্নেই নিজেদের কবিতাকে অনেকটা আটকে রেখেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আল মাহমুদ। বিশ্বনাগরিক হয়ে দেশজ মৃত্তিকাকে না ভুলে পশ্চিমা আকাশে বিচরণ করেছেন এবং বুঝে-শুনে খড়গ তুলেছেন অবক্ষয়-নৈরাজ্য অসুস্থতা-বিষণ্নতা -অবিশ্বাস-অভিশঙ্কার বিরুদ্ধে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ নাম নিয়ে পুঁজির শোষণ কে কেন্দ্র করে যে কবিতা রচনা করেছেন, তা আল মাহমুদের পূর্ববর্তী কাব্য স্রোত থেকে দূরবর্তী। উত্তর আধুনিকতাবাদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে আল মাহমুদের এই বিদ্রোহ পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। কারণ ইতিহাস, ঐতিহ্য, মিথ নিয়ে যে আল মাহমুদের বিচরণ তিনি সহসা প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন স্রোতের বিপরীতে। সম্পূর্ণ একা। 'ঈগল থাকবে ইতিহাস থাকবে না"– কবিতাটি পাঠে আমরা নতুন এক দ্রোহী আল মাহমুদকে পেয়ে যাই। যে আল মাহমুদ 'সোনালি কাবিন', মিথ্যেবাদী রাখাল, 'একচক্ষু হরিণ', কিংবা 'দোয়েল ও দয়িতার নন তিনি প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী এক সময়ের সাহসী কাপ্তান। প্রতক্ষ্য সমাজ মনস্কতা এবং রাজনীতি সচেতনতায় যিনি হয়েছেন নতুন সমাজকাঠামো নির্মাণের হাতিয়ার। 'ঈগল থাকবে ইতিহাস থাকবে না-' কবিতায় আমরা তাই দেখতে পাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, পুঁজিবাদ বিরোধিতা, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেকদিন পর শোনা গেল আল মাহমুদের উচ্চকণ্ঠে স্বরগ্রাম।

১. 'ভাবো, ইতিহাসের গতি রুদ্ধ। মানুষের আর কোনো ইতিহাস থাকবে না। ফেরাউন থাকবে কিন্তু মুসা থাকবে না। পুঁজি থাকবে, সাম্রাজ্যবাদী বিচরণশীল লুণ্ঠন থাকবে কিন্তু না বলার মতো দেশ থাকবে না। আফগানিস্তান বা ফিলিস্তিন

www.pathagar.com

কেউ না। কেবল মহাকালব্যাপী ঈগল খচিত বোমারু বিমানগুলো উড়বে কিন্তু মাটি, পাহাড় বা সাগর থাকবে না। পৃথিবী বা মানচিত্র থাকবে না। ধর্ম থাকতে চান থাকুন কিন্তু কোনো মিনার থেকে আজান হবে না। গীর্জাগুলো তো আগেই নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন না ঘন্টা ধ্বনি না আজান। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ থাকলে বোমা হামলাও থাকবে। কারণ ইতিহাসের আর প্রয়োজন নেই। ইতিহাস থাকবে না।

রাজ রাজরাদের দিগ্বিজয়ের কেচ্ছা না হয় থাকলো না, কিন্তু প্রেম? প্রেমের ও কি কোনো ইতিহাস কোথাও কেউ গাঁথাচ্ছলে গেয়ে উঠবে না? যেমন বন্দীরা প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে ওঠে প্রতিটি শতাব্দীর অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে। এত বোমা বর্ষণের মধ্যেও কবিরা কেন শুনতে পায় মুক্তির জন্য আদম সন্তানদের আহাজারি। মানুষের ভালোবাসার গান বিধ্বস্ত পৃথিবীর কন্দরে দূর্বাঘাসের মতো ছোপ ছোপ সবুজের মায়া বিছিয়ে পড়ে থাকবে কিন্তু মানুষের কোনো দয়িতা থাকবে না।

২. বুশের বোমায় তেলজল একাকার
মধ্য এশিয়া মুক্ত উদরে শোয়া;
খুলে গেছে নাভী, ঐশ্বর্যের দ্বার
আকাশে উড়ছে মৃত বিবেকের ধোঁয়া-
জ্বলছে কাবুল, লুটালো কান্দাহার।

পুঁজির শত্রু কোথা চীন, কোথা রুশ?
সবার পাছায় থাপ্পড় মারে বুশ।
জাতিসংঘও লেজ নাড়ে যথারীতি
তার কাজ শুধু ছড়ানো বিশ্বভীতি,
মধ্যপ্রাচ্যে হামাসের দুরমুশ।
পারস্য জপে পরম প্রভুর নাম
পাখ্তুন নামের ভারতের জ্বর আসে
মাজার-ই-শরিফে হত্যার পয়গাম
কাশ্মীর কাঁপে রক্তের উচ্ছ্বাসে।

পাকিস্তানে কি দম্ ফেলে ইসলাম?

www.pathagar.com

৩ জ্ঞানের বিষাদ এসে দাঁড়িয়েছে হত্যার বিজ্ঞানে
কেবল প্রযুক্তি খোঁজে শাদামাথা হত্যার নায়ক
সিদ্ধহস্ত খুনীদের নব্যতর বিশ্বের বিধানে
এক ঠ্যাঙে বসে আছে জাতিসংঘ বিবেকের বক।
[ঈগল থাকবে ইতিহাস থাকবে না]

প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, নিয়ত পরীক্ষা সম্ভব, গদ্য-পদ্যের বিস্ময়কর সংক্ষিপ্ত, অলংকারের স্বল্পতা কিন্তু ভাব সংহতিতে আল মাহমুদের কবিতা বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল। এ কারণেই সমকালীন বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ বিস্তার করেছে মোহন প্রভাব। বস্তুত, আজ এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে বিষয় ও আঙ্গিকের নানা মাত্রিক বৈচিত্র্য ও বৈভবে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাংলা কবিতায় বহু অর্জনের স্পর্শ পেলেও আল মাহমুদ এপর্যায়ে সবচেয়ে বেশি দ্যুতিময়। আল মাহমুদ বাংলা কবিতায় নিজস্ব রাস্তা নির্মাণে সফলভাবে উতরে গেছেন। আর তাই আজকের বাংলা কবিতার আঙিনায় তাঁর দ্রোহ বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সৃষ্টি করেছে নতুন ইশ্‌তেহার। দেশ কালের-দ্বন্দ্ব ও সংক্ষোভ, সভ্যতার সঙ্কট কবিকে বিচলিত করতে পারেনি, তাই রৈবিক-স্বদেশ প্রেম ও প্রকৃতিলোকে আল মাহমুদ নিশ্চিন্তে সাঁতার কেটে নির্মাণ করেছেন কবিতার পর কবিতা। বিক্ষুব্ধ সমাজ, বিচলিত পরিবার, বিধ্বস্ত সময়, বিভ্রান্ত বর্তমান এবং অনন্বিত মানব সম্পর্কিত আল মাহমুদকে কখনো তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অথচ একথা সত্য এই সঙ্কটময় পথে কবি ঠিকই কালের চৌকাঠ ডিঙিয়ে সভ্যতার নতুন তটসীমায় খুঁজে চলেছেন মানবমুক্তির নান্দনিক মহাসত্য।

'কতকবির আত্মা আমাকে জোনাকীর মত ঘিরে আলোর
নকশা বুনছে। একটু পরেই আমি শের শাহ সূরী
রোড ধরে পুরানা কিল্লার দিওয়ার পেরিয়ে শাহ
মসজিদে আজান দিতে যাবো।
বেপথুমান চিরচঞ্চল কবির আত্মায় এখন গঞ্জরিত হোক দিল্লি নজদিক।'
(একগুঞ্জরিত কবির আত্মা)

আল মাহমুদের কবিতায় প্রার্থনা ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষ্ণুদে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আমরা পাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের অতীতসত্তার নির্ভরযোগ্য উৎস। এবং জ্ঞান সাধনার ঔৎসুক্যে তাঁরা গ্রীক পূরানকে গ্রহণ করলেন। ফলশ্রুতিতে তাদের কবিতায় উপকরণের পরিধি বৃদ্ধি পেল। শব্দার্থে বিশ্বস্ততা এলো এবং বুদ্ধির সারাৎসার হিসেবে কবিতার অভিপ্রায় তৈরি হল। এর মুলকারণ হলো, সর্বগ্রাসী বস্তুবাদের প্রতিগভীর অবিশ্বাস। তাঁরা যুগের মুকুরে দেখেছিলেন অবদমিত ইচ্ছার প্রতিফলন; মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সংশয়িত জীবনবাদের বিপর্যয়। আল মাহমুদের কবিতায়

www.pathagar.com

প্রার্থনার ভাষা আলোচনা করতে এই পটভূমি আনতে হলো। একটি বিশ্বাসের অবধারিত মুগ্ধতায় যখন কবি আকৃষ্ট হয়ে যান তখন বিশ্বাস আর কবি আত্মা একে অন্যের সাথে লীন হয়ে যায়। 'শব্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে কোনো সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আধুনিক মানসের আদি ও অন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাস ও পরিপার্শ্বের অসংখ্য সমান্তরাল সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং ফলে এ বহুধা– বিস্তৃত রসের মধ্যে তার জাগরণ ঘটে। এ যেন বস্তুর স্থূল মাংসের স্তর থেকে স্তর অতিক্রম করে মূল শাসের দিকে অগ্রসর হওয়া, প্রতিষ্ঠিত প্রতীকগুলোকে অভিব্যক্তির নিবিড়তর পর্যায়ে একাত্ম করে স্তম্ভের মত ব্যবহার করা। সভ্যতার বিবর্তন - পরম্পরা ও মানব প্রতিভার পরিকর্ষণ - মানব সমাজের ওপর সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থা জনিত প্রতিক্রিয়ায় লালিত। সমগ্রতা সন্ধানী মনন ব্যক্তি কবিতার উত্তরণ খুঁজতে প্রায়শ হাজির হন বিশ্বাসের দরোজায়। একদিকে অস্তিত্ববাদ অন্যদিকে অস্তিত্বনিহিত প্রাণচাঞ্চল্যের আসল রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টায় কবি যত অগ্রসর তিনি তত সার্থক রূপকার হিসেবে চিহ্নিত। আল মাহমুদ স্বাতন্ত্র্যকামী ও পরিণতির জন্য উন্মুখ বাঙালি মুসলমান সমাজের মনন চর্চার পটভূমিতে একেছেন বিশ্বাসীর জন্য কবিতার নতুন এক চিত্র। যা ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে উত্থিত। নিস্তরঙ্গ সমাজের চাইতে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমাজের কথা অনেক বেশি। প্রাক ইসলামী যুগে সমাজ পরিবর্তনের গতিধারা আল মাহমুদকে আকৃষ্ট করে। আর ইতিহাসের গতিধারা মননশীলতার যে ব্যাকুলতা আনে তা কবিতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর এক্ষেত্রে আল মাহমুদ একজন সার্থক রূপকার।

১। 'হেরার বিনীত মুখে বেহেস্তের বিচ্ছুরিত স্বেদ
শান্তির সোহাগ যেন তাঁর সেই লালিত আহবান,
তারই করাঘাতে ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ
দুঃখীর সমাজ যেন হয়ে যাবে ফুলের বাগান।'

(হজরত মুহাম্মদ সঃ)

২। সালাত ভাঙলো। আমিন, আমিন–
প্রতিটি মসজিদ থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছেন। যেন কেউ
ওমরের গণকোষাগার থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন
হিসেবকরা দিনার।

(অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না)

ইসলাম ধর্মে পুনর্জীবনের কথা বলা আছে। হাশরের মাঠ, বিচার, স্বর্গ-নরক এসবের বর্ণনা আছে। আল মাহমুদ 'পুনরুত্থানের ফুৎকার' নামে একটি কবিতা লিখেছেন। মৃত্যু

www.pathagar.com

পরবর্তী কিয়ামতের বিষয়-আশয় এতে বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতাকে এমনভাবে আল মাহমুদ ভেঙে চুরে নতুন ফর্ম দিয়েছেন এই কবিতার মাঝে যা চট করে বলা যাবে না, এটা অনুগল্প নাকি গদ্য কবিতা? বৈচিত্র্যগামী মানসপ্রবণতা তাকে জীবন শিল্পের কাছে করেছে প্রজ্ঞাস্পন্দিত ও সমগ্র সন্ধানী মনন ব্যক্তিত্ব। সচেতন বিষয়মুখীনতা তাঁর কবিতাকে করেছে উর্বর বনভূমি। আর সেই কারণেই তার বিষয়বিস্তার ও শিল্পশৈলী মাহমুদীয় নামক বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, ডালপালায় এতোটা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

'ধ্বংসের ফেরেস্তার মুখে সত্যি কি অশ্রুর দাগ? নাকি প্রথম ফুৎকারে উড়ে যাওয়া সৌর শৃঙ্খলা বিচূর্ণিত ধুলিকণায় এক অলীক বেদনার চিহ্ন আপনা থেকেই অংকিত হয়েছে ফেরেস্তার চেহারায়? অথচ সামান্য কম্পনও অনুভূত হচ্ছে না মুখের রেখায়। তার ঠোঁট দুটি গোল হয়ে শিঙ্গার সরু মুখটি ধারণ করে আছে। যেন অপাপবিদ্ধ দেবশিশুটি তার নির্ভর খেলনা বাঁশীতে ফু তুলতে গিয়ে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে দ্বিতীয় ফুৎকারের জন্য দম নিচ্ছে।

[পুনরুত্থানের ফুৎকার]

আবার লক্ষ করি

'পৃথিবীর পেট থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে। পিঁপড়ের সারির মত তারা ছুটে চলছে। সেই ময়দানে যেখানে, আদম ও হওয়ার সমস্ত সন্ততির সংকুলান সম্ভব বলে তারা আগে থেকেই জানে। তারা একটি মাত্র বিহ্বল বাক্যে পরস্পরকে সচেতন করতে।

চাইল, আজ হাশর।

তারা চলেছে সেই ময়দানে যেখান থেকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হলে অনন্তকালের

আনন্দ কিংবা অনুতাপদগ্ধ অসহনীয় দোজখের দিকে। [পুনরুত্থানের ফুৎকার]

একটি কবিতা তার সৃষ্টিশীলতার স্বতন্ত্রতায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং এক সময় মননশীল বিশ্লেষণী প্রজ্ঞার প্রেরণা বিন্দুতে পরিণত হয়। আল মাহমুদের 'পুনরুত্থানের ফুৎকার আমাদের সেই দিকে টেনে নিয়ে যায়। কারণ, আমাদের সামাজিক অবস্থান ও ঐতিহ্যিক চেতনা আমাদের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে হয়ে উঠেছে প্রাণ-প্রদীপ্ত। আর তাই শিল্পের সাথে জাতিসত্তার অভিনিবেশ ঘটায়, এই কবিতা দেশ ও মৃত্তিকায় সঞ্চালিত হয় শেকড়ের দিকে। যা আমাদের স্বাজাত্যবোধকে দৃঢ় করে। অনিবার্য আলোকরশ্মির মতো আমাদের চিনিয়ে দ্যায় আমাদেরই ইতিহাস ও মিথ। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর কালগত প্রেক্ষিতে এই অনুভব ও চেতনা জাগানো সত্যিই বিস্ময়কর। সকলেই যখন বৃষ্টিতে ঘরে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করেন, তখন আল মাহমুদ একাই কঠোর সত্যভাষণ দিয়ে চলেছেন। সত্যবাক্ বিধায়, আল মাহমুদের কবিতার

www.pathagar.com

মাঝে বুনিয়াদী প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস, সমকাল ও জীবনচেতনার এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ফলশ্রুতিতে যা লিখেছেন, কালের দিক থেকে তার মূল্য অপরিসীম।

শেষ কথা ঃ আল মাহমুদ প্রেম, প্রকৃতি, দ্রোহ আর প্রার্থনার কাব্যগ্রন্থ আধুনিক বাংলা কবিতায় এক বিশেষ সংযোজন। পুরাতন ও নতুন কবিতার সংঘবদ্ধ বসবাস এক ধরনের নতুন পটভূমি সৃষ্টি করেছে। আল মাহমুদ আধুনিক কবি। তবে সময়ের সর্বশেষ মেসেজ তার কবিতায় বিদ্যমান। আধুনিক কাব্যের চিত্রকল্প ও প্রতীক কবি চৈতন্যের এই অন্তর্গূঢ় অভিক্ষেপে অবয়বগত প্রকাশ পর্যায়কে অতিক্রম করে উপনীত হয়েছে ব্যক্তি অন্তর্নিহিত প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে, তার সজ্ঞান সত্য-অন্বেষার বেলাভূমিতে। এ প্রসংগে হাসান হাফিজুর রহমান বলেছেন, 'শব্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে কোনো সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আধুনিক মানসের আদি ও অন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চেতনা স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস ও পরিপার্শ্বের অসংখ্য সমান্তরাল সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং ফলে এক বহুধা-বিস্তৃত রসের মধ্যে তার জাগরণ ঘটে। এযেন বস্তুর স্থূল মাংসের স্তর থেকে স্তর অতিক্রম করে মূল শাঁসের দিকে অগ্রসর হওয়া, প্রতিষ্ঠিত প্রতীকগুলোকে অভিব্যক্তির নিবিড়তর পর্যায়ে একাত্ম করে স্তম্ভের মত ব্যবহার করা।'

আধুনিক কবিতায় শিল্পচেতনা ও যুগচেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন আল মাহমুদ। যা ইউরোপ-আমেরিকার কাব্যগ্রন্থগুলোতে আমরা দেখতে পাই, সভ্যতার বিবর্তন, মানব প্রতিভার পরিকর্ষণ ও সমাজে তার প্রভাব আমরা দেখি তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে। আর তাই আজকের বাংলা কবিতায় যুক্তির কষ্টিপাথরে আল মাহমুদ হয়েছেন অস্তিত্ববাদী জাগ্রত এক শিল্পীসত্তার নাম।

www.pathagar.com

সবুজের চাষবাস

কখনো কখনো গদ্যভাষা আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করে আমরা ভুলে যাই, আমরা কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ-চিন্তা-চেতনের বহিঃপ্রকাশ পড়ছি। আমরা পড়ছি হয়ত কোনো গল্পের সরস দিক। যা মানবিক ও সামাজিক দিক ছাপিয়ে অন্য এক পর্যায়ে উপনীত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা আজ আল মাহমুদের প্রবন্ধ ভাষা ও জ্ঞান নিয়ে কথা বলবো।

দু'টি ভ্রমণ বৃত্তান্ত (কবিতার জন্য সাত সমুদ্র এবং কবিতার জন্য বহুদূর) সহ মোট ৬১টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ব্যক্তিগত ভাবনা নিয়ে আল মাহমুদের প্রবন্ধ সমগ্র এখন পাঠকের দরোজায়।

প্রথমতঃ আল মাহমুদ একজন কবি এবং কবি অত:পর কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক। মজার বিষয় হলো একজন কবি যখন স্বপ্ন-কল্পনার মিশেল স্রোত সাঁতারে প্রবন্ধের ভাষায় কথা বলা শুরু করেন, তখনই তা হয়ে যায় কাব্যময়। নানান ভাষা ও শব্দের খোলা হৃদয়ে গদ্য ভাষা হয়ে ওঠে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। আল মাহমুদ তার প্রথম গদ্য 'আমি ও আমার কবিতা শীর্ষক লেখায় ভাবনা-চিন্তার স্ফুরণকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। নিজ জেলার আচার-ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি- মানবিক বন্ধন-শিক্ষার আলোকিত দিক প্রভৃতি বিষয়ে অল্পকথায় বিশ্লেষণ করেছেন। এবং কবি আল মাহমুদের পূর্ব পুরুষদের প্রাচীন রক্ষণশীলতা আর ধর্মীয় শাসনাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কবিতার মাঝে ধর্মীয় মিথ নান্দনিক সত্তায় যেভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এর মূল রহস্য যে আল মাহমুদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন তা 'আমি ও আমার কবিতা' গদ্যে ভালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। একই গদ্যের মাঝে আল মাহমুদ কবিতার পথ পরিক্রমায় যে সংগ্রামমুখর জীবন, তারও প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

মুসলীম সভ্যতার পাদপীঠ সৌদি আরব কেন্দ্রিক একটি চিন্তন আল মাহমুদের এই গদ্যের মাঝে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'সমকালে রবীন্দ্রকাব্যের উপযোগিতা'– শীর্ষক গদ্যে

www.pathagar.com

বাংলাদেশী বাঙালি জীবনে মননচর্চার যে বিষয়টি আল মাহমুদ দ্ব্যর্থকণ্ঠে বলেছেন তা অনেকেই নাকচ করে দিতে চাইলেও ভাবতে হয়। কেন একজন বড় কবির এমন আকুলতা? আল মাহমুদ যখন লেখেন– 'একারের কবিরা হলো তাড়া খাওয়া, শিকারীর গুলীর শব্দে সচকিত বুনো হাঁসের ঝাঁক। যারা পৃথিবীতে ও আকাশের মেঘপুঞ্জে ক্রমাগত আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থার স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়ায়, তারা এমনকি একটি হরিৎ অরণ্যও খুঁজে পাচ্ছে না, যেখানে বিশ্রামের মধ্যে বাঁচার অর্থ খানিকটা উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে তেমনি জীবন ধারণের এক অর্থবহ বিশ্রাম বা আশ্রয়ের মত। .... বাংলা ভাষার আধ্যাত্মিক মর্মস্থলে পৌঁছতে হলেও এদেশে রবীন্দ্রচর্চার একান্ত দরকার। মরমিয়া সাহিত্যের যে রহস্যভান্ডার একদা রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের চারণ কবিগণের কাছ থেকে উদারভাবে গ্রহণ করেছিলেন, একই বিষয়ে বাংলাদেশের তরুণ কবিগণ আবার রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। যা সাম্প্রতিককালের কবিকে দেবে এক রহস্যময় আনন্দের অপার্থিব সান্ত্বনা। ... রবীন্দ্র-সাহিত্য ও নাট্যসম্ভারকে আমরা ব্যবহার করবো আমাদের মত করে। একটি উদীয়মান সার্বভৌম জাতির প্রতীক হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের মতো করে নয় কারণ ভারতে রবীন্দ্রনাথ হলেন এক গৌরবের বিষয় মাত্র। আর আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নিত্য ব্যবহার্য। জীবনী শক্তির উৎস্বরূপ। আমাদের দেশের অসংখ্য কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক, কামার- কুমার, মাঝি, মাল্লার মানবিক মূল্যবোধের ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার।' বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কতোটা জরুরী ও প্রয়োজনীয় তা আল মাহমুদ এই আলোচনাতেই বুঝা যায়।

'মনিরউদ্দীন ইউসুফ ; কবি ও অনুবাদক' লেখাতে নিজের ভাবনা- জিজ্ঞাসার সম্মিলিত সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যা পাঠে আল মাহমুদের প্রবন্ধ ভাষা ও মনিরউদ্দীন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। 'অমিয় চক্রবর্তী : কেঁদেও পাবে না তাকে'- লেখায় স্মৃতিচারণমূলক ঘটনার বর্ণনা করেছেন। যা অত্যন্ত সুখপাঠ্য। ত্রিশের পঞ্চপাণ্ডবের একজন অমিয় চক্রবর্তী। দৃশ্যত এই গদ্যে অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিচয় ও প্রাবন্ধিক আল মাহমুদ আমাদের দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রসংগে বলেছেন– 'আশি বৎসরের ধ্যানে মানুষের দুঃখকে তিনি ভোলেননি, মানুষকে বিশ্বাস করেন বলেই তার ভ্রষ্টতা তাকে বিঁধেছে। হন্যেনীতিকে আর্থিক বা পারমার্থিক অঞ্জলি দেননি– কেননা পাপের প্রসারে মানুষের ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভয়হীন, কেননা তা কারুণিক এবং দলীয় স্বার্থের বিরোধী' (অমিয় চক্রবর্তী)।

গদ্য লিখতে গেলে নির্মোহ হতে হয়। সমাজের চিরচেনা সভ্যতার বিশ্লেষণ করতে গেলে সমালোচকের কলম হতে হয় নির্মম, কঠোর ও অন্তর্দৃষ্টিভেদী একজন সেনাপতির মতোন। আজকের বাংলা সাহিত্যে হাত-ধরে পথচলার যে সরুরাস্তা নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে তা ক্ষণিকের। ভঙ্গুর। ধ্বংস অনিবার্য। আল মাহমুদের গদ্যে আমরা সে ইংগিত দেখতে পাই। কাছ থেকে জসীমউদ্দীনকে দেখেছেন। ত্রিশের আধুনিক বাংলা কবিতার

www.pathagar.com

নতুন ডঙ্কায় যখন বাংলা কবিতার পালে অন্য এক ইংরেজ বাতাস বইতে শুরু করেছিল সে সময় জসীমউদ্দীন পল্লীবাংলায় ফিরে চাষী মুসলমানদের নিয়ে যে রচনা শুরু করেছিলেন, কালের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আজ মহাকালের দরোজায় তার স্থান, আল মাহমুদের স্মৃতিময় ঝুড়িতে অনেক কাহিনী জমা আছে। গদ্যে সুযোগ পেলেই তিনি সংযোজন করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য প্রাবন্ধিক আল মাহমুদ ধন্যবাদ পাবার দাবীদার। নিজের কবিতার ধারা প্রসঙ্গে জসীমউদ্দীন, আল মাহমুদকে বলতেন– "এটাই হলো চর্যাপদের ধারা, দেশের মাটি থেকে উঠে এসে আমার হাতে লালন পেয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে। যে কবির 'বাণী লাগি' রবীন্দ্রনাথ কান পেতেছিলেন– আমিই সেই। আমিই পথিকৃত, মাটির কাছাকাছি।' এই কথাগুলো গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উচ্চারণ করেছেন সাহিত্য সাধনা সংঘের মাসিক সভায় পুনরায়।

কবি, প্রাবন্ধিক সৈয়দ আলী আহসান সম্বন্ধে আল মাহমুদের মন্তব্য সম্ভবত এ যাবতকাল যে ক'জন আলোচক সৈয়দ আলী আহসান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাদের মঝে সময়োচিত ও সঠিক। 'একজন কবি যখন কাজ করেন অর্থ্যাৎ শব্দের ভেতর দিয়ে বহির্জগত ও অন্তরের অনুভূতিকে, বিশ্বাসকে বিষাদ ও বেদনাকে, প্রেম ও বেদনাকে, প্রেম ও পরিণামকে বাণীর মাধুরী দান করেন, আমরা জানি না সে কারুকর্ম কিভাবে সাধিত হয়। অফুরন্ত শব্দমালা যা প্রতিনিয়ত বিশ্বের মানব বসবাসের অঞ্চলগুলোকে আলোড়িত রাখছে, ইথারকে কম্পিত করে বেজে উঠছে যন্ত্রে, ছবির পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে কানের ভেতর দিয়ে আমাদের দ্রুত ধাবমান রক্তস্রোতকে আকুল করে দিচ্ছে, মাংসপেশীতে আছড়ে পড়ছে শব্দের আনন্দ কিংবা দুঃখময় আঘাত, তা কিভাবে কবিরা শনাক্ত করেন নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্তে আমরা জানি না। আমরা কেবল জানি, অব্যবহার্য শব্দমালা যথা সম্ভব অবলীলায় পরিত্যাগ করে তারা এগোতে থাকেন। শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের নিগড় থেকে সাপের মতো ফণা তুলে কাঁপতে থাকে দারুণ দংশনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যবিধ অর্থের বিদ্যুৎ। যিনি এই সংগ্রহ ও বর্জনের কাজটি নীরবে একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করেন। আক্ষেপের বিষয়, সুদূর অতীত থেকে লোকালয়সমূহে তাকে একটিমাত্র অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দে অভিনন্দন জানিয়ে আসা হয়েছে এতদিন। 'কবি' তিনি। আর কোনো সম্মান যেনো তার প্রাপ্য নয়। অথচ রংয়ের শব্দের স্বাদের ও গন্ধের পার্থক্য পৃথক-পৃথক উপলব্ধি যিনি করেছিলেন। 'কবি'- এই একটিমাত্র শব্দের আঁধারের মধ্যে এতবড় ব্যক্তিত্বকে কিভাবে ধরানো সম্ভব? সৈয়দ আলী আহসানের 'উচ্চারণ' পাঠ করতে গিয়ে উপরোক্ত প্রশ্ন আমাকে সর্বক্ষণ তাড়িত করেছে। অত্যন্ত ঈর্ষা মিশ্রিত শ্রদ্ধার সাথে আমি লক্ষ্য করলাম জ্ঞান, বিনয়, সম্মোহনকারী বাক্যোচ্চারণের মায়াবী কৌশলদ্বারা প্রেম নিসর্গ ও নিয়মের অজ্ঞাত সম্বন্ধসূত্রে আবিষ্কারে তিনি তরুণদের পশ্চাদবর্তী করতে চাইছেন। আর সে জ্ঞান কবিত্বে, কৌশলে ও আধুনিকতায় এমনভাবে উন্মোচিত হয়েছে, নিরপেক্ষ কবিতা প্রেমিকমাত্রই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

www.pathagar.com

আমরা আল মাহমুদের প্রবন্ধ ভাষা নিয়ে কথা বলছিলাম। কাজী নজরুল ইসলাম; শামসুর রাহমান খ্যাতিমান কবিদের কবিতা, ভাষা শৈলী ও নির্মাণ কৌশলের যে ব্যাখ্যা আল মাহমুদ দিয়েছেন, তা প্রকৃত সমালোচকের ন্যায় নতুন সমালোচনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। নজরুলের বিশাল ভাণ্ডারে আল মাহমুদের রয়েছে মুগ্ধ কৌতূহল। তেমনি সমকালীন পঞ্চাশের কবিবন্ধু শামসুর রাহমান 'প্রসঙ্গে' পরিবেশ, শামসুর রাহমান, তার কবিতা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই, এক ধরনের শ্রদ্ধা মিশ্রিত কাব্য হিংসা। নজরুলের ভাষা ও ছন্দে যেখানে আল মাহমুদরে সমীহ লক্ষ্য করি, সেখানে কবি শামসুর রাহমানের কবিতার ক্ষেত্রে দেখি উচ্ছ্বাস আর ভালোবাসাময় শ্রদ্ধাঞ্জলি। শামসুর রাহমান প্রসঙ্গে আল মাহমুদ যখন বলেন- 'নির্বিকার কড়ির মতো শুধু অনুভবের যাদুভরা এমন চোখ তো আর কারো নেই। চরম সুখ ও চরম দুঃখের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে একমাত্র কবিই তাদের পরম বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করেন, যা কাতরোক্তি কিংবা প্রার্থনা নয়। বড়ো জোর আমরা তাকে বলতে পারি স্বীকারোক্তি। মায়াবী দৃষ্টির অধিকারী এক দর্শকের, গন্ধময় উচ্চারণের অধিকারী এক কণ্ঠস্বরের। যার অপর নাম কবিতা। এই প্রবন্ধের শিরোনামে যার চেহারা তিনিও তেমনি লোক। .....এমন যখন পরিবেশ, তখন শামসুর রাহমান, আমাদের একমাত্র কবি, যিনি সমস্ত তরুণ মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর দু'টি অপরূপ কাব্যগ্রন্থ দ্বারাই শুধু নয়, তিনি তরুণতর কাব্যান্দোলনের প্রতি ব্যক্তিগত সমর্থন জানিয়েছেন?' এই প্রবন্ধে আল মাহমুদের নিজেরই বিহিত চেতনা আর চেতনালব্ধ কর্মশক্তির প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যা সততা নিষ্ঠা, আন্তরিকতার প্রলেপে আচ্ছাদিত। আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই আল মাহমুদের প্রবন্ধ জ্ঞান অত্যন্ত উঁচুমানের। তাইতো সমকালীন কাব্যবন্ধুদের বিষয়ে লিখতে যখন সকলেই এক ধরনের চতুরতার আশ্রয় নেয়, ছলাকলার মাধ্যমে বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যান তখন আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান প্রসংগে কাব্যের সুষমামণ্ডিত দিকগুলোর মোড়ক উন্মোচন করলেন। বাংলাভাষাভাষী অনেকেই শামসুর রাহমানের কবিতার ব্যাখ্যা, তরজমা করেছেন। কিন্তু সমকালীন সতীর্থদেরকে নিয়ে আল মাহমুদের এই বিশাল আয়োজন শিল্পের জন্য শিল্পীর অন্তপ্রাণ সব সময় যে ব্যাকুল থাকে তার বহিঃপ্রকাশ।

সত্যের চেহারা, বুদ্ধিজীবীদের ভারসাম্যহীনতা, সাংস্কৃতিক বেহায়াপনা, মানুষ-নারী শুধু দেহসর্বস্ব নয়, ওড়না সংকট; বেনজীরের পরামর্শ এবং ফ্রান্স, এ সূর্য আমাদের আলো দিতে আসেনি, আহমদ শরীফরা ব্যবহারেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে, এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সেমিনার, লেখক শিবিরের ইসলাম বিরোধিতা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকাণ্ড, বইমেলায় মাস্তানী, লেখক-কবিদের আত্মবিরোধ ও বইমেলা, সাংস্কৃতিক অঙনে কালসাপের দৌরাত্ম্য, পৌত্তলিক সাহিত্যের আগ্রাসন, দেশ প্রেমহীন বইয়ের ব্যবসা, ভারতীয় বইয়ের একাধিপত্য, আমার সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম; জাতীয় সংস্কৃতি এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন, এদেশের মানুষ চোখে ঠুলি লাগিয়ে বসে নেই, ধর্ম নিয়ে ফাজলামি, বিটিভি ও ধর্ম বিশ্বাস, জাতীয় মিডিয়ার বিজাতীয় সংস্কৃতি জাতীয় কবিতা

www.pathagar.com

উৎসবে যা বলা হলো, শিল্প মেলার নামে মদ, জুয়া অশ্লীল নাচ, কলকাতার বাঙালিরা এখন কলকে পাচ্ছে না, দরজা খুলে সাংস্কৃতিক পরাজয়কে ডেকে আনা হচ্ছে, কলকাতার সাংস্কৃতিক আধিপত্য আমরা মানি না, সাংস্কৃতিক আধিপত্য মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম চাই, আজান ও উলুধ্বনিকে একাকার ভাববেন না, অজ্ঞতাই ইসলাম বিদ্বেষের উৎস, বামপন্থিদের ইসলাম ভীতি, প্রতিক্রিয়াশীল ২২৯ জন বুদ্ধিজীবী, সাতচল্লিশ বুদ্ধিজীবীর ধূম্রজাল সৃষ্টি, বাংলাদেশ কোনো প্রমোদ তরী নয়, সাবধান, ইসলাম কখনও কালের নিদ্রায় ঘুমিয়ে কাটায় না, কমিউনিস্টদের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা, পরাজিত মানবচিন্তা কখনো পুনর্বাসিত হয় না, নৈতিক অধঃপতনই বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা, স্নায়বিক উত্তেজনা, উপশমের উপায়, নৈতিক অবক্ষয় ঠেকাতে ইসলাম শিক্ষা চাই– এই বিশাল প্রবন্ধগুলো সাহিত্য সংশ্লিষ্ট কতোটা তা আলোচনার, ব্যাখার দাবীদার। তবে সাহিত্য যেহেতু সমাজের কথা বলে, রাষ্ট্রের কথা বলে, শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, শ্রেণী সংগ্রামে মানবতার পক্ষে সাফাই গায়, তাই আল মাহমুদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা কালের কণ্ঠ বলতে পারি। রাষ্ট্রচেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলে মৌলিক কবি সমাজে স্বপ্ন বিকোতে পারে না। কারণ আকুলতা, আর স্বপ্ন উদ্‌গীরণ হয় সমাজের ক্ষত থেকে । বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা বলতে পারি, আল মাহমুদের প্রবন্ধ সময়োচিত এবং কালের অনেক অসত্য ও মিথ্যার বেসাতির উন্মোচন করেছেন। একজন কবির প্রচণ্ড মানবিক আত্মবিশ্বাস না থাকলে অকপটে এমন সত্য উচ্চারণ সম্ভব নয়। বিশেষত আমরা লক্ষ্য করি, প্রবন্ধের ভাষায় আল মাহমুদের কোনো ছলাকলা নেই। নেই চতুরতার আশ্রয়। রহস্য করে গোলক ধাঁধায় ফেরার কোনো প্রচেষ্টাই আল মাহমুদ করেননি। এখানেই প্রাবন্ধিক আল মাহমুদের সফলতা ও সার্থকতা। তবে গ্রন্থটির যে বিষয়টি দৃষ্টিকটু ও অপরাধ বলে গণ্য করা যেতে পারে তা হলো প্রচণ্ড বানান ভুল। প্রতিটি গদ্যে বানান ভুল যেনো পাল্লা দিয়ে নেমেছে। কোন গদ্যে কত বেশি বানান ভুল রাখা যায়। নাসিম আহমেদের প্রচ্ছদে নিউ শিখা প্রকাশনী এই একটিই গর্হিত কাজ করেছেন। আর তা হলো বানান ভুল।

কালের মানদণ্ডে এই গ্রন্থটি কতোটা কালোত্তীর্ণ হবে তা সময় বলে দেবে। তবে আশার কথা এটি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি অনন্য দলিল বলা যেতে পারে। একজন কবি প্রাবন্ধিক, গবেষক, মুক্তিযোদ্ধা আল মাহমুদ অসংখ্য ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা পাবার দাবিদার।

www.pathagar.com

কাম প্রকৃতি ইতিহাস ও সমাজ চেতনার কাপ্তান

তাঁর প্রতিটি কবিতা আঁটো এবং ঝকঝকে, নিপুন ছন্দ, অমোঘ শব্দাবলী এবং তীক্ষ্ণ ভাষণ। বিশেষত তাঁর অধিকাংশ কবিতার ভাষা ও ভঙ্গিমা গভীরভাবে অনুধাবন করতে শেখায় তাঁর ভাষাজ্ঞান ও কবিত্বময়তা বুঝতে। তিনি ক্রমশ এগুতে থাকেন এভাবে পিচ্ছিল পথে হেঁটেছেন, সতর্কভাবে পা ফেলে। অনিবার্য বিপ্লব যেখানে সংগঠিত সেই ষাটের দশকে, তখনও তিনি বিপ্লবী হয়ে উঠলেন না। এগুতে থাকলেন নিজ ভাষায়, নিজ শ্রমে, নিজ চেতনায় সামনের দিকে। এভাবে চলতে-চলতে তিনি পথের দু'পাশ থেকে কুড়াতে লাগলেন এদেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সামাজিক নিয়মনীতি, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলার কোমল প্রেম, তিনি কবি আল মাহমুদ।

মধ্যপঞ্চাশ সাহিত্য সাগরে যাত্রার প্রারম্ভ থেকে কবি বেশ কিছু বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি তিনি একটু বেশিই আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। আর সে কারণে তাঁর অধিকাংশ কবিতায় তাঁর কামচেতনা, প্রকৃতি চেতনা, ইতিহাস চেতনা, সমাজ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আল মাহমুদের এই চারটি চেতনা একপাত্রে রান্না হয়ে আলাদা স্বাদের, আলাদা ধাঁচের, এক আধুনিক কবিতার জন্ম হয়েছে। আর সে কারণেই আল মাহমুদ, জীবনানন্দ, কিংবা জসীম উদ্দীনের নগর সংস্করণে এ কথা বলা যাবে না। আল মাহমুদ এই চার চেতনাকে পুঁজি করে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন গদ্যফর্মে। সেখানে ছন্দ প্রবেশ করিয়েছেন সুস্থ ও ঠাণ্ডা মাথায়। আর সে কারণেই গদ্যক্রান্ত ছন্দ মিশ্রিত কবিতা আধুনিক পাঠকের মনে উষ্কার ধ্বনি তোলে। এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল মাহমুদের গদ্য কবিতা নম্র, কোমল, বিনয়ী ও ভাষায় ঝাঁঝালো রূপ নেই।

আল মাহমুদের কামচেতনা : সৌন্দর্য বিভায় উদ্ভাসিত কবিহৃদয় সর্বদা সুন্দরের

www.pathagar.com

পূজারী। আল মাহমুদের অসংখ্য কবিতা কামকলায় পরিপূর্ণ। তাঁর এসব কামচিত্রিত কবিতা পাঠকহৃদয়ে ঝড় তোলে। নারী, শরীরী কাম তাঁর কবিতার অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। পরিমিত বোধ, রুচির আভিজাত্য ও কামকলার অপূর্ব চিত্রায়ন আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় এমনভাবে পরিস্ফুটন করেন, মনে হয় কোনো চিত্রশিল্পী তার রঙতুলিতে কোনো জলরঙ চিত্র এঁকে দর্শককে দেখাচ্ছেন। আল মাহমুদের কামকলার কয়েকটি উদাহরণ :

ক. 'ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায় চরের মাটির
মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ

(সোনালী কাবিন)

খ. তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশি ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ।

(সোনালী কাবিন)

গ. শুরু হোক স্তোত্র পাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে
পীতাভ ধোঁয়ায় এলে ডুবে থাক মন্দির-দেহলি,
শঙ্খমাজা স্তন দু'টি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি,
লজ্জায় বিবর্ণ মন ঢেকে যাবে ক্রিসেনথিয়ামে
অথবা রক্তের নাচে শুরু হবে সিম্ফনির সুর
বৃষ্টির শব্দের মতো মনে হবে তোমার নূপুর।

(সিম্ফনি : লোক লোকান্তর)

ঘ. কনক জংঘার বিপুল মাঝখানে
রচেছো গরিয়সী এ কোন দর্প?
আকুল বাঁশরীর অবশ টানে টানে
কনক জংঘার বিপুল মাঝখানে
আবাস ছেড়ে আমি আদিম উত্থানে
ধরেছি ফণা নীল আহত সর্প

www.pathagar.com

কনক জংঘার বিপুল মাঝখানে
মেলেছো গরিয়সী এ কোন দর্প

(শোণিতে সৌরভ : কালের কলস)

ঙ. সঙ্গমসুখী রাতের পাখিরা
শব্দ করে
আমাদের প্রতি জানালো তাদের
অবোধ ঘৃণা:
তুমিও বুকের বোতাম বাঁধন
আলাগ করে
বললে নীরবে, আমাকে করো
লজ্জীহীনা।

(স্মরণ : লোক লোকান্তর)

পাঁচটি উদাহরণেই আল মাহমুদের দুর্বার কামচেতনা প্রকাশিত। আল মাহমুদের এই কামচেতনায় কোনো রাখ-ঢাক বিষয় নেই প্রতিটি কথা সরাসরি এবং আশ্চর্য এক চিত্রকল্পময়তায় ভরা উপমায় কোনো বালখিল্যতা নেই। আছে দৃশ্যের ভেতরে দৃশ্য লক্ষ্য করার এক অভিনব পন্থা। কবি একবার বলেছেন- 'চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ। এই একটি পংক্তিতেই তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যতা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি গ্রামবাংলার কবি। কিন্তু আধুনিক উপাদান পুরোটাই তাঁর বিদ্যমান। তিনি তার কামকে ভোগ করতে চান শিল্পময় এক ঢঙে। যে ঢঙ কবি কল্পনা করেছেন চরের মাটির সাথে। চরের মাটির দু'ফাঁক হয়ে যাওয়ার দৃশ্য যাঁরা চাক্ষুস করেছেন তাঁরা জানেন কতোটা নান্দনিক ও চিত্তকে উৎকর্ষতা দান করে সে দৃশ্যাবলী। কারণ চতুর্দিকে পানিবেষ্টিত এলাকায় যে একখণ্ড চর জেগে ওঠে সেখানে উত্তাপে মাটি শুকিয়ে গেলে হঠাৎই ফাঁক হয়ে যায়। আশ্চর্য উপরে কট্‌কটে শুকনো বালিমিশ্রিত মাটি অথচ নীচেই মাটি কোমল আর্দ্র এবং সতেজ। কবি এ কথাই নারীর সাথে এক সুতোয় বেঁধে তা প্রত্যাশা করেছেন নারীর নিকট। তাঁর প্রিয়তমার নিকট। এখানেই আল মাহমুদের কামচেতনার সার্থকতা।

আল মাহমুদের প্রকৃতি চেতনা : আল মাহমুদের পঞ্চাশের দশকে নগর ছেড়ে গ্রামমুখী হলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক বেশে, এতে করে আল মাহমুদ প্রকৃতিমুখী হয়ে প্রকৃতি প্রেমে পড়ে যান। যা তাঁর গ্রামীণতা গ্রাম প্রেম পড়ে মোড় নেয় সম্পূর্ণ অন্যদিকে। প্রকৃতি চেতনা আল মাহমুদকে ক্রমশ গ্রাম থেকে গ্রামীণ প্রকৃতিতে এমনভাবে ধাবিত করে যেভাবে মজনু-লাইলী প্রেমে দিওয়ানা হয়ে বিজন মরু পথে ছুটে যান। অমোঘ এক প্রেম পিয়াসীর কারণে।

www.pathagar.com

ক. এ কেমন অন্ধকার বহুদেশে উত্থান রহিত
নৈঃশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না
নদীগুলো দুঃখময়, নির্পত্যা মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্য কোন শ্যামলতা নেই।

(রবীন্দ্রনাথ : কালের কলম)

খ. একটি কাশের ফুল তারপর আঙুলে আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটে চলে গেছি। শহরের
শেষপ্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা
সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শর্বরী তিতাস
কি গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার।

(তিতাস : লোক লোকান্তর)

এ উদাহরণগুলোতে আল মাহমুদের বিষয়েও যেমন, তেমনি প্রকারণেও এক ধরনের মোচড় লক্ষ্য করা যায়। যা তাঁর কবিত্ব শক্তির বিশালতার ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যেক কবিরই 'প্রকৃতিপ্রেম' রয়েছে।

প্রকৃতিপ্রেম আল মাহমুদেরও আছে। তবে প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে আল মাহমুদের শৈশব-কৈশোর তাঁর পরিণত বয়সে ও তাঁর সাথে-সাথে ঘোরাফেরা করে স্মৃতির করোটিতে। কারণ বাল্যে আল মাহমুদ গ্রামের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী যেভাবে অবলোকন করেছেন আজকের ব্যস্ত সময়ের কালিতে কবি তাহাই অবিকল ফুটে তুলেছেন। এবং তাঁর এই চেতনা পাঠে মনে হয় আমরা 'তিতাস নদী' নয় আটষট্টি হাজার গ্রামবাংলার যে কোন নদীরই চাক্ষুস অবস্থা অনুভব করতে পারছি। 'আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শর্বরী তিতাস। কি যে নদীর জলশব্দের প্রাণ অনুভব তা একজন আল মাহমুদ ফুলের সৌরভের মতোনই পাঠকের অন্তরে সফলভাবে প্রবেশ করাতে পেরেছেন। যা বোধে পৌঁছে বোধোদয় ঘটে।

আল মাহমুদের কবিতায় ইতিহাস চেতনা : এজরা পাউন্ড সারাজীবন সপ্তসিন্ধু কোরে বেড়ালেও নিজের দুর্মর মার্কিনীসত্তা হারিয়ে ফেলেননি কোনোদিন। মৌলিক কবিতায় তো বটেই, একভাষা থেকে অন্য ভাষায় খেয়া পারাপারের সময়েও ঐ মার্কিনী স্বভাব বের হয়ে পড়ে। মূলের প্রতি একান্ত অনুগত হয়েও স্বতন্ত্র স্বভাবের মৌলিক কবি আল মাহমুদ দেশ-কালের ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত সচেতন। এদেশে মূল অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আল মাহমুদের কবিতায় এমনভাবে উপস্থিত যা অনেকেরা নতুনত্ব বয়ে এনেছে। সেই ঘটনা, সেই প্রেক্ষাপটের উপর আল মাহমুদীয় ফ্লেভার, ব্যাস তাতেই ঘটনা এমনভাবে এ সময়ের মানসচক্ষে ধরা পরে মনে হয় ঘটনা এখনই ঘটছে এবং

www.pathagar.com

চোখের সামনেই।

ক) আমরাও নির্বাস জোনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্বপুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব,
রাক্ষসী গুল্মের ঢেউ সব কিছু গ্রাস করে এসে
ঝিঁঝিঁর চিৎকার বাজে অমিতাভ গৌতমের স্তব।
খ) আপনি তো জানেন রাজা
রাজ্ঞীর শাসন মানেই হলো দেশ শুকিয়ে যাওয়া। নদীশূন্য
খরা, কুয়াশা ও মুকুল ঝরে যাওয়া।
পুরুষের অনুপস্থিতি হলো স্বাধীনতা ও সীমান্ত সংকুচিত হয়ে আসার আলামত।
আক্ষেপ সেই দেশের জন্য
যেখানে সহস্র পুরুষের বাহু পেশীবহুল কিন্তু তীরন্দাজ হয়ে আছে নারী।
(হুদহুদ পাখির কৈফিয়ত : দ্বিতীয় ভাঙন)

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। এ কথা আল মাহমুদ জানেন। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন। ঐ পবিত্র গ্রন্থে রাজা সোলায়মান ও হুদহুদ পাখির একটি ঘটনার আলেখ্য বর্ণিত আছে। কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিত্ব দৃষ্টি দিয়ে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'হুদহুদ পাখির কৈফিয়ত' কবিতায়।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।
কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে
তোরাই তবে সোনামানিক
আগুন জ্বেলে দে।
(উনসত্তরের ছড়া-১)

বাংলাদশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধ আজকের একবিংশ শতাব্দীর এক ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আল মাহমুদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং তাঁর লেখা কবিতা, ছড়া আজকের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের পাতায় গ্রোথিত হয়ে গেছে। শিশুতোষ লেখায় আল

www.pathagar.com

মাহমুদ অতি সহজভাবেই ইতিহাসের অংশগুলো তুলে আনেন, যা তাঁর শিশুপাঠ বিষয় লেখাকে করেছে ঐশ্বর্যশালী।

চিনতে নাকি সোনার ছেলে

খুদিরামকে চিনতে?

রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে

মুক্ত বাতাস কিনতে?

আল মাহমুদের সমাজ চেতনা : কবি তাঁর সময়ে তাঁর সমাজে বসবাস করেন। সমাজের সবচেয়ে বিবেকবান ও সচেতন ব্যক্তি হচ্ছেন কবি। আল মাহমুদ সমাজে আত্মার বীজ। আর তাই আল মাহমুদ সমাজের অনাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, ভণ্ডামী, দেশের মানচিত্রে আগুন লাগানো একঝাঁক গোবরে পোকার বিরুদ্ধে কবি সচেতন। আল মাহমুদ তাঁর সমাজটাকে রাহুর হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত করতে চান, তিনি ছিটিয়ে দিতে চান শান্তির বীজ আর এ জন্যেই তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর নম্রভাষা। বিনয়ে বিগলিত কিংবা আবেগে আপ্লুত হয়ে দেশের-সমাজের যারা ধ্বংস কামনা করে কবি তাদের মধুর বাক্য শোনাননি, শুনিয়েছেন যথোপযুক্ত জবাব। যা তাঁর সমাজচেতনার গভীরতা উন্মোচন করে।

ক) ও রক্তাম্বর পরিহিতা স্বৈরিণী স্বদেশে তোমার দিগ্বলয়ে কেবল হা-হুঁতাশ আর স্বজন হারানোর বিলাপ। তোমার স্তনাগ্রচূড়ায় মানব শিশুর জন্যে তিক্ত নিম মাখানো প্রত্যাখ্যানের কৃষ্ণবলয়। আমি আর না। ছেড়ে দাও আমার হাত। আমি দেশহীন শেষ দশার কবির মত আকাশের দিকে আজান হেঁকে বাতাসে বিলীন হয়ে যাই।

(যাব না তোমার সাথে, হে দেশ জননী : দ্বিতীয় ভাঙন)

খ) চারদিকে শকুনীর উড়াউড়ি দেখে ভাবি তোমার শ্যামল প্রান্তর হিংস্র মাংসাশী পাখির বিষ্ঠায় আকীর্ণ বটবৃক্ষের মতো কেন?

আমরা কি তোমাকে রক্ষা করতে পারব? অযোগ্য সন্তান আমরা।

তবুও তো তোমার শস্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

(দেশমাতৃকার জন্য : দ্বিতীয় ভাঙন)

আল মাহমুদ একজন স্রষ্টা। তরুণ কিন্তু প্রাজ্ঞ স্রষ্টা তাঁর কবিতায় কাম প্রকৃতি ইতিহাস সমাজ ও চেতনার যে মিশেল স্রোত প্রবাহিত সেখানে আশ্চর্যভাবে ফররুখ আহমদ, জসীম উদ্দীন ও ত্রিশের জীবনানন্দ দাশের ছায়াটুকু নেই। অথচ লোকজ ধারায় ভেষজ উপদানে যাঁরা মিশতে চেয়েছেন প্রত্যেকেই এদের পাশ কাটাতে পারেননি। কিন্তু আল মাহমুদই ব্যতিক্রম। কারণ উপরের নামোল্লেখ কবি দ্বারা তিনি তিনি প্রভাবিত হননি,

www.pathagar.com

তবে জীবনানন্দ, জসীম উদ্দীন, ফররুখ আহমদের সারাৎসার তিনি শোষণ করেছেন। মাঝে-মাঝেই আল মাহমুদেরই কবিতায় তাদের স্বর আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কবি তাঁর স্বভাবসুলভ মাহমুদীয় আচার-ব্যবহারে আবার তা নিজের মতো করে প্রকাশ করেন। এখানেই কবি আল মাহমুদের বড়ত্ব। এবং আল মাহমুদই (১৯৩৬) প্রথম বাংলাদেশী বাঙালি যাঁর কবিতায় আবহমান বাংলার লোকায়েত রূপ গেঁথে ওঠে অপূর্ব আধুনিকতায়। পঞ্চাশের আধুনিক কবিদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে আল মাহমুদের কবিতা স্বাদে, বোধে, স্বভাবে, চেতনায় সম্পূর্ণ আলাদা। সতীর্থ কবিদের তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়কে সযতনে পাশ কাটিয়ে আল মাহমুদ পৌছালেন আবহমানকালের গ্রাম নিসর্গের কাছে। আর তাই আজ তাঁর চিন্তা-চেতনা-দর্শন আলাদাভাবে পাঠকের দুয়ারে হাজির। (ডাকপিয়ন ২০০০)

www.pathagar.com

আল মাহমুদকে আক্রমণ : কাকতাড়ুয়ার বচন-বিলাস

১.

গত জুলাই '৯৮-এ আপনি বগুড়া এলেন। করতোয়া ব্রিজের উপর কবি জয়ন্ত দেব আপনার সাথে আমার পরিচয় করালেন। সেই শুরু। রাতে হোটেল জুরিয়েটে আড্ডা। প্রসঙ্গ কবিতার সবুজভূমি। আপনি কবি শামসুর রাহমান, কবি আল মাহমুদের কবিতার বিশদ আলোচনা করলেন। কবিতার সবুজভূমিতে কবি শামসুর রাহমান, কবি আল মাহমুদের বিচরণ যে চিরসবুজ তার এক হৃদয়স্পর্শী আলোচনা করলেন রাত ১১টা পর্যন্ত। পরদিন ১৫-৭-৯৮ আমরা স্টুডিও কারুপল্লীতে ক্যামেরায় বন্দী হয়ে আপনাকে নিয়ে মহাস্থানে গমন করি। এক সময় বিদায়।

২.

গত ৩-১০-৯৮ বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে আপনার রচিত 'আল মাহমুদ কবির ভাষায় কথা বলেননি' শীর্ষক লেখাটি পড়ে কিছু লিখছি। কবিতা ও কবির বিতর্কের জবাব লেখার মাধ্যমেই খণ্ডনের চেষ্টা করছি। মিঃ দেবনাথ, আপনি অযথাই কবি আল মাহমুদকে ব্যবহৃত মিথসহ আক্রমণ করেছেন। আপনিই লিখেছেন– 'ধর্মীয় মিথ কবিতার বিষয় হিসেবে আসতেই পারে।' আরও লিখেছেন, 'পাবলো নেরুদা, অক্টাভিও পাজ, লুই আরাগ প্রমুখ প্রগতিশীল, রাজনীতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন'– তাই বলে কবিতার শিল্পক্ষুণ্ন হয়নি।' কবি আল মাহমুদ 'উপমা' পত্রিকায় ২২ জন কবির নাম বলেছেন। একজন কবি তার কাব্যিক নয়ন দিয়ে সম্ভাবনাময় কবিদের নামই উচ্চারণ করেছেন। রাজনৈতিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অবশ্যই নয়। নিচেই আপনি লিখেছেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তার সময়ে যারা অকবি তাদের কবি স্বীকৃতি

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন।' তাহলে বিশ্বকবি কোন রাজনৈতিক গুরুকে খুশি করার জন্যে ঐসব অকবিদের সমর্থন দিয়েছিলেন কবি হিসেবে? জানাবেন কি?

৩.

সম্প্রতি 'সাপ্তাহিক ২০০০' পত্রিকায় [আপনি '২০০০ সাল' লিখেছেন] কবি আল মাহমুদ যে সাক্ষাতকার দিয়েছেন ও যেসব কবির নাম উল্লেখ করেছেন এদের নিশ্চয় কাব্য প্রতিভা আছে এবং আপনার ভাষানুযায়ী কবিতার সবুজভূমিতে এরা চাষ করার যোগ্য। তাহলে কবি আল মাহমুদকে সাক্ষাতকার থেকে একটানে রাজনৈতিক ময়দানে হাজির করার মধ্যে আপনার উদ্দেশ্যটা সচেতন পাঠক ও সাহিত্যিকরা ঠিকই বুঝে ফেলেছে। তবে বিশ্বাস করুন মিঃ সমরেশ দেবনাথ, আপনার সাথে আলাপচারিতায় একবারও মনে হয়নি, আপনি বধির, অন্ধ এবং সাহিত্যের বিশাল জগতে অচল মুদ্রা। আপনি লিখেছেন, 'একজন প্রকৃত কবির দায়িত্ব হচ্ছে তার সময়কে সত্যনিষ্ঠভাবে চিনিয়ে দেয়া, কোন দলের পক্ষে ওকালতি করে সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়া নয়।' আপনি যেহেতু বধির এবং অন্ধ, আপনার জ্ঞাতার্থে : সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে' সংশোধন হতে পরামর্শ প্রদান করেছেন। আবার ২-৯-৯৮ তারিখে জা.নগর বিশ্বাবিদ্যালয়ে ধর্ষণবিরোধী এক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি জানেন, কবি শামসুর রাহমান ঐদিন কি বলেছিলেন? সারা বাংলাদেশ জানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন ডাকাত কারা। কারা ১০০ ধর্ষণ পূর্ণ করে সেলিব্রেট করে। এদের আড়াল করে কবি শামসুর রাহমান যে বক্তৃতা সে দিন করেছেন তা কি দলীয় ওকালতির আওতাভুক্ত নয়? মিঃ সমরেশ, দলীয় ওকালতির এমন চরম নিদর্শন প্রদর্শন করার পরও আপনি কবি শামসুর রাহমানের বিরুদ্ধে কলম ধরেননি। কিন্তু কেন? তা কি আদর্শগত মিলের কারণে? সেখানে কবি আল মাহমুদ কোথায় দলীয় ওকালতি প্রদর্শন করেছেন আপনি তা একবারও লাইনসহ উল্লেখ করেননি। নাকি, কবি আল মাহমুদ ঐ তরুণ কবিদের মধ্য আপনাকে কবি হিসেবে স্বীকৃত দেননি সেজন্যে এতো রাগ, এতো জ্বালা তাই কি? শঙ্ক ঘোষ কবি আল মাহমুদ-এর কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে কি বলল বা কোন মন্তব্য করল তাহলেই কি আল মাহমুদের কবিসত্তা বিলুপ্ত হয়ে গেল? কাব্যসত্তা কি কর্পূর, যে উড়ে যাবে? কিছু নিম্নোক্ত লাইন চাক্ষুষ করুন। তাহলেই কবির সম্বন্ধে জানতে পারবেন :

■ 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে আল মাহমুদই আমাদের বিপুল জনসমষ্টির জীবন ধারার অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন।' [রফিকুল ইসলাম, ভূমিকা, আধুনিক কবিতা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১]

■ 'পঞ্চাশ পর্বের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কবি হচ্ছেন আল মাহমুদ' [উপমা, ডাঃ মাসুদুজ্জামান, পৃষ্ঠা-৯৩]

www.pathagar.com

■ 'আল মাহমুদই প্রথম বাঙালী কবি, যার কবিতায় আবহমান বাংলার লোকায়ত রূপ গেথে ওঠে অদৃষ্টপূর্ব আধুনিকতায়' [মাহিবুল আজিজ, উপমা, পৃষ্ঠ-১০৬]

■ 'আল মাহমুদের কবিতা খুব স্পষ্টভাবেই পশ্চিম বাংলার কবিতা মণ্ডল থেকে পৃথক। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের তরতাজা স্বাদ-গন্ধ প্রাপ্তব্য।' [আবদুল মান্নান সৈয়দ, উপমা, পৃষ্ঠ-৭০]

■ 'পঁচাত্তর সালে আল মাহমুদের সাথে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হবার আগে থেকেই আমি তাঁর কবিতার মুগ্ধ পাঠক। সমকালীন যে দু'জন বাঙালি কবির দুর্দান্ত মৌলিকতা এবং বহমানতা আমাকে বারবার আকৃষ্ট করেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন বাংলাদেশের আল মাহমুদ, অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের শক্তি চট্টোপাধ্যায়।' [প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়, উপমা, পৃষ্ঠা-২৫]

এবার শুনুন কবির সকল বাক্য– 'কবির হৃদয়ে কোন বড় বিষয় ও বড় আদর্শ না থাকলে প্রচলিত কাব্য পরিবেশ বদলায় না। কবি হতে পারেন ধর্মবিশ্বাসী, নাস্তিক, কিংবা এ্যাগনস্ট। বাংলাদেশের কাব্যঙ্গনে এখন প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতাই চলছে। তবে প্রকৃতি কবি প্রতিভার জন্যে সান্ত্বনার বাণী এই যে, সত্যিই কবি কখনো তাঁর স্বজাতির কাছে বিস্মৃত বা অব্যবহার্য হন না। ...রাজনৈতিক কবিরা জনগণের সাথে লেপ্টে থাকে খ্যাতির লোভে.....

কবি জনগণের স্বার্থেই জনস্রোতের বিপরীতে প্রাণপণে কবিত্বের হালটি ধরে রাখেন। জনস্রোত অচিরেই স্বাভাবিক হয়ে এল জনগণ দেখতে পায় কবি তাদের জন্য পবনের নৌকায় সৌন্দর্যের সোনার হালটি ধরে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সারাশরীর ঝড়ে, বিদ্যুতে ও কালের ঘূর্ণিপাকে ক্ষত-বিক্ষত।' [কবির আত্মবিশ্বাস, পৃষ্ঠা-৯০, ৯১]

এখনও কি বলবেন আল মাহমুদ কবির ভাষায় কথা বলেননি? শ্রী শঙ্খ ঘোষের শঙ্খ না বাজলেও আল মাহমুদ বাংলাদেশের শামসুর রাহমানের মতই প্রধানতম কবি। প্রফেসর শিবনারায়ণ সাহেবের উক্তিটিই শঙ্খ ঘোষের উক্তির পাল্টা জবাবের জন্যে যথেষ্ট।

'সোনালী কাবিন'-এর কবি আল মাহমুদ লিখেছেন : ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বনছলনা জানি না বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি। [সোনালী কাবিন]

উপরোক্ত কবিতার মতই আজও কবিকে ছলনার মিথ্যে সাগরে গা-ভাসাতে দেখিনি। কবি এখনও যা বলেন, 'সরাসরি মদ্যপান বাদ দিয়েছি ধর্মীয় কারণে। যেহেতু পবিত্র কুরআন মদ্যপান হারাম ঘোষণা করেছে এবং মানব সমাজকে এর অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেছে, মদ উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি। সে কারণেই জিন বা হুইস্কির জন্য মাঝে মধ্যে হৃদয় অসঅসা অনুভব করলেও ওদিকে হাত বাড়াই না।' [কবির আত্মবিশ্বাস, পৃষ্ঠ-৯]

একজন কবি কতখানি সৎ ও দুঃসাহসিক হলে এমন সত্য অবলীলায় বলেন আশা করি

www.pathagar.com

বুঝতে পেরেছেন। আপনি নিজেও তো আল মাহমুদের কবিতা পছন্দ করেন। তারপরও কেন প্রগতিশীল দর্শন, মতবাদ এসব ইজম তুলে সাহিত্য অঙ্গনকে দূষিত করছেন। যাঁর যে দর্শনে ইচ্ছা কবিতা লিখুন না কেন? 'কবি শামসুর রাহমানের কি যায় আসে? কবির উদারতা, কবির প্রসবিত কবিতা কাল থেকে কালান্তরে মানদণ্ডের নিরিখেই টিকে থাকবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে হেয় করে বলেছিলেন, 'তুমি কবিতার উপর জবরদস্তি করেছো।' এতে কি জীবনানন্দ হারিয়ে গেছেন? বরঞ্চ জীবনানন্দের কাব্য আজ গ্রামবাংলায় চষে বেরাচ্ছে আর দেখছে বনলতা সেনের চক্ষু দিয়ে। সেখানে কবি আল মাহমুদ যদি 'এক চক্ষু হরিণ' নিয়ে গ্রামবাংলায় হাজির হয়, তাহলে ক্ষতি কি? এক চক্ষু হরিণ দিয়েই কবি আল মাহমুদ যা দেখলেন তাই লিখলেন :

এই দেশের এক নাগর কবি রাজরাজড়া চেখে
যখন দেখে নড়ছে গদি বিপ্লবী গান লেখে
ছোকড়া কিছু পদ্যকারের মধ্যমণি তিনি
চতুর্দিকে ফেউ জুটেছে চায়ের কাপে চিনি।' [এক চক্ষু হরিণ, পৃষ্ঠা-১৫]

মিঃ সমরেশ, আপনি না হয় অসুস্থ, ঝিমানো প্রাণী নিয়ে লিখুন, বলুন। সাহিত্যের কমল বনে আর কাদা ছোঁড়াছুড়ি না করে প্রকৃত সাহিত্যচর্চায় আমরা লিপ্ত হই। কারণ, ঢাকা তো বাংলা সাহিত্যের রাজধানী। এখানে কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শামসুল হক, হুমায়ুন আজাদ, রুবী রহমানের মত মৌলিক কবি বিদ্যমান আজও। ইজমে-ইজমে বিভেদীকরণ ভুলে গিয়ে আবারও কফি হাউজের আড্ডায় মেতে উঠি। আমরা কবি শামসুর রাহমান, কবি আল মাহমুদ কাউকেও দলীয় গেরুয়ায় দেখতে চাই না। আমাদের প্রিয় কবিদের কবিতায় সবুজ চাদরে মুড়ি দিয়ে আবার চলমান দেখতে চাই এককালের সখ্যের মত।

'এখন কোথায় যাওয়া যায়?

শহীদ এখন টেলিভিশনে। শামসুর রাহমান
সম্পাদকীয় হয়ে গেলেন। হাসানের বঙ্গ জননীর নীলাম্বরী বোনা
আমার দ্বারা হবে না। জাফর তাই ঘোড়ার গায়ে হাত বোলান।
আরতি, খৃষ্টান শিশুদের বাইবেল পড়ানোর দায় নিয়ে
পালালো। সেবু ভারতে। প্রভু
প্রভু।
এই তো আমাদের ভ্রাতৃত্বের রজ্জু দয়াময়।'
[আমার সমস্ত গন্তব্যে : আল মাহমুদ]

www.pathagar.com

বাংলা কাব্যের দুই গর্ব :
শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ

কত বেশি রচনার জন্ম দিল একজন কবির কবিতা কালের মানদণ্ড ছাড়িয়ে মহাকালের জুরিবোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে এমন হিসাব দেবার জন্যে লিখিতে বসিনি। খুব বেশি নয়, মনের মত একটি হৃদয় পেলেই মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে, ধ্বংস করতে পারে উয়, নির্মাণ করতে পারে তাজমহল। গর্ব করার মতো আমাদের পঞ্চাশ আমলের দু'জন ধীমান কবি আমাদের যা দিয়েছেন একদিনে, এক মাসে, এক বছরে কিংবা এক যুগে তা শেষ হবার নয়। সন্ধ্যাতারা বলি কিংবা শুকতারা বলি, আসলে দুটোই এক জিনিস। সন্ধ্যাকালে উদিত সন্ধ্যাতারা আর সুবাহকালে দর্শন শুকতারা। মানচিত্রে দু'টি অধ্যায় থাকে। একটি নগর অন্যটি গ্রাম। কিন্তু পরস্পর সম্পূরক। নগর বা শহর ছাড়া গ্রাম অন্ধকার আবার গ্রাম ছাড়া শহর অন্ধকার। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ। নদীর ভিন্ন স্রোতের নাম। উভয়েই স্বীকৃতি কবি পুরুষ এবং উভয়েই সমকালের কবিতায় বিদ্বান। সর্ব বিষয়ে (ছড়া, গল্প, কবিতা, উপন্যাস) প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার মতো পাণ্ডিত্যে ভরপুর। অভিজ্ঞ এবং নিজের দেশের মানচিত্র, প্রকৃতি দর্শন বিষয়ে উভয়েই একমত না হলেও সময়সচেতন। স্বদেশের নিসর্গ নিয়ে পশু-পাখি, নাও-নদী, কোলাহল, মিছিল, সবুজ, পরিবেশ বিষয়ে দু'জনেই পূর্ণ অভিজ্ঞ পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা।

'প্রথম গান', 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' শামসুর রাহমান এবং 'সোনালী কাবিন' আল মাহমুদ। এ দু'টি গ্রন্থ দু'কবি অনেক জল ঘেঁটে জীবনের বয়স রোদে পুড়িয়ে রচনা করেছেন। খুব বেশি কবিতা মানুষকে নাড়াতে পারে না। কিছু কিছু কবির কবিতা কার্যত এমনিতেই মন-মগজে তীরবিদ্ধ হয়। কবিতা হয়ে ওঠে সমকাল পেরিয়ে মহাকালের যোগাযোগ সেতু। অনুভূতি স্বাতন্ত্র্য ও চিন্তার গভীরতা ছাতার মতো মেলে যায় কল্পনার

www.pathagar.com

জগতে। কবি হয়ে ওঠেন দ্যুতিমান দ্রষ্টা। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ আমাদের বাংলা কাব্যভূমিতে যা দিয়েছেন তা এ শতাব্দী পেরিয়ে নতুন শতাব্দীতেও চলাচলের মৌলশক্তি ধারণ করবে। শামসুর রাহমান অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। প্রেম ও বাস্তবের ঘটনাবলী তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। কবিতার প্রতি আশৈশব প্রেম তাঁকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে এবং কবিতার প্রতি তাঁর যে কাল ব্যয়, যে প্রেম– সেটাকে 'A thing of beauty' বলা যেতে পারে। শামসুর রাহমানের এই নারীর প্রতি প্রেম জীবনের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস ও আস্থা একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

এবং

নোনাধরা মৃত ফ্যাকাশে দেয়ালে প্রেতছাড়া দেখে, আসন্ন
ভোরে দু'টুকরো রুটি
না পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক-গা ঘুমেই বিবর্ণ হই
কোন একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে যাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজায় খিল
সত্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু
গড়ি উজ্জ্বল কথায় মিছিল।

(রূপালী স্নান)

মনোভাবের মূলকথায় নিজের অনুভূতির কাছে এতখানি সৎ যে, আনভিপ্রেত পারিপার্শ্বিককে এড়াতে যেসাসের ক্ষমাই শুধু মেখে নেয় না মনে, দরজায় খিল তুলে দেয়ারও পক্ষপাতী। কেননা কবির লক্ষ্য এখানে শুধু আনন্দ। কালের বিপর্যয়ের কবিমন এসে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র চিত্তের তারের ওপর। আধুনিক কবিতার এই যে নিগড় থেকে ছাড়া পাওয়া, এর ফলে কবিতা আর উদ্দেশ্য বিশেষের চারণমাত্র থাকেনি, হয়ে উঠেছে শিল্পীর হাতের যাদুদণ্ড, অধিকতর সৃজনধর্মী।

আল মাহমুদ। এক চৌকস দ্রষ্টার নাম। লোকজন শব্দকে নিজ ভূমিতে এমনভাবে রোপণ করেছেন যা সমকালীন সময়ে বাংলা কবিতাকে দিয়েছে প্রাণ। শামসুর রাহমান নগর আধুনিকতাকে যতটা প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন কবিতায়, আল মাহমুদ ততটাই লোকজ, গ্রামীণ পটভূমিতে ঐতিহ্যস্পর্শী ঘটনায় আধুনিকতার ঢেউ ছড়িয়ে দেন কবিতার পরতে পরতে। এখানেই আল মাহমুদ আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। জীবনানন্দের উপমা কিংবা জসীম উদ্দীনের 'নকশি কাঁথার মাঠ' পাশ কাটিয়ে আল মাহমুদ যে ধারা প্রবর্তন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের জন্য মাইলফলক।

'স্বপ্নের আঘাতে আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না।

www.pathagar.com

সামান্য আবেশ এলে ভেসে যাই, নূহের নৌকায়
অথবা উড়াল দেই, আশার পাখিটি একা একা।'

(ফেরার পিপাসা)

অথবা

'আমারে উঠিয়া নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ গতর ধরো, সতী ধরো
তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।
কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয়ে আসে
কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।

(সোনালী কাবিন)

স্বদেশীয় লোককাহিনী ও কিংবদন্তীর রোমান্টিক সৌন্দর্যে আপ্লুত ও মথিত হয়েছিলেন ইয়েটস আইরিশ লোক ইতিহাসের বীরদের শৌর্যগাঁথা, তাদের ঘিরে থাকা নানাবিধ কল্পকথার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন দেশজচেতনা এবং স্পন্দমান আবেগের আকাশ। আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' সনেটগুচ্ছে মাতৃভূমির ইতিহাস খনন করে তুলে আনেন ঐশ্বর্যময় ও বীর্যমান অনুষঙ্গসমূহ। এর পেছনেও ইয়েটসের মতোই, স্বদেশ-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় গৌরব, ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং লোকজ উপাদানসমূহকে তুলে ধরে সংগ্রামী এ দেশের মানুষের হৃদয়ে দোলা জাগানোর বাসনা লুকায়িত। এবং সর্বতো সত্য, আল মাহমুদ তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। শামসুর রাহমানের কবিতায় ইতিহাস চেতনার সাথে এসেছে সমাজচেতনা, সমসাময়িক ঘটনাবলী তাঁর কবিতার অলিন্দে অলিন্দে পরিচ্ছন্ন স্বরূপ উন্মোচন করেছেন অত্যন্ত প্রাজ্ঞভাবে। কারণ, বর্তমান যুগের সভ্যতা ঝরা পলকের মতো কবি হৃদয়কে ব্যথিত করে। কবি আমাদের ঘুণে ধরা সমাজকে উপলব্ধির ফ্রেমে দেখে আঁতকে উঠেছেন, তাইতো ব্যর্থ ভাষায় লিখে ফেলেছেন;

'বাংলাদেশ' যারা তোমার সাংস্কৃতিক পাছায়
চিমটি কাটে, ঘষে দেয় বিষলতা
আল্লাহ্ তাদের হায়াত দারাজ করুন।
যারা তোমার বাজু থেকে কেয়ূর
নাক থেকে নোলক আর নাক ছবি
গলা থেকে হাঁসুলি
কোমর থেকে বিছাহার খুলে নিয়ে

www.pathagar.com

পাচার করে দেশান্তরে
আল্লাহ্ তাদের হায়াত দারাজ করুন,
যেসব ধাপ্পাবাজ সুদিনের স্বপক্ষে মিথ্যার থুথু ছিটায়,
আল্লাহ্ তাদের হায়াত দারাজ করুন'

অথবা

'দেখতে পাচ্ছো না বখাটে বুদ্ধিজীবীদের মাথায়
বেধড়ক উৎসাহে হাগছে প্যাঁছা আর বাদুড়
দেখতে পাচ্ছো না সাতঘাট থেকে চেয়ে-চিন্তে আনা
হে ব্যর্থ অন্নপূর্ণা
যে তোমার সন্তানের পাতের ভাত খায় সাত কাকে'

(গুডমর্নিং বাংলাদেশ ঃ শামসুর রাহমান)

আল মাহমুদের কবিতা শামসুর রাহমানের কবিত থেকে স্বভাবে-স্বাদে-চেতনায় আলাদা। ত্রিশের উত্তরাধিকার সূত্রেপ্রাপ্ত ঋণ আধুনিকতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট হতাশা-নিবেদনকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে আল মাহমুদ গেলেন আবহমানকালের গ্রাম নিসর্গের স্বপ্নিল সবুজ ভুবনে। শামসুর রাহমান কবিতায় সৃষ্টি করেন বলয়। কখনও স্লোগান। আল মাহমুদের কবিতায় নিয়ে আসেন জোরালো বক্তব্য, উপমার এক অষ্টাদশী নবোঢ়া।

'কতদূর এগোলো মানুষ।
কিন্তু আমি ঘোর লাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।'

(প্রকৃতি, সোনালী কাবিন)

অথবা

'আমিও যখন এসেছি নগরে একি!
তোমার শরীরে আভরণ নেই কোনো
পশুর থাবায় বিঁধে আছে চেয়ে দেখি
নাভিমূল আর কামনার অঙ্গনও।
সবুজ শাড়িটি জীর্ণ মালার মতো
পড়ে আছে পায়ে নিটোল উরুর কাছে

www.pathagar.com

জীবন যেনবা হয়েছে কণ্ঠাগত
পাতা ঝরা এক তরুণ সেগুন গাছ।'

(আল মাহমুদ)

কোনো কবিই তাঁর সময়ের গতিবিধির বাইরে যেতে পারেন না, কাব্যশিল্পে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর একজন কবি তাঁর এলাকা, নিজ দেশ থেকে রসদ সংগ্রহ করেই উত্তরাধিকার ঋণ শোধ করেন। এবং কবিকে সময়ের শাসন মানতেই হয়। কবির সময় কবিকে সীমাবদ্ধতার দেয়াল তুলে ধরে রাখতে চায় নিজ বলয়ে। কবি সে দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করেন সবসময়। শামসুর রাহমানও এই দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন। আল মাহমুদও চেষ্টা করেছেন। কেউ ইউরোপের কবি স্মরণ করে, কেউবা গান শ্রবণ করে আবার রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে।

(১) হন্তারক গুলিবিদ্ধ হিসপানি প্রান্তরে পড়ে থাকা
লোর্কা, তার কবিতা পংক্তিমালা স্তব্ধ মধ্যরাতে
মাথার ভিতরে ডালিম দানার মতন লাল,
হলদে, চকলেট, ফিরোজা বেগুনী গুঞ্জরণ

(শামসুর রাহমান)

(২) 'বুঝিনা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে যে বাংলাদেশে ফের
বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন
গাছ নেই, নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।
শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা ঠাকুর।'

(রবীন্দ্রনাথ : আল মাহমুদ)

কবিরা অনুদার নয়। কবিতা কোন আবাআবাও নয়। কবির কবিতা গিরীশ টপকিয়ে পৌঁছে যায় মেঘলোকে। কবি একটি অঞ্চলে জন্মে গোটা বিশ্ব নিয়ে মেতে ওঠেন। সৃজনে। কবি কখনও অসুদা নন। কবির আরজু, ক্ষণে-ক্ষণে বিশ্বের অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের জন্য হৃদয় তাক ধিনা-ধিন বাজনা তোলে। কারণ কবি সমাজ সৃষ্টির চৈতন্যে জাগরিত সর্বদা সতত সক্রিয়। একটি প্রবল মানববোধের শিল্পে বিশ্বের কবি সকলকে একাকার করে রেখেছে। শামসুর রাহমান কিংবা আল মাহমুদও এর অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

(১) 'এবং সত্যের মুখ দেখেছিলাম বলেই তিনি,
সক্রেটিস, সয়েছেন নির্যাতন, অকাতরে পান
করেছেন হেমলক- এই আত্মহুতির পূরাণ
চিরঞ্জীব; বিশ্বচরাচরে এভাবেই ছিনিমিনি
খেলা খেলে যুগে যুগে পরাক্রান্ত কবন্ধ সমাজ
চক্ষুষ্মানদের নিয়ে'।

(সক্রেটিস-২-শামসুর রাহমান : 'ইকারুসের আকাশ')

(২) 'যখন তার কথা ভাবি, কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে হৃদয়।
এই উপমহাদেশের মানচিত্রের মত তার বিশাল হৃদপিণ্ড
আল্লার উপাসনার গুঞ্জন তুলে যখন ধুক ধুক করতো
তখন তার ভ্রূজোড়ার তলদেশে কি নেমে আসতো কল্লোলিত নদী'।

(ইকবাল স্মরণে, আল মাহমুদ : মিথ্যাবাদী রাখাল)

ঘরোয়া শব্দ, জীবন্ত উপমা, মিথ, দর্শন-শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ উভয় কবিই ব্যবহার করেছেন প্রবলভাবে। পঞ্চাশ আমলের এই দুই কবির বেশ কিছু কবিতায় সমগ্র পটভূমি অধিকার করে আছে কাহিনী, নির্মাণ নিরীহ জীবিকা, জীবনের প্রতি দিনকার চলার মিথ এবং উপমার অসংখ্য তারা। শামসুর রাহমান পুরনো নগর ভ্রমণে বেরিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে গোরস্থানে ফিসফিস করে কারা যেন কবর খুঁড়ছে। কান পেতে তিনি শুনেছেন কবর শিল্পের নিরীহ জীবিকার দর্শনবহুল চিত্র। আর এই দুঃখগুলো ইটের মতো পরস্পর গেঁথে নির্মাণ করেছেন বাংলা কবিতা জগতে এক নতুন চিত্র।

'কোদালে অবহেলে উপড়ে আনি
মাটির ঢেলা আর মড়ার খুলি।
শরীফ কেউকেটা কী করে চিনি?

শরীফ কেউকেটা কী করে চিনি?
মাটির নীচে পচে অন্ধ গোরে
হয়তো সুন্দরী কুরূপা কেউ।
করোনা বেয়াদপি বান্দা তুমি।

করোনা বেয়াদপি বান্দা তুমি।

www.pathagar.com

বাদশা কেউ নেই গোলাম সব,
বেগম পেতে চায় বাদীর সুখ;
আউড়ে গেছে কত সত্যপীর।'

(কবর খোঁড়ার গান : শামসুর রাহমান, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

আল মাহমুদ নগর ভ্রমণে বের হননি। নিত্য এক লায়লা তাঁর নিকট আসে। লায়লা এক রহস্যময় নারীর নাম। লায়লা মাহমুদের বাসায় অভিসারে আসে না, আবার প্রেম ভালোবাসায় প্রলুব্ধও করে না, লায়লা দুঃখী, দরিদ্র, সৎ স্বভাবা। মাহমুদ এই কবিতায় প্লেটোনিক লাভ অঙ্কিত করেছেন মিথোলজিক্যাল টার্ম ব্যবহার করে। এবং ধীরে ধীরে সুমিতা, সুষমা ও সমন্বয়ের শিকড়শুদ্ধ নড়ে ওঠে আল মাহমুদের কবিতায়। তাঁর সাথে সমন্বয় ঘটে ফিলোসফির।'

'মৃতের যে শ্রবণেন্দ্রীয় নেই। একথা-
আমি আর লায়লাকে বোঝাতেই পারি না। অথচ-লায়লা বলে
মৃত্যুতেও তার শেষ হবে না। মৃত্যুর পরেও সে এক জায়গায় যাবে।
আমি যখন বলি জায়গাটা কোথায়? আঙুল মটকে
লায়লা হেসে ওঠে। আড়চোখে বলতে থাকে, সেই জায়গাটার
জন্যইতো কত মানুষের কপালে বরাভয়ের সীলমোহর। পৃথিবীর
সমস্ত তসবীহ দানা ঘুরছে। আর অসংখ্যমিনার উঠে গেছে
আকাশের দিকে। মাটিকে মোরব্বার মতো ক্ষত করে রচিত হয়েছে
প্রাণের শেষ শয্যা

(এক লায়লার কাহিনী : আল মাহমুদ)

যুগীয় আবহাওয়ায় রোদ সাঁতরে তীরে পৌঁছাতে শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদ কেউই উৎসাহী ছিলেন না। প্রথাসিদ্ধ অনুবর্তনের মধ্যদিয়ে পথচলায় তাঁদের ছিল এলার্জি। বিষয়গত পরিবর্তন কিংবা কাব্যের নিয়মনীতির প্রথাগত অগ্রজ অনুজ পথচলা থেকে আলাদা সাজে, আলাদা ধাঁচে নির্মাণে মত্ত রইলেন কবি যুগল। কালের পরিক্রমায় আজ তাঁরা কাব্যপথের নাখুদা। কবিতার সত্যকে খুব বেশি স্বীকার করছেন শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, পাঠকের মনোজগতে ঢুকেছেন অভিজ্ঞতার মহৎ জীবন রস প্রবাহিত করে। অনেকটা টনিক ওষুদের বল বৃদ্ধির মতো। বাংলাদেশের অসংখ্য পাঠক এবং পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ (পাঠক) শামসুর রাহমান, আল মাহমুদে কবিতার ভক্ত। বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের গর্ব করা উচিত শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের জন্য। টিএস ইলিয়ট, পাউন্ড লোরকার দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় তাদের কবিতায়, শেলী, কীটস, বায়রন, মিল্টনের কবিতায় পাওয়া যায় দর্শনের লেবাসে আবৃত

www.pathagar.com

জীবনঘনিষ্ঠ কবিতা। আমাদের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের কবিতায়ও স্ব-স্ব চেতনায় অসম্ভব শক্তিশালী মৌলিক কবিতার জন্ম হয়েছে। কখনও দেশপ্রেম, কখনও আধুনিক প্রসারকামী আবর্তের সারণিতে প্রেমানুভূতি, কখনও মানবিক মূল্যবোধে রাহমান, মাহমুদের কবিতার পংক্তি ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো।

i. দেশ কি উইয়ের ঢিবি? নইলে
কেন এই মোচ্ছাব চৌদিকে বাল্মীকের? নৈঃসঙ্গের
মৌতাতে বিভোর বুদ্ধিজীবী
কফির পেয়ালা হাতে স্তব্ধ হয়ে আছেন এবং
উদভ্রান্ত বেকার যুবকেরা দমমারে ঘন ঘন গাঁজর ছিলেমে, রাজবন্দিরা যখন দিন গুনছেন

(তিনটি স্তবক : শামসুর রাহমান : মঞ্চের মাঝখানে)

ii. এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশে উত্থান রহিত
নৈঃশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।
নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতগ? মাটিতে জন্যায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্যকোন শ্যামলতা নেই।

(রবীন্দ্রনাথ : আল মাহমুদ : কালের কলস)

শামসুর রাহমান কিংবা আল মাহমুদের কবি চেতনার দায়বদ্ধতা অথবা দেশ চেতনার গভীরতা ইউরোপের কবি-সাহিত্যিকদের চেতনার এক সম্পূরক অবস্থান। কবিরা দ্রষ্টা। শিল্পের তাবত কবি-সাহিত্যিক এক ও অভিন্ন সেতু। বোধের বিশ্বস্ত সম্রাট শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ সফলতা, সঙ্কট, সংঘাত, সংগ্রাম বিশ্বাস ও কল্পনার রঙধনুতে এমন বর্ণিল আভা ছড়িয়েছেন, বাংলা কবিতা হয়েছে ঋদ্ধ। কবিতার জন্য হয়েছেন আওয়ারা। একটি অফর কেটেছে কবিতার জন্য। নারীর মেহগনি চুল দেখেছেন কবিতার ভাবের জন্য।

i. 'যার পরনে নীল শাড়ি, মেঘলা খোঁপায় রক্তজবা
যার নখ সূর্যোদয়ের রঙে সজীব,
যার কণ্ঠস্বরে রাত্রির মমতা যুগল পাখির
শব্দহীন ভালবাসা আর গহীন অরণ্যের বুকচেরা জ্যোৎস্না।
সত্যের মত সে দাঁড়িয়ে থাকে জানালা ধারে।
বৃষ্টির দুপুরে।'

(বহুদিন পর একটি কবিতা : শামসুর রাহমান : ইকারুসের আকাশ)

ii. কবিতা তো শৈশবের স্মৃতি:
কবিতা চরের পাখি, কুড়োনো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস
স্নানমুখ বউটির দড়িছেঁড়া হারানো বাছুর

www.pathagar.com

কবিতাতো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।

(কবিতা এমন : আল মাহমুদ)

শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ ॥ বর্তমান প্রেক্ষাপট ঃ জাগতিক ঘটনা ও তার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির ঘনিষ্ঠতায় আধুনিক কাব্যের যে বহুধাসংলগ্ন স্বভাবের সাথে শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদ আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন তাঁদের কবিতায়, তার মূলে কাজ করেছে পরিপার্শ্ব ও পরিপ্রেক্ষিতে চেতনার সমন্বয়ে সৃষ্ট তাঁদের মগজের যুগ ধারণা। এই যুগ ধারণা বা যুগচেতনা এবং পরিপার্শ্বের সঙ্গে একাত্মবোধজনিত সক্রিয় চিন্তাই তাঁদের কবিতাকে করেছে নগর ও লোকজ ধারার আধুনিক শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ। কিন্তু এতসব সৃষ্টি ও ঘটনার পরম্পরার পরেও আমাদের একটা দিক ভাবতে হয়, বাংলাদেশের কোন কবিই রাজনীতি ক্ষেত্রে নির্মোহ নয়। আমাদের দেশে রাজনীতি চর্চায় অজ্ঞ নেতাদের মতো রাজনীতি নিয়ে কবিতা লিখতে বসলে ভাবনার অতলে ডুব দেবার পরিবর্তে চর্চার দলগত যে অভিব্যক্তি আছে তাকেই প্রকাশ করা হয়। পাখি, নদী, ফুল, মাটি, গ্রাম, নগর দেশের এসব বিষয়ে সচেতন কবিতা আমরা পাই কবিবৃন্দের কাছ থেকে। কিন্তু ঠিক বা বেঠিক এসব চিন্তা না করেই আমরা রাজনীতির দলাদলিকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখে বসে থাকি। কবিদের রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা জরুরী। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী হয়ে বিবৃতি দেয়া শিল্প-সাহিত্যের জন্য হুমকিস্বরূপ, রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করে কবির শব্দ যদি তার যথার্থ অর্থের অভিব্যক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে কবির রাজনৈতিক চেতনার সার্থকতা কোথায়? কবিতা কোন রাজনৈতিক ঘোষণাপত্রের বাণী নয়। রাজনীতির ময়দান একটি কুটিল ও জটিল ময়দান। দলীয় মতবাদ ও ক্ষমতা দখলের নীল দংশনের সর্বত্র ছড়াছড়ি এখন। পক্ষান্তরে কবি সমাজ কোমল গোলাপের দ্রষ্টা। সুগন্ধী ও মনের গোপন কুঠিরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিই তাঁর প্রধান কাজ। রাজনৈতিক অঙ্গনে কবিদের পদচারণা শুরু হলে কাব্যমগজ এক সময় বায়বীয় মগজে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের কবিতা অঙ্গনে রাজনীতি ধূসর থাবা অক্টোপাশের মতো ক্রমশ আঁকড়ে ধরছে এবং কবিতা যথার্থ মানবতা ও কেন্দ্রবিন্দু হতে দূরে সরে যাচ্ছে। চন্দনের বৃক্ষশাখায় বসে থাকা সাদা পাখির মতো যখন প্রবাহিত বাতাস সুগন্ধ ছড়ানোর পরিবর্তে অনুদারের জলধারার জলীয় ছড়ায় তখন নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে পূর্বসূরিদের নাম স্মরণে আসে। এই অবস্থার অবসান চাই আমরা তরুণরা। 'আমার সমস্ত গন্তব্য' কবিতায় আল মাহমুদের যে আকুতি, সেই আকুতি, আবার ফিরে আসে:

'এখন কোথায় যাওয়া যায়? শহীদ এখন টেলিভিশনে। শামসুর রাহমান
সম্পাদকীয় হয়ে গেলেন। হাসানের বঙ্গজননীর নীলাম্বরী বোনা
আমার দ্বারা হবে না। জাফর ভাই, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলান।
আরতি, খৃস্টান শিশুদের বাইবেল পড়ানো দায় নিয়ে
পালালো। সেবু ভারতে। প্রভু, প্রভু
এইতো আমাদের ভ্রাতৃত্বের রজ্জু দয়াময়।

(আমার সমস্ত গন্তব্য : আল মাহমুদ)

www.pathagar.com

ঈদ এবং একটি কবিতার গল্প

ঈদ

কুহেলী তিমির সরায়ে দূরে
তরুণ অরুণ উঠিছে ধীরে
রাঙিয়া প্রতি তরুণ শিরে
আজ কি হর্ষ ভরে।

আজি প্রভাতে মৃদুল বায়
রঙ্গে নাচিয়া যেন ক'য়ে যায়
'মুসলীম জাহান আজি একতায়
দেখ কত বল ধরে।'

হের আজি সবে শুভলগ্নে মিলি
দ্বেষ-হিংসা সব দূরে ঠেলি ফেলি
ভাই ভাই বলি ক'রে কোলাকুলি
সে দৃশ্য কি মধুময়!

আজিকে যেনরে আসিছে ভাসি
নন্দন কুসুমে গন্ধরাশি
আমারি প্রাণে জাগায় হাসি
আশার লহরী চয়।

আমি প্রভাতের অতি স্নিগ্ধ বায়ু,

www.pathagar.com

নিশা শেষে লভি জনম হায়
যুগ যুগ ধরি বিপুল ধরায়
উত্থান-পতন হেরি।

কত সখ্য-ঐক্য প্রীতির কথা
কত সুকরির হৃদয়ের ব্যথা
কত বীরেন্দ্রের তেজোময়ী গাঁথা
শুনিনু শ্রবণ ভরি

কিন্তু গো সকলি মানে পরাজয়
সে দৃশ্যের কাছে, যে দৃশ্য নিচয়
হেরিছি মুসলিম জগৎময়
আজি পুণ্যের পুলকে!

সব গেছে, তবু সে ধর্ম বন্ধন
অটুট আজিও রয়েছে তেমন
তেমনি করিয়া মুসলিম জীবন
ভাসে আশার আলোকে।'

ধর্ম ও কর্মেরে জীবনের মাঝে
প্রতিষ্ঠিত করি আজ,
জীবন- আহবে হও অগ্রসর
নাহি তাতে কোন লাজ,

যে চেতনা থাকে একদিন জাগি,
দীর্ঘনিদ্রা তার পরে,
সে তো আনে শুধু ঘন অবসাদ,
জীবনে সে ঢালে অনন্ত বিষাদ
দেও তারে দূর ক'রে।

জ্ঞান-কর্মের পূজারী হইয়া
সম্মুখে চলিলে সবে
দীর্ঘ জীবনের জড়তার রাশি
হবে, অবসান হবে।

(সৈয়দ এমদাদ আলী)

www.pathagar.com

কবিতাটির বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা সৈয়দ এমদাদ আলীর (১৮৭৬-১৯৫৬) মননচর্চার বিষয় ও জন্মবৃত্তান্ত জানলে এই কবিতাটি বুঝতে ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে সুবিধে হবে।

সৈয়দ এমদাদ আলী ১৮৭৬ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলাতেই তাঁর শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে ছিল। ১৯০৩ সালে 'নবনূর' নামে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির ডিসেম্বর মাসে। [বৈশাখ-চৈত্র ১৩১০] ঈদসংখ্যা প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং আধুনিক বাংলা কবিতায় মুসলমান সমাজের আকিদা নিয়ে প্রকাশিত এটিই প্রথম ঈদ বিষয়ক কবিতা। পরবর্তীকালে (১৯১৩) সৈয়দ এমদাদ আলীর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ডালি'তে নির্বাচিত ৩৩টি কবিতার মাঝে এই কবিতাটি স্থান পায়। কবির এই কাব্যগ্রন্থের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত এবং কাব্যসাধনায় আগ্রহ ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : শৈশব হইতে আমার মেরুমজ্জায় কবিতা ছিল, কিন্তু তাহার সাধনা আমি করিতে পারি নাই। সময় সময় মনে যে সব ভাবের উদয় হইয়াছে কখনও কখনও তাহা ছন্দে গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। 'ডালি'তে তারই কতকগুলো স্থান পাইয়াছে। কোনো কবির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ইহার একটিও রচিত নয়, সেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও আমার ছিল না, এখনও নাই। আমি কবি সম্রাটও নই, মহাকবিও নই। আমি একজন নগণ্য সাহিত্যসেবী মাত্র– মাতৃভাষার আমি একজন দীনসাধক। এ দাবীর ভিতরে কোন অহমিকা নাই। .....পাঠক-পাঠিকগণ এই কবিতাগুলির ('ডালি' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত) মধ্যে একটি মাত্র সুর সকলের আগে লক্ষ্য করিতে পারিলেই আমি নিজেকে পরমধন্য মনে করিব। সেই সুরটি হইল– ইসলামী জাতীয়তা। এই জাতীয়তা প্রাদেশিকতা বর্জিত। তরুণ বয়সে সে সুরটি আমাকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়াছিল, আমার নগণ্য শক্তি দ্বারা 'ডালি'তে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। শালীনতাবর্জিত কোনা কবিতা ইহাতে নাই, প্রেমের কবিতাও নাই। নিজের স্ত্রী ছাড়া কাহাকেও ভালোবাসি না, অতএব হা-হতাশাপূর্ণ একঘেয়ে প্রেমের কবিতা রচনা করিয়া নিজের দগ্ধমনকে শান্ত করার কোনো প্রয়োজন আমার হয় নাই। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে রচিত যে কয়টি কবিতা ইহাতে আছে, তার মধ্যে একটিমাত্র তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত, আর কয়টি পরের রচনা।"

একটি কবিতায় কি বিষয় রয়েছে তা অবশ্য সকল সময়েই আহরণ করা যায়। মানুষের স্বভাব থেকে জানা যায়, অনুভূতির একটা উৎসরণের উন্মাদনা রয়েছে, কখনো-কখনো তা নিজস্ব ব্যঞ্জনায় অপরূপ হয়ে উঠতে চায়। সেটা একটা বিশেষ অবস্থা এবং বোধকরি সেটাই কবির মনে কবিতার জন্মমুহূর্ত। গ্রীক অনুকারবাদীরা এর নাম দিয়েছেন Entheos. প্রেরণার উদ্বোধন কি করে সম্ভব হয় এবং কি অপরিমেয় আনন্দ সে তার আপন ওষধিবৃত্তি দিয়ে অন্যমনে সঞ্চার করে দিতে চায়, তা নিয়ে তর্কের অবধি নেই।

www.pathagar.com

অর্থাৎ কাব্যের জন্ম ও তার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মতবাদের বনানী একান্তে স্বভাবে বেড়ে উঠেছে। তবে একথা কোনো সতর্ক মুহূর্তেই অস্বীকার করা যায় না, সে সকল মতামতের– তা কলাকৈবল্যবাদীই হোক, কি জীবনবাদীই হোক কিংবা জীবন রূপায়ণের দায়িত্ববাদীই হোক, – প্রত্যেকটিরই শিকড় রয়েছে জাগতিক তাগিদে, বহিরঙ্গ-মুখোশ এদের কোনো কোনোটার যতই অনাসক্ত হোক না কেন!

প্রতিটি কবিতায় অবশ্যই বিষয় থাকতে হয়। কিংবা বলা যায়, কব্যের বিষয়বস্তু সত্য, সত্যের প্রগাঢ় শাঁস। 'ঈদ' কাব্যে যে বাস্তবতা ফুটে উঠেছে তা এমনই সাধারণ সংবেদ্য যে, আমার বলে মনে হয় অথচ ঠিক আমার নয়, কিন্তু পরের, সম্পূর্ণ পরেরও তাকে বলা যাবে না। হেসিওড ও শিলারের সঙ্গে একমত হয়ে এই বিশেষ বাস্তবতার স্বরূপ নির্দেশ করে বলা যায়, কবিতা হলো, 'A forgetfulnese of evils and truce from cares'; এবং 'এ উৎসর্গিত আনন্দের কাছে'। কারণ 'The night art is that alone, which creates the hieghest enjoyment'. রবীন্দ্রনাথ ও অভিনব গুপ্তেরও যেন একই মত– 'রসমাত্রেই, অর্থাৎ সকল রকম হৃদয় বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকে জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ।' এবং 'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদনস্বরূপ একটি ব্যাপার।' এত কথা এততত্ত্ব কবিতার এক দ্বৈত ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে তোলে। প্রথমত, কবিতার আনন্দ জন্ম এবং দ্বিতীয়ত, আনন্দ বিতরণ। স্বভাবতই সৈয়দ এমদাদ আলীর কাব্যের মৌলিকায়নকে ও প্রকাশকে এক ধরনের সন্ধি-সূত্র বলা যেতে পারে, যেখানে বৃন্তের মুখে ফুল ফুটে আছে, আর যার পশ্চাতে রয়েছে এক অনন্ত-নিঃশব্দ পটভূমি।

জীবনের গভীরতর পর্যায়ে-পর্যায়ে সঞ্চরণের জন্য 'ঈদ' কবিতার শব্দ উল্লাসের প্রতিটি স্পন্দনই যেন উন্মুখিত হয়ে আছে।

'হের আজি সবে শুভলগ্নে মিলি
দ্বেষ-হিংসা সব দূরে ঠেলে ফেলি
ভাই ভাই বলি ক'রে কোলাকুলি
সে দৃশ্য কি মধুময়!

আজিকে যেনরে আসিছে ভাসি
নন্দন কুসুমে গন্ধরাশি
আমারি প্রাণে জাগায় হাসি
আশার লহরী চায়।'

সৈয়দ এমদাদ আলীর এই আশ্চর্য সুন্দর পংক্তির প্রতিটি ভাঁজে অপরূপ ভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে একটি বিষয়। আর তা মানবপ্রেম এখানে প্রেমের অনুভূতি এতো প্রগাঢ় অর্থে ব্যাপৃত হয়েছে, তা শুধু প্রেম কিংবা প্রেমিক মানবের দায়িত্ব নিয়েই তা নিঃশেষ নয়।

www.pathagar.com

দু'জনার নির্দিষ্ট কোনো প্রেম কিংবা প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকা বাস্তব ঘটনা সর্বস্ব মাত্র সীমাবদ্ধ নেই এখানে। জীবনের প্রসারের মধ্যে ব্যাপ্ত, ব্যক্তিসম্পর্কিত বিশেষ আবেগ ও অন্তর জ্বালা সংঘাতম প্রসূত ধারণা থেকে জন্ম নিয়ে তা নিজস্ব এক উদ্বুদ্ধ সংবেদনশীলতার ধারণা লাভ করেনি, বরং ঐশী আদেশ, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনের এক মহামিলনের দিন হিসেবে লোভ, হিংসা প্রভৃতি আত্মগত জৈবিক উৎসার থেকে বিরত থেকে মানবের মহামিলনের জয়গান প্রকাশ হয়েছে।

এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে, শিল্পের মাধ্যমে আমরা কি চাই? অনেক বক্তব্যই এ উত্তরে একত্রে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে; কিন্তু মূলগতভাবে একথাই কি ঠিক নয়, যে কোনো শৈল্পিক সৃষ্টির মাঝে আমরা কোনো একটি সত্যি খুঁজি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কবিতা স্বভাবই স্বল্পকায়, উপন্যাসের মত পূর্ণাঙ্গ চিত্রের ধারা যোজনার অবকাশ নেই, তারপরও প্রত্যেক কবিতাই নিজস্ব আবেদনে এক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন সত্যকেই চিত্রিত করার প্রচেষ্টা মাত্র।

কবিতার আবেদন যেহেতু চিরন্তন এবং সে কারণেই কবিকে ত্রিকালের মধ্যে বাস করতে হয়। এক্ষেত্রে আবার বিষয়বস্তু প্রসংগ ঃ কবিতার বিষয়বস্তু হলে জাগতিক আবর্তের স্বরূপ, আর কবির মন– আর নিশ্চিতভাবে কাব্যে কবির মনকেই আমরা আস্বাদন করি; তাঁর আবেগ, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর দেখা, প্রেম-অপ্রেম, সুন্দর-অসুন্দর সম্পর্কে তাঁর রুচি। কবিতার তত্ত্বের ওপর কবির মন আধিপত্য লাভ না করলে কবিতা– কবিতাই নয়। কবি কাব্যে নিজেকেই প্রকাশ করতে চান। নিজেকেই অর্থে নিজের মনোভাবনা বা বিশেষত্ব-প্রবণ মনকে, যাকে সামগ্রিকভাবে জীবনদৃষ্টিও বলা যেতে পারে। কিব মনের অভিব্যক্তি– উন্মুখতা আপন উপাদান সংগ্রহের জন্যে চেতন-অবচেতন সমগ্র পৃথিবী আলোড়ন করে ফিরছে। নিজের মনকেও কাঁটাছেড়া করছে, নিবেশ্লষণ করছে, শিল্পীসত্তার সূক্ষ্মতম চারিত্রিকেও ছকে পাবার দুরূহতম ইচ্ছেয় পর্যায়ক্রমে কাব্যের বিচিত্র পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে কবিতার মাঝে কবির চিরচেনা পরিবেশ, স্থান, কাল ফুটে উঠছে আশ্চর্য এক তুলির পরশে। যেখানে কবি আর সত্য পাশাপাশি অবস্থান নিয়েছে।

কত সখ্য- ঐক্য প্রীতির কথা
কত সুকবির হৃদয়ের ব্যথা
কত বীরেন্দ্রের তেজোময়ী গাঁথা
শুনিনু শ্রবণ ভরি।

কিন্তু গো সকলি মানে পরাজয়
সে দৃশ্যের কাছে, যে দৃশ্য নিয়ে

www.pathagar.com

হেরিছি মুসলীম জগৎময়
আজি পুণ্যের পুলকে।

উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার মহত্তম সৃষ্টি এই কবিতাটি। মুসলমান সমাজের দৃষ্টি ভঙিমা, শ্রীময় জীবনের সৌন্দর্য, দীনতার মাঝে ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও সাধনার পথে প্রারম্ভিক চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল এই কবিতাটি। তদান্তীন সমাজের তথাকথিত পৃষ্ঠাপোষকদের মতামতের ও প্রসন্নতা- অপ্রসন্নতার পেন্ডুলাম আর্থিক রাষ্ট্রিক পদমর্যাদায় এমনটিতেই জ্ঞানে, কর্মে, সাধনায় শিল্প-সাহিত্যে এ সমাজ যতোটা অগ্রসর হয়েছিল তাঁরই এক কর্ণধার সৈয়দ এমদাদ আলী। মুসলিম সাহিত্য সমাজে সাহিত্য চর্চার সঙ্গে দেশের সামনে, বিশেষ করে মুসলমান শিক্ষিতদের সামনে বুদ্ধির, মুক্তির এই কবিতা এক নতুন মাইলফলক।

শেষকথা, যে কবিতা মুসলমানদের ঈদ উৎসবের প্রথম কবিতা হিসেবে সংগৃহীত তা আজকের বিংশ শতাব্দীর এই লগ্নে 'প্রজ্ঞানচরিত্র' দাবি করে। তাঁর উপাদানের ভিতর উপাদান প্রদত্ত সমস্যাগুলোকে নিরসন প্রকল্পে কে এগিকে আসবে থিয়োরি না প্রেক্ষাপট। সামাজিক পরিস্থিতিতে এই কবিতা সত্যন্বেষু একটি মহৎ আধুনিক কবিতা, একথা ভাবা ও বলা যায়।

তথ্যসূত্র;

i. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান।
ii. আধুনিক কবি ও কবিতা : হাসান হাফিজুর রহমান।
iii. নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন : আবুল ফজল।
iv. দ্বিতীয় ভুবন : আলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।

www.pathagar.com

ইকবাল কেন পড়ব

তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য আমরা কোথায় না ছুটে চলেছি? ইউরোপ, আমেরিকা খুঁজে খুঁজে, তর্ক-বিতর্ক করে ক্রমশ সামনে এগুতে চেষ্টা করছি। কিন্তু কতদূর এগোলাম আমরা? এই প্রশ্ন আজ সমাজে ঘুরপাক খাচ্ছে। এমনও দেখা যায়, একটি তত্ত্ব নিয়ে আমরা সারাদিন কাটিয়েছি। কিন্তু শেষে জানা গেল তা বায়বীয়। এভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের পেছনে আমরা প্রকৃত জীবনের দর্শনের অনুসন্ধান করছি। কেন আল্লামা ইকবাল পড়ি : কবিতা জগতের কথা বলে, জীবনের কথা বলে। মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের যে স্বপ্নময় পদযাত্রা সে তো একজন কবিই দেখাতে পারেন। কিন্তু একজন কবি যখন জীবন ও জগতের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবরূপ দিতে পথ বাতলে দিতে থাকেন তখন তিনি দার্শনিক কবিতে পরিণত হন। কবি ইকবাল পড়তে গিয়ে আমার অনুভূতিতে প্রথম যে ধাক্কা লাগে আর তা হল এই অধ্যায়ে আমার আরও গভীরে প্রবেশ দরকার। ইকবাল শুধু মহীরূহ নন, তিনি কালজয়ী স্বপ্নদ্রষ্টা। বর্তমানে এদেশে কবি হতে হলে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। মুখে ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি কপচানো আর তথাকথিত প্রগতিশীলতার অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত হলেই চলে। এদেশে 'সংস্কৃতি' এই শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তার চৌহদ্দির মাঝে 'ইসলাম' শব্দটির অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আধুনিকতার পালে কেবল হাওয়া লেগেছে, তখন এই উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একদল মানুষের মাঝে আশার বাণী নিয়ে এলেন ড. আল্লামা ইকবাল। তিনি এমন এক ক্রান্তিকালে জন্মেছিলেন (১৮৭৭-১৯৩৮) যখনি পৃথিবীময় পশ্চিমা আগ্রাসনের চক্রজালে মুসলিম জাতি অধঃপতিত হচ্ছিল। তিনি মানবতার বাণী লিখে চললেন কবিতায়, প্রবন্ধে, পত্রে; যা ছন্দে, বর্ণে, বৈচিত্র্যে ঝংকৃত হয়ে উঠল। স্বদেশবাসীর আশা-প্রত্যাশার বাণী তার লেখনিতে যেভাবে পরিস্ফুটিত হতে লাগল তা মানবতার পক্ষে জাতি, বর্ণ,ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে উদ্বেলিত করে তুলল। এই যে ড. আল্লামা ইকবালের আন্তরিক চেতনা, ঘনিষ্ঠ প্রত্যাশা। এটিই

www.pathagar.com

আমাদের ভাববার বিষয় স্বদেশে প্রেমের যে আকুলতা তার কবিতায় দ্যুতিময় হয়ে ওঠে তা আলোড়িত করে ঃ

'সকল দেশের সেরা মোদের এ হিন্দুস্তান/মোরা এর বুলবুলি, মোদেরই বাগান।'

১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ড. ইকবাল ইউরোপ যান। পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যতা ও সাংস্কৃতির রূপ নিজের চোখে দেখে তিনি হতাশ হন। সেই সময়েই কান্ট, হেগেল, নীটশে, বার্গসীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্য সাম্যবাদ তার কাছে জড় মনে হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য এই আধুনিকতার সংস্কৃতির গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ভেসে যাবে কি যাবে না– তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। আর সে কারণেই তিনি তার চিন্তাধারা কবিতার মাঝে সে সময় প্রকাশ করলেন ঃ

'জ্ঞান আরা বিজ্ঞানের নবলোকে হয়েছে উজ্জ্বল/শোনা যায়, এই পথে হলো দূর ইউরোপ কিন্তু এ যে সত্য নয়, সেই জ্ঞানসমুদ্রের বুকে/এক বিন্দু পানি নাই, তৃষ্ণা যাতে দূর হতে পারে।'

ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ঃ ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রসঙ্গে একজন লেখক লিখেছিলেন– 'কবি-দার্শনিকদের তীব্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ইকবাল এই বিশ্বগ্রাসী বিপদকে অনুভব করেছেন অত্যন্ত তীব্রভাবে ও অত্যধিক গুরুত্বসহকারে। তিনি মনে করলেন, 'ওয়াতন' (স্বদেশ) যেন মানুষের উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করে বসেছে অথচ বিশ্বব্যাপী মিল্লাতের নক্ষত্রপুঞ্জের সাথে ব্যক্তিসত্তার মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই ইকবাল 'তারানায়ে হিন্দীর' পরিবর্তে লিখলেন 'তারানায়ে মিল্লী'। স্বদেশ পূজা পরিত্যাগ করে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ইসলামী মিল্লাতের বিজয়গাথা রচনায়। স্বাদেশিকতার ক্ষুদ্র-সংকীর্ণ গণ্ডি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ইকবাল পদক্ষেপ করলেন আন্তর্জাতিকতার উদার উন্মুক্ত পরিবেশে; আদর্শবাদিতার বিশাল প্রান্তরে। অতঃপর তার কাব্য ইসলামী ভাবধারা, উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারা তথ্যে-সম্পদে ভরপুর হতে লাগল। তার কাব্যদর্শের এই লক্ষ্য নির্ধারণ এবং আদর্শ ও ভাবধারার দিক দিয়ে এভাবে মোড় ঘুরে যাওয়া স্বাদেশিকতাপন্থীদের কাছে তার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু আদর্শবাদী কাব্যগাথা গোটা মুসলিম জাহানে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'ইকবাল' নামক গ্রন্থে বলেন, বঙ্কিম চন্দ্রের সহিত এক বিষয়ে ইকবালের তুলনা করা হতে পারে। বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও মুক্তি আর ইকবালের লক্ষ্য ছিল বিশ্ব মুসলিম। বঙ্কিমের স্বদেশ ছিল বাংলাদেশ আর তাহার জাতি ছিল বাঙালি-হিন্দু। ইকবালের স্বদেশ সমগ্র ইসলাম জগৎ আর তাহার স্বজাতি বিশ্বের মুসলমান। তাই ইকবার তার 'তারানায়ে মিল্লী' কবিতায় গেয়েছেন বিশ্ব মুসলিমের জয়গান : চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যায় হাম সারা জাহা হামারা।

www.pathagar.com

ইকবালের রাজনৈতিক দর্শনই ছিল বিশ্ব মুসলিম এক সত্তায় মিশে লীন হয়ে যাওয়া এবং বিশ্ব মানবতা। যদিও মানবতাবাদ নতুন বিষয় নয়। উনিশ শতকের আধুনিকতার বিজয় ডঙ্কা বাজানোর দিন থেকে 'মানবতাবাদ' শব্দটি বারে বারে ফিরে ফিরে সমাজে বিশেষ শ্রেণীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তা ছিল কথা। বাংলা কাব্যে সেই মানবতার ছিল সরব উপস্থিতি। কবি চণ্ডীদাস লিখেছেন– 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' সুখের কথা, সব দেশের সব সৎ কবিই এই সর্ব মানবিক, প্রেমময়, গন্ধযুক্ত শব্দ 'হিউম্যানিজম' নিয়ে কথা বলেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতা সভ্যতার চৌকাঠ ডিঙাতে পারুক আর না পারুক 'ইজম' ঠিকই পেরেছে মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করতে। বিখ্যাত কবি অডেন একবার একনায়ক শাসক 'ফ্রাঙ্কোর' বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিলেন। পৃথিবরি সমস্ত বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের অসংখ্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মানবতার পক্ষেই লড়েছিলেন। কিন্তু ফলাফল আমরা কি পেলাম? কিছুই না। ফ্যাঙ্কো আমৃত্যু অপরিমেয় ক্ষমতা ও বিক্রম প্রতাপ নিয়েই টিকে থাকলেন এবং কবি অডেন নিজে দুঃখ নিয়ে স্বীকার করেছেন যে, এ ধরনের বীরত্বব্যঞ্জক উদ্যোগে ও কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে প্রচুর বাহবা পাওয়া যায় বটে, দৃশ্যত এই জাতীয় নাটকীয় মানবপ্রেমের মধ্যে রোমাঞ্চ ও চমৎকারিত্বও আছে, কিন্তু মানবতার মুক্তি আনা তো দূরের কথা, কার্যত এ দিয়ে একটি অতিরিক্ত তৃণও উৎপাদন করা যায় না। এই বিষয়গুলো ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন মেধা, যোগ্যতার আর পঠন-পাঠনের মধ্যদিয়ে। রাজনৈতিক চেতনার মূল সূত্র যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে সমাজ টিকতে পারে না। সংস্কার আন্দোলনে গতিসঞ্চালন সে ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। আদর্শ সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রথমত বিবেচনায় আনতে হয়, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক কতটুকু? রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু আদর্শ প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য মানুষ প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচী ইকবাল বাতিল করে বাতলে দিলেন সহজ পথ, যাতে মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর নিজ দিলের ঐতিহ্য থেকে আধ্যাত্মিক জীবনরস আহরণ করতে পারে।

'পুষ্পের কোমল পানে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশ পরম্পরা/কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন করেছো তুমি ওগো রক্ত ধারা/জ্বলন্ত বালু পারে ছুঁড়ে ফেল আজ আপনারে/ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎসধারে। (আকাঙ্ক্ষা)

বস্তুত ইউরোপের তথাকথিত আধুনিকতার বেলেল্লপনা দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিশ্ব মুসলিম সমাজকে জাগাতে হবে। আর তাই ইকবাল মুসলিম মানসে আবার ইসলামানুসারী বিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য হৃদয়ের পরতে পরতে ছন্দায়িত বীজ বপন করেছেন। এগুলোর উপাদান সংগ্রহ করেছেন ইসলামী জীবন বিধান থেকে। যে আদর্শপুষ্ট সমাজে মানবতার মহান নবী মুহম্মদ (সঃ) গঠন করেছিলেন। রাজনৈতিক এই চিন্তায় তিনি মনে করতেন ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়, যেহেতু জীবন হলো ব্যক্তির অভিব্যক্তি। বিশ্ব প্রকৃতি বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। এতে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে; এবং এ পার্থিব জীবনেই সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে মুক্তি সংগ্রামের

www.pathagar.com

মধ্যদিয়ে। এ জন্য তিনি বলেছেন ঃ

'হে মুসলিম! তুমি কি কখনও চিন্তা করে দেখেছো/ইস্পাত নির্মিত তীক্ষ্ণধার তরবারীর ভাষা কি?/এ হলো সেই কবিতার প্রথম ছত্র/যা তৌহিদদের মর্মবাণী ধারণ করে। কিন্তু আমি আরও বেশী করে ভাবি

এ কবিতায় দ্বিতীয় ছত্রের কথা/আল্লাহ তোমাদের বখশিশ করুন

সেই ত্যাগীর তরবারী/যখন মোমেনে ধারণ করে এ তরবারী

তখন সে হয় বীর খালেদ ও দুর্দম হায়দার সদৃশ।

উনিশ শতকের আরম্ভ থেকে মানুষের সামনে যেসব ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে তার বিশ্লেষণ ও সমাধানকল্পে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের অনেক চিন্তাশীল দার্শনিক আত্মনিয়োগ করেন। স্পেন্ডলারের নৈরাশ্যবাদী প্রচারণা সত্ত্বেও অনেক চিন্তাশীল দার্শনিককে আমরা পাই, সমাধানের প্রচেষ্টায় দিন-রাত মেহনত করছেন। বের্গসঁ-র উদ্‌বর্তবাদ, টমাস ম্যান-এর বুদ্ধিবৃত্তিক মানবতাবাদ, টয়েনবীর খ্রীস্টধর্মসম্মত আপোষবাদ, ওয়েলস-এর যান্ত্রিক স্বপ্নিকতাবাদ দিয়েও সাফল্যের সন্ধানে অনেকেই হয়েছেন আশাহত। প্রাচ্যের দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র এক ব্যক্তিই মানবীয় সমস্যার মোকাবিলায় ইসলামের বিধান অনুসরণ করে রাজনৈতিক সমাধান দিয়েছেন তিনি আল্লামা ইকবাল! তিনি তৎকালীন সময়ে উচ্চারণ করলেন- 'একবিশ্ব' এবং এই একবিশ্বে মানুষকে একটি সার্বজনীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানের সহায়তা নিয়ে একটিমাত্র বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে। মানব সভ্যতা রক্ষার জন্য এছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি আরও বলেন, এসব মূল্যমান আসে এক আল্লাহর বিশ্বাস থেকে। অতএব ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন হল আল্লাহর বিধান এবং মানব সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি হল তৌহিদবাদ– নিরেট-নিখাঁত একাত্মবাদ।

অস্তিত্ববাদী ইকবাল ঃ অস্তিত্ববাদের পরিচয় দিতে গিয়ে সাত্রে বলেছেন ঃ

In any case. We can begin by saying that Existentialism. in our sense of the word, is a doctrine that does render human life possible: a doctrine also which affirms that every truth every action imply both an environment and human subjectivity. অর্থাৎ 'অস্তিত্ববাদ এমন এক মতবাদ, যে মতবাদ মানবজীবনকে সম্ভমপর করে তোলে এবং যে মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি সত্য এবং প্রতিটি কর্মপরিবেশ ও মানুষের আত্মীকতা উভয়কে বোঝায়।' সমাজের স্তরে-স্তরে সত্তার উচ্চারণকে উচ্চকিত করার জন্য অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রয়োজন। এটা সামাজিক ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অন্তশীল দ্রোহ। কাম্যুর ভাষায় 'Rijal'। এই দ্রোহের ধারা হচ্ছে অস্তিত্ববাদী দর্শন। ফিওদর দস্তরভস্কি, কাফকা, আলবেয়ার কাম্যু জ্যাঁ-পল সাত্রে, সোরেন কিয়াকেগার্ড, মার্টিন হাইডেগার, ফেড্রারিক, নিটশে, গাব্রিয়েল মার্সেল, নিকোলাই বেরদায়েভ, কার্ল

www.pathagar.com

ইয়েপার্স, জোসে, ওর্তেগা, ওয়াই গেসেট, মিগিউল দ্য উনমুনো সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্ববাদী সাহিত্য ভাণ্ডার। আমরা কথা বলতে চাচ্ছি ইকবালের অস্তিত্ববাদী দর্শন চেতনা নিয়ে। অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল এক কবিতায় বলেছেন ঃ

Tighten the knot of thy ego/And hold
fast to thy tiny being/How the sun!
Re-chisel, them, thine ancient frame
And build up a new being/Such being
is real being/Or else thyego is a mere
ring of smoke!

অর্থাৎ 'তোমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে দৃঢ়হস্তে ধরো।/কী গৌরবের সত্তার আবর্জনা দূর করে সূর্যরশ্মিতে তা দীপ্তি পরীক্ষা করা।/তোমার পুরানো কাঠামোকে নতুন করে রং দাও নতুন অস্তিত্ব গড়ে তোল-/সেই খাঁটি অস্তিত্ব/নয়তো তোমার সত্তা একটি ধূম্রজাল মাত্র।'

প্লেটোর মতে– ব্যক্তিসত্তা নয়, ভাব জগৎ হচ্ছে পরম সত্য। ভাব জগতেই (World of ideas) পরমসত্তার আসল আবাসভূমি। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা বস্তুকে নিয়ে গড়ে ওঠে এই ভাব জগৎ। আর ইন্দ্রিয় জগৎ ভাব জগতের প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছুই নয়। ইন্দ্রিয় জগতের বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু সার্বিক ধারণার (UNIVERAL IDEAS) অংশ বিশেষ। ব্যক্তি সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন দার্শনিক হেগেল। তার মতে পরম সত্তাগুলো পরমাত্মায় (Absolute soul) সমর্পিত। এ জগৎ পরম আত্মনির্ভর সত্তা। জড়বস্তু ও জীবাত্মা নিয়ে গঠিত এই বিশ্বজগৎ পরমাত্মা থেকেই উদ্ভূত। ব্যক্তিসত্তা পরমাত্মার অবভাস ছাড়া কিছুই নয়। হেগেলের এই সর্বেশ্বরবাদী (Paitheist) দর্শনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্বসত্তায় বিলীন করে দেয়া হয়েছে, অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিলোপকারী সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের ঘোরবিরোধী। কিন্তু সাত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনে আমরা পাই 'অস্তিত্বসত্তার পূর্বগামী।' মানুষ নিজেই স্বাধীনভাবে নিজের কর্মের নিয়ন্তা, মানুষে এ স্বাধীনতা কোন নিমিত্তবাদ দ্বারা অবরুদ্ধ নয়। এখানেই আল্লামা ইকবালের অস্তিত্ববাদী চেতনা অন্যসব থেকে আলাদাভাবে নজরে পড়ে। তিনিও আত্মসত্তার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'আত্মসত্তা ব্যক্তির অস্তিত্বের বিনির্ণায়ক। আত্মসত্তা এখনো প্রদত্ত কিছু নয় এবং এ কারণেই একে অর্জন করতে হয় সব আন্তর ও বাহ্য বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা দ্বারা। পরিবেশের বিরুদ্ধে অহমের কিংবা অহমের বিরুদ্ধে পরিবেশের আক্রমণ প্রসূত যে টান, অহমের জীবন অনেকটা তারই সদৃশ। এজন্যই অহং ও পরিবেশের মধ্যে থাকা চাই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।' পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই অহং লাভ করে সমৃদ্ধি। ইকবাল মন্তব্য করেছেন এভাবে : 'In man the centre of life becomes an ego or person personality is a state of tension and can continue only of that state is maintained. If the state of tension is not

www.pathagar.com

maintained relaxation will ensue.' ইকবালের অস্তিত্ব চেতনার আর গভীরে গেলে দেখা যায় অজস্র তথ্য। যা ব্যক্তির মানবিক গুণাবলীকে করে ঋদ্ধ। যদি সেই তথ্যানুযায়ী কাজ ও জীবন পরিচালিত করা যায়। ইকবাল আর এ নিকলস (R.A. Necholson)-কে লেখা চিঠিতে লিখেছেন- 'ব্যক্তিসত্তার বিকাশের অনুকূল ও প্রতিকূল ধারাসমূহ ব্যক্তির মধ্যে একটা প্রতিমান (Standard value) সৃষ্টি করে। যার মাধ্যমে ব্যক্তি ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। এই প্রতিমান বোধ থেকে ব্যক্তি নির্ণয় করতে পারে তার অস্তিত্ব কোন কোন এসেন্সের পূর্বগামী। তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ The ultimate end of all human activity is life-glorioes, Powerful, Exulserant, all human art must be subordinated this final purpose, and the value of everything must be determined, in riference to is life yielding Capacity.'

ইকবালের অস্তিত্ববাদী চেতনায় বাস্তব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে বাস্তবকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে সাত্রের মত 'এসেন্স'কে অস্বীকার করে বিরোধপূর্ণ দর্শন পয়দা করেননি। এজন্যই ইকবালের দর্শন সাত্রের দর্শন থেকে অনেক সুচিন্তিত ও সংহতিমূলক। ব্যক্তি বিশ্ব আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে; নয় বরং নিজের স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই এবং সে মহিমায় প্রজ্বলিত হওয়াই মানবসত্তার কাজ। একথাই সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য রচনাবলীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইকবাল নিকলসনকে লেখা চিঠিতে বলেছেন- 'All life is individual; there is in no such thing as universal life. Good Himself is an individual. He is the most unique individual.'

ইকবালের দর্শনের মূল হল Back to the Quran. এই ইসলামী ভাবদর্শ হৃদয়ে গ্রোথিত করে তিনি 'খুদী' দর্শন ও প্রবর্তন করেন। খুদী বা ব্যক্তির বিকাশে একমাত্র ইসলামী জেন্দেগী হুবহু পালন করলে বিকশিত হয় একথা তিনি কবিতায়, পত্রে, গদ্যে লিখেছেন। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম কোন সাধারণ ধর্ম নয়, একথা বুঝতে পারলেও তবেই সম্ভব ইকবালের অস্তিত্ববাদী চেতনায় অনুপ্রবেশ করে 'খুদী' দর্শনের অনন্তসুধা পান করার। আমাদের দেশে এখন ইসলাম প্রসঙ্গ হলেই অভিজ্ঞতা ও মূর্খতায় একটি শব্দ মুখে মুখে উচ্চারিত হয়, তা হল 'মৌলবাদ'। বলতে আপত্তি নেই, আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ফ্রেডারিক নিটশে, গাব্রিয়েল মার্সেল, সাত্রে, কাফ্কা, হেগেল, সোরেন কিয়াকেগার্ড, ডারউইন, মার্কস, লেনিন নিয়ে পড়াশুনা তর্ক-বিতর্ক করেছি; কিন্তু উন্নাসিকতাই বলি কিংবা অজ্ঞতাই বলি আমরা কখনো ড. ইকবাল, ড. মরিস বুকাইলি, ড. আহমদ দিদাত, এ্যাডওয়ার্ড সাইদ পড়ি না। বরং এগুলোর মাঝে 'মৌলবাদ' লুকিয়ে আছে এমন তথাকথিত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না।

শেষ কথা

ইকবাল পড়ে মনে হচ্ছে, লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত অথবা জীবন দর্শন তালাশে

www.pathagar.com

নিয়োজিত এমন মানুষের ইকবাল অনুসন্ধান অপরিহার্য। আজকের বিশ্ব মুসলিম সমাজের এই দুর্দশায় ইকবাল বেঁচে থাকলে শক্ত হাতে কলম ধরতেন। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবজাতি বাহ্যত উন্নতি-অগ্রগতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে অনেক। মুহূর্তেই মানুষ বিশ্ব গ্রাম পরিভ্রমণে যেতে পারে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত। সভ্যতার দাবিদার আমরা- মানবসমাজ আজ কতটা অগ্রসর হতে পারলাম তা ভাববার বিষয়। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠীর যে অবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন একদা মুহাম্মদ (সাঃ) সেই পথ আজ দুর্গম হয়ে গেছে। মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণে আজ আমাদের ভূমিকা কি? মুসলিম-অমুসলিমের সংঘাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশ্ব মুরব্বী আমেরিকা নাখোশ মুসলমানদের ওপর। ফলে একজন ওসামা বিন লাদেনকে ধরার নামে হাজার হাজার শিশু-নারী-যুবক-মহিলার জীবনলীলা স্তব্ধ করে দিল আমেরিকা।

আফগানিস্তানে গোরস্থান বৃদ্ধি পেল। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্ষণ-খুন হল কত না মুসলিম নর-নারী। আর ফিলিস্তিনী নব্য ইসরাইলী হিটলার-শ্যারনের মৃত্যুথাবা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। চেচনিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনিয়া, কাশ্মীরে আজ কী অবস্থা? এর মূল কারণ মুসলমান সমাজে অর্থ-বিত্ত প্রচুর হয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি তা হল আধুনিক জ্ঞান, যে জ্ঞানের অভাবে মুসলিম সমাজ সব থাকা সত্ত্বেও সামনে এগোতে পারছে না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ঝেড়ে ফেলে আমাদের কেবল একটিই কাজ– পড়া। পড়া এবং পড়া। আল্লামা ইকবালের দর্শন আমাদের সেদিকেই পরিচালিত করে। আমরা মুখে মুখে ইসলামের কথা বলি, কিন্তু ক'জন ইসলামের দলিল গ্রন্থের শব্দার্থ, আভিধানিক অর্থসহ পাঠ নিয়েছি? আমরা কি বুঝি ক্রুসেড, জিহাদ, এপ্রিলফুল কি? প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মুসলমান এগোতে পারছে না। ইকবাল শুধু নিছক কবি নন, দার্শনিক। কোন দর্শনের দার্শনিক, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। বুঝতেই হবে কারণ এখন সময় আর বিশ্ব গ্রাম একই সমান্তরাল এগোচ্ছে।

www.pathagar.com

অনন্য নজরুল এবং বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গি

সাহিত্যচর্চার নিমিত্তে সাহিত্যের কমল বনে একজন কবির সাহিত্যভাণ্ডার অনুসন্ধানে যে দিকেই তাকাই না কেন কোনো কূল-কিনারা পাই না। মেঘে ঢাকা আকাশের মাঝে সহসা সূর্য উঁকি দিলে তাঁরও গতিবিধির তাপমাত্রা নির্ণয় সম্ভব। কিন্তু বাংলার বুলবুলখ্যাত কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ভাণ্ডারের দিকে চোখ ফেরালে সহসাই চোখ সরিয়ে নেবার উপায় নেই। এত দীর্ঘ! এত বিচিত্র! এতো চাকচিক্যময়, বর্ণাঢ্য সাহিত্য সম্ভার রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বোধকরি আর কারো নেই। সততা, মানবতা, মনুষ্যত্বের জয়গান, সাম্য, মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, স্বাধীনতা অর্জনে সোচ্চার এক যোদ্ধা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ধর্মের আর্থ-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সহাবস্থান এমন সব বিরল গুণ তাঁর কবিতায়, গানে, নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, ভাষণে-অভিভাষণে অবস্থান করত- যা বাংলাসাহিত্য তাঁর এই অমর সৃষ্টিকে সার্বজনীন গ্রহণের অন্তরবাণী রূপে পরিগণিত। রবীন্দ্র যুগের প্রচণ্ড রবীন্দ্র মোহমুগ্ধ কবিবলয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মতনই এসেছিলেন। আর কাজীর আবির্ভাবলগ্নে মোহমুগ্ধ রবীন্দ্র ভক্ত তাই এই নতুন ভাষা, নতুন টেকনিক, নতুন কাণ্ডারীকে সহজেই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন নজরুলের প্রতিভা। আর তাই স্বাগত জানালেন বাঙালির মহাজাগরণেই এই নির্ভীক সিপাহসালারকে ঃ

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনে এই দুর্গশিরে

www.pathagar.com

উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অল্পক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে-রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন [২৪ শে শ্রাবণ]

আমরা এখন নজরুল কাব্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ঃ

নজরুল কাব্যে নারী ঃ উনিশ শতকে সনাতন ভারতীয় আদর্শ এবং পশ্চিমের আধুনিক নারী স্বাধীনতার আদর্শে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নারী চরিত্রে বীররস, প্রেমরস, করুণরস পাওয়া যায়। বীরাঙ্গনা ও প্রেমিকারূপে মাইকেলের নারী চরিত্র চিত্র উজ্জ্বল। মাইকেলের উত্তরসূরি হিসেবে মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে ও নারী চরিত্রে মাইকেলেরই চিত্রকল্প ছায়া দেখা যায়। অর্থাৎ কায়কোবাদের নারীতেও বীররস, প্রেমরস, ও করুণরস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চত্য মানবতাবাদের প্রেরণায় ও ব্রক্ষ দর্শনে আনুগত্য তা সাহিত্য নারী ও পুরুষসত্তা আঁকলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

নারীকে আপন ভাগ্যে জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা-
যাবনা বাসর কক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমার প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী [সবলা : মহুয়া]

নজরুলের কাব্যে নারী এসেছে বহুমুখিতায়, নজরুল তাঁর কবিতায় ইসলাম ধর্ম ও সাম্যবোধ থেকে, যেখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অতুলনীয় মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সমঅধিকারের মৌল চিন্তায় তাঁর কবিতার পঙক্তি উদ্ভাসিত। ধর্মের অনুশাসন বিধি কাজী নজরুল ইসলাম জানতেন, আর তাঁরই প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর নারী চরিত্র সৃষ্টিতে।

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ
পুরুষ এসেছে মরু-তৃষা লয়ে, নারী জোগায়েছে মধু।

কোনকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।
[নারী ঃ সাম্যবাদী]

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য আকাশে নজরুল নামক ধূমকেতু সহসা চমকিত হয় 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে। সেই 'বিদ্রোহী' কবিতার পরতে পরতে চরম বিদ্রোহের আগুনের পাশাপাশি নারীর সুষমাখচিত সৌন্দর্য মহিমা সৃষ্টি করেছেন। 'এক হাতে বাঁশের বাঁশরী আর এক হাতে 'রণতুর্য' এই দুইয়ের মাঝে বারে বারে সচেতনভাবে নারীর চিত্র ফুটে উঠে বিদ্রোহী কবিতাকে করেছে মহিমান্বিত।

আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার
কাঁকন-চুড়ির-কনকন
আমি চির-শিশু, চির কিশোর
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচুলি
নিচোর।

[বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা]

নজরুলের বিদ্রোহ

প্রত্যেক মৌলিক প্রতিভার একটা দায় থেকে সমাজের প্রতি, জনগণের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি। কবিসত্তা সৎ প্রলেপে আচ্ছাদিত থাকলে সে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী আত্মা। জীবনের গান তার কণ্ঠস্বর দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে অনিবার্য পরিণতির জন্য। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম এমনই এক দেবতুল্য নাম- যা তদানীন্তন ভারতবর্ষের অন্যায়-অত্যাচার-জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি- যার অনলবর্ষী কবিতা, গানে অন্যায়ের সাম্রাজ্যের ভিতে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। পরাধীনতার বিরুদ্ধে, দাসত্বের শিকল ভাঙার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে নজরুল বিদ্রোহ করেছিলেন। আর বিদ্রোহীমূলক লেখার পাশাপাশি তার কবিতা, গানে ফুটে উঠেছে শোষিত ও নিপীড়িত জনতার ব্যথা-বেদনা-কষ্টের চিত্র। বিদেশী বেনিয়া শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নজরুলের কাব্য হুঙ্কার সমগ্র জাতির হৃদস্পন্দনের মত, একমত, একসুর, একগান হয়ে বেজেছিল। উপমহাদেশে নজরুলের আবির্ভাবে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতনের-বর্বরতার সমুচিত জবাব তিনি দিয়েছিলেন তার সাহসী তেজোদীপ্ত লেখনিতে 'নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি। শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর এই নতুন করে গড়ার আশাতেই তো যত শীঘ্রই পারি ভাঙি– আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা পুরাতনকে পতিত করি...।' এভাবে কাজী নজরুল ইসলাম তার ভাবধারাকে কবিতায়, গানে, গদ্যে রূপ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

* আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন:

আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির

বক্ষ করিব ভিন্ন। [বিদ্রোহী]

* আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

সাত-সাতাশ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে। [ধূমকেতু]

কবিতায় যেমন বলেছেন প্রবন্ধেও তিনি লিখেছেন অকুতোভয় বীর সেনাপতির মত। 'নবযুগ' প্রবন্ধে কবি লিখলেন- "আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন।... ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত-নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনাৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ...এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান। এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।"

আবার গানের মাঝে নজরুলের বিদ্রোহ যেন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে ঃ

কারার ঐ লৌহ-কপাট

ভেঙে ফেল, করলে লোপাট

রক্ত জমাট

শিকল পূজার পাষাণ বেদী।

ওরে ও তরুণ ঈশান

বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।

ধ্বংস নিশান

উড়ু ক প্রাচীর প্রাচীন ভেদী! [ভাঙার গান]

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,

এ যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।

এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা

মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

[শিকল পরার গান : বিশের বাঁশী]

নজরুলের সাহিত্য বাস্তববাদ ঃ জগৎ ও জীবনের যথাযথ রূপের অভিব্যক্তিই হল

www.pathagar.com

বাস্তববাদ বা (জবধষরংস) কবি যে সময়টিতে অবস্থান করছিলেন, সে সময় ছিল বিপ্লবের। জগতকে চিনতে চাওয়ার চেয়ে জাতির স্বাধীনতা অর্জনই সে সময়ের মুখ্য ব্যাপার। বাস্তব প্রেক্ষাপট নজরুলের কবিতায়, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, এতে করে কবি কল্পনার ফানুস থেকে নেমে একেবারে গণমানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। নিছক সাহিত্যের খাতিরে কিংবা গণমানুষের প্রাণের দাবীতে নজরুল রচনাবলী মাটির কাছাকাছি আসেনি। নজরুল একজন বিরল প্রতিভার কবি। আর মহাকবি মাত্রই জীবন ও বাস্তব থেকে সাহিত্যের মালমসলা সংগ্রহ করেন। স্রষ্টা যখন তার চয়ন করা বাস্তব উপাদানে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অর্থাৎ আবেগের প্রলেপ দিয়ে নিজের ধ্যান-ধারণাসহ সাহিত্যে সেই অভিজ্ঞতার চিত্রকল্প তৈরি করেন, তখনই তা প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে বস্তুকে নিবিড় রসচেতনায় উপলব্ধি করেন এবং অত্যন্ত দক্ষ মাঝির মতন সেই বস্তুকে পরম রমণীয় করে পাঠকের রসবোধে অধিগম্য করাতে সক্ষম ছিলেন বলেই সাহিত্য হৃদয় থেকে হৃদয়ে হয়ে আমরত্ব লাভ করেছে। কবির কল্পনার ঐশ্বর্যে মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশের নিবিড় সম্পর্কটি এক বৃহৎ সত্যে ব্যঞ্জিত। তার প্রকাশ ঢঙে কোনো ছলাকলা কিংবা কৃত্রিম মিথ্যার ভাষণ নেই। চিত্তকে বিশুদ্ধ করতে হবে তাঁর সাহিত্য-শিল্প কৌশলের একেবারে মাটির কাছ থেকে মালমসলা গ্রহণ করেছে। আর একারণেই নজরুলের সাহিত্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য চিত্র। এখানে উপমা আছে, চিত্রকল্পময়তা আছে, দর্শন আছে, বিদ্রোহ আছে, আছে শান্তরসে কানায় কানায় পূর্ণ আবেগ। নজরুলের সাহিত্যে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ালে অস্বস্তি কিংবা বিরক্ত লাগে না। মন আঁকুপাঁকু করে। দেশ, কাল, ঐতিহ্য, ধর্ম জানার এই নতুন অধ্যায়ে।

*** প্রার্থনা করো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস**
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ
[আমার কৈফিয়ত : সর্বহারা]

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান
[সাম্যবাদী : সাম্যবাদী]

নজরুলের গদ্য উপমার স্টাইল ঃ একটি কবিতায় 'উপমা' কবিতাকে সাজায়, চিত্তাকর্ষী করে তোলে। পাঠকের হৃদয়ে জাগায় মধুর অনুভূতি। কিন্তু গদ্য। গদ্যের ক্ষেত্রে যখন উপমা বসে তখন কবিতার মত গদ্যও পরিণত হয় সরস, সরল, সাবলীল। গদ্য অনেক সময় পাঠককে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া গাড়ির মত ধাক্কাতে ধাক্কাতে চালাতে হয়। গদ্যে যদি 'উপমা' থাকে তাহলে গদ্যও সৌন্দর্য বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'নজরুলের কবিতা' তো বটেই, গদ্য পাঠ করলে এ সত্য প্রমাণিত। আর এ কারণেই আমার এই

www.pathagar.com

নিবন্ধে বলতে ইচ্ছে করছে নজরুল মহাকবি এবং বিশ্বকবি। 'বিশ্বকবি' হওয়ার সবগুণ মাঝে পাওয়া যায়। তারপরও নজরুলের অবহেলিত। নজরুলের সাহিত্যে অপরাহ্নের উত্তপ্ততা খুঁজে পাওয়া যায় আবার পূর্ণিমার শান্ত আলোর মত স্নিগ্ধ ও কোমলতা তার সাহিত্যে বিরাজমান।

*** ছোট গল্পে নজরুলের উপমা ঃ**

i. কামনাটা হচ্ছে ঠিক এই বাদলের মত; আর প্রম জ্বলছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মত একইভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে। [ব্যথার দান]

ii. আঙুরের ডাঁসা থোঁকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢলঢল করছে পরীস্তানের নিটোল স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদীদের মত। [ব্যথার দান]

iii. মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জ্যোৎস্না যেমন ছিটেফোঁটা হয়ে পড়ছে সারা বনটার বুকে। এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতাবাঘের মতো দেখাচ্ছে। [হেনা]

iv. হেনা তার কস্তুরীর মত কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে- 'সোহরাব, আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসতে পারিনি। [হেনা]

v. তার সামনে এক টুকরো টাটকা কাটা কলজের মত এই সন্ধ্যাতারাটি ফুটে ওঠে। [অতৃপ্ত কামনা]

vi. তখন গাঁয়ের মাথায় মায়ের নত-আঁখির স্নেহ চাওয়ার মত এই নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে। [অতৃপ্ত কামনা]

vii. আমার বাহির-ভিতর সব কিছুই যেন খোট্টাই মুল্লুকের চোট্টাই ভেইয়্যার মতই কাঠখোট্টা [রাজবন্দীর চিঠি]

viii. পাকা তবলচির মত রেলগাড়িটা কি সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে [রিক্তের বেদন]

ix. এই গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দটা কত অরুন্তদ গভীর! ঠিক যেন গির্জায় কোন্ অতীত হতভাগার চিরবিদায়ের শেষ ঘণ্টাধ্বনি। [রিক্তের বেদন]

x. আদরিণী অভিমানী বধূর মত সন্ধ্যা তার মুখটাকে ক্রমশই আঁধার করে তুলছিল। [মেহের নেগার]

xi. একটু আগের বর্ষা-ধোওয়া ছলছলে আকাশ। যেন একটি বিরাট নীলপদ্ম। তারি মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক ভ্রমর! [শিউলী মালা]

xii. সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষা রাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেলল। [অগ্নিগিরি]

উপন্যাসে নজরুলের উপমা ঃ নজরুলের 'বাঁধন হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের

www.pathagar.com

অসংখ্যা উপমা হতে যতকিঞ্চিৎ ঃ

i. কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে দিবি-শান্ত স্থির বেশে যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলো পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরে দিকে পিঠ করে বসে আছে। [বাঁধন হারা]

ii. এখনও রয়ে রয়ে ক্ষীণ। বিজুলী চমকে চমকে উঠছে, ও বুঝি ঐ সুন্দরীর তড়িতাঙ্গ সঞ্চালনের ললিত চঞ্চল গতিরেখা। [বাঁধন হারা]

iii. পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর। যেন কোন খেয়ালী শিশুর খেলা শেষে ভাঙা খেলাঘর। [মৃত্যুক্ষুধা]

iv. হিন্দুও দু'চার ঘর আছে– চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মত। [মৃত্যুক্ষুধা]

নজরুলের 'ঝিলিমিলি' নাটকে উপমা ঃ

i. সারা আকাশ যেন জুঁই বাগানের মত বিকশিত উঠিয়াছে। [ঝিলিমিলি]

ii. এ আমি কে? কার মত বোধহয়? এ যেন সকলের মুখ। এ যেন শকুন্তলার, এ যেন মালবিকের, এ যেন মহাশ্বেতার মুখ। এ যেন লাইলীর, এ যেন শিরীর মুখ। [ঝিলিমিলি]

নজরুলের প্রবন্ধে উপমা ঃ

i. সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইও। [নবযুগ : যুগবাণী]

i. অন্তরে যাহারা ঘৃণ্য, নীচ আর ছোট হইয়া গিয়াছে, আত্মসম্মান জ্ঞান যাহাদের এত অসাড়হিম হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে চাই এই ডায়ারের দেওয়া অপমানের মত বজ্রবেদন। [ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ : যুগবাণী]

ii. বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক। [বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান : যুগবাণী]

iii. এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কখনো চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেতলোক ফেরতা বীভৎস নরকঙ্কাল [ধর্মঘট : যুগবাণী]

iv. অধীনতা মানুষের জীবনীশক্তিকে কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার মত ভুয়া করিয়া দেয়। [আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন : যুগবাণী]

নজরুলের বিশাল কাব্যসম্ভার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, ছন্দের যে বিশাল কারুকাজ দেখা যায় এ প্রসঙ্গে এ লেখায় উদ্ধৃতি দিলাম না। অনেকেই নজরুলের কবিতায় ইতিহাস চেতনা খুঁজে পান না। নজরুল তার কবিতায় মাঝে একাধিকবার ইতিহাসের ঘটনা টেনে এনেছেন নিজ মেধার বুননে।

নজরুলের ইতিহাস চেতনা ঃ একজন কবিকে ইতিহাসের অধ্যাপকের মত অজস্র ঘটনা জানতে হয় না। কবি তার সময়, প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রেম এসবের উপর কবিতা লিখেও

www.pathagar.com

কবি সময় অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু একজন কবি যখন কাল সচেতন, সময় সচেতন, রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন, তখন তাকে ইতিহাসবেত্তা না হলেও ইতিহাস সচেতন হয়ে উঠতে হয়। বড় ও মহাকবিরা ইতিহাসের শরণাপন্ন হন কবিতার স্বার্থেই। কখনো মহাকাব্য লিখতে, কখনো উপমা, উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজনে, কখনো গণজাগরণের ক্ষেত্রে, কখনো চিন্তাদর্শের ব্যাখ্যার জন্য, কখনো দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য। এক্ষেত্রে উনিশ শতকে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম স্মরণযোগ্য। ইতিহাস ছোঁয়া মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' আজও কবিদের অস্তিমজ্জায়, শিরায়-শিরায় ওঙ্কার ধ্বনি তোলে। মাইকেল তার মেঘনাদবধ কাব্যে বীরবাহুর মৃত্যুকে সাজান এভাবে ঃ

পড়িয়াছে বীর বাহু-বীর, চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কাল পৃষ্ঠাধারী
এড়িলা। একাগ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।

এখানে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ইতিহাস এসেছে, তবে আড়াল দিয়ে। কিন্তু নজরুলের কাব্যে ইতিহাস সচেতনভাবে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

i. **যাক্‌রে তখত-তাউস**
জাগ্‌রে জাগ্ বেহুঁশ
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক রুশ!

জাগিল তারা সকল
জেগে ওঠ হীনবল।
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধুলায় তাজমহল।

[চল্ চল্ চল্]

ii. **চাষা বলে কর ঘৃণা!**
দেখ চাষা রূপে লুকায়ে জনক-বলরাম এলো কিনা।
যত নবী ছিল মেষের রাখাল তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী-যা আছে রবে চিরকাল

[মানুষ : সর্বহারা]

www.pathagar.com

iii. নাই তাজ!
নাই লাজ?
ওরে মুসলিম খজ্জুর শীর্ষে তোরা সাজ
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর আওয়াজ
[ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহাম]

ইতিহাসে দেখা যায়, একটা দেশ ও জাতি ক্ষীণ দুর্বল অবস্থা থেকে একদিন সবল-শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে, আবার উন্নত অবস্থা থেকে একদিন দরিদ্র অবস্থায় নিপতিত। আবার দরিদ্র ও বিপন্ন অবস্থা থেকে পরাক্রমশালী জীবনে ফিরে এসেছে। অধঃপতিত ও পশ্চাদপদ গোঁড়ামি-কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে ইতিহাস সচেতন করে তুলতে রোম, গ্রীস, রাশিয়া ও পারস্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার কবিতায়। ধ্বংসের ভস্মস্তূপ থেকে তারা যদি উঠে আসতে পারে তাহলে এই মুসলিম সমাজ কেন পারবে না? নজরুলের উপলব্ধি হয়েছিল পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি যেভাবে সচেতন সংগ্রামের দ্বারা বন্ধনের শিকল কেটে বেরিয়ে এসেছে একই প্রক্রিয়ায় উপমহাদেশের মানুষের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শিকল হতে মুক্ত করতে নজরুল ইতিহাস, ঐতিহ্যের দিকে তাকালেন এবং তার কবিতায় মশাল জ্বালালেন।

নজরুল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এবং প্রাসঙ্গিক বচন ঃ বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ যেমন, মাইকেলও তেমন আক্রমণের বলি হয়েছিলেন। তবে মাইকেল নতুন ভাষা ও এপিক লিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে বুদ্ধদেব বসুও তাকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়ার কারণে উত্থান পর্ব থেকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত। একদিকে বন্যার পানির মতো জনপ্রিয়তার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল নজরুলের সর্বাঙ্গে, অন্যদিকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছিল কবিসত্তা। কিন্তু একজন বুদ্ধদেব বসু, যাকে আমি একজন দৃষ্টি স্বচ্ছ কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ভাবি, তিনি কি করে অন্ধের হাতি দেখার মতন লিখেছেন- 'পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েনি, বয়স্ক হননি, পরপর তাঁর বইগুলোতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। [কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু, পৃষ্ঠা-১৩০] একজন বুদ্ধদেব বসু, যিনি কবিতা লেখেন, কবিতা বোঝেন তিনি কি শুধুই নজরুলের কবিতার চোখ বুলিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন নাকি নজরুলের কবিতার গূঢ়রহস্য আবিষ্কার করে ভয়ে ভীত হয়ে নজরুলের প্রচার-প্রসার থামানোর চেষ্টায় কলম ধরেছিলাম। বুদ্ধদেব বসু'র 'কালের পুতুল' গ্রন্থে ঐ একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'বায়রন সম্বন্ধে গ্যেটে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধে ও সে কথা সত্য ঞযব সড়সবহঃ যব যরশহং যব রং ধ পযরষ এবার দেখা যাক নজরুল শুধুই কি প্রতিভাবান বালকের মত

www.pathagar.com

লিখে গেছেন ঃ

i. 'আমি মৃন্ময় আমি চিন্ময়
আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-ধুর্জয়
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য'

[বিদ্রোহী]

ii. গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি জ্ঞাতি

[মানুষ]

iii. দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল।

[কুলি-মজুর]

এই কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে অশ্রুকুমার সিকদারের- 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়'-এ আধুনিক কবিতার সংজ্ঞায় তিনি লিখেছেন- 'তিনিই আধুনিক যিনি আধুনিককালের মানুষ, এবং যাঁর রচনায় আধুনিক পরিস্থিতি তার জটিলতাময় সমগ্রতা নিয়ে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে; আধুনিককালকে যিনি উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধিকে যিনি তাৎপর্যময়ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। আধুনিকতার উৎস নির্ণয় করতে গেলে একটা সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়।' এই সংজ্ঞার সাথে একটি বিষয় পরিষ্কার, আর তা হলো নজরুল এক শক্তিমান আধুনিক কবি। এই কবি জীবন ও জগৎকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন।

নজরুল ছিলেন 'প্রতিভাবান বালক'– বুদ্ধদেব বসুর এ বাক্যের নিজস্ব মতামত দেবার পূর্বে তদানীন্তন সাহিত্য সমাজের কতক উক্তি ঃ

i. এবার ঁ ঢ় যঁহমবৎ ংঃৎরশব, ড়ঁৎ ষরঃবৎধঃৎব পষধরসংড়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

www.pathagar.com

ii. 'বাঙলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যা রূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কাব্যভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ-প্রীতিকার প্রাণহীন চারুচাতুরিতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাহার হৃদয় নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে।'

[মোসলেম ভারত পত্রিকার সম্পাদকে লিখিত মোহিতলাল মজুমদারের চিঠির অংশ]

iii. 'আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তার সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল।'

[বাঙালী কবি নজরুল : প্রফুল্ল চন্দ্র রায়]

iv. 'কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন সুর বাজিয়া ওঠে। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের নূতন ভাবধারা আনয়ন করেন।' [নজরুল সাহিত্যে নূতন ভাবধারা : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত]

v. 'রবীন্দ্রনাথ পরে কোন একক প্রতিভার মধ্যে বাংলাদেশে এত বৈচিত্র্যময় প্রতিভার সংমিশ্রণ তার পূর্বে ও পরে আর কারও মধ্যে ঘটতে দেখা যায়নি।' [নজরুল প্রতিভা পরিচয়: সুফী জুলফিকার হায়দার]

এরকম অসংখ্য অসংখ্য উদাহরণ এ নিবন্ধে সংযুক্ত করা যায়। নজরুল যদি প্রতিভাবান বালকই হতেন তাহলে সমকালীন বাংলা কবিতার শীর্ষ ঋষি পুরুষরা তার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করতেন না। তবে আমার অন্য একটি চিন্তা আজকাল প্রায় উঁকি দিচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু কি নিজেই শেষমেশ ছেলেমানুষি করে ফেললেন? 'কালের পুতুল' প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬। ততদিনে নজরুল প্রসঙ্গে সমালোচকদের একাধিক লেখা প্রকাশ পেয়েছে, বুদ্ধদেব কি কোনো লেখাই পড়েননি?

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'কবির কাজও অন্যান্য প্রবন্ধ' এই বইটিতে বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- 'রবীন্দ্রনাথ তার শক্তিমান পূর্বসূরির সমালোচনা করেছিলেন অপরিণত বয়সে। পরে অল্প বয়সের ঔদ্ধত্য ও যুক্তিহীনতাকে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কোন পূর্বসূরির প্রতি নয়, নিজেরই সমকালীন কবি সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনীহার কারণ ধরে নিতে পারি কিছুটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত, কিছুটা বা ব্যক্তিগত।...

সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের যে শাখাটিতে তিনি ইতিমধ্যেই আশ্রয় নিয়েছেন, তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখালেন সুধীন্দ্রনাথ অমীয় চক্রবর্তী সম্পর্কিত আলোচনা সংকলনভুক্ত করে, আর যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেই মার্কসীয় বিশ্বাসে আস্থাশীল কবিদের একেবারেই বর্জন

www.pathagar.com

করলেন তিনি। সমালোচনার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে, অতএব কোন নন্দন তত্ত্বে বিশ্বাসী তা বিচার্য নয়, রেখার উৎকর্ষই বিচার করতে হবে এই খোলামনের সাহিত্য-সমালোচকই আমাদের নমস্য।' একই প্রবন্ধে লেখক শেষে লিখেছেন- 'বুদ্ধদেবীয় সাহিত্যবিচার এমন স্থূলতায় শেষ বয়সে পৌঁছেছিল, তার অনুশীলন ও মনীষার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাশীল বর্তমান লেখকেরও ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকা চোখে না পড়ে পারেনি। আধুনিক বাংলা কবিতার শেষ সংস্করণে আপন জামাতার গুটিকয়েক পদ্য সংযোজন করলেন আর সন্তোষ কুমার ঘোষ, যিনি একটিও কবিতা লেখেননি, অন্তত ছাপা হতে দেখিনি, অনেক শক্তিমান কবির লেখাকে অশ্রদ্ধা করে নেহাত ব্যক্তিগত প্রীতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে, তারই গদ্য-পদ্য লেখাকে নির্বাচন করলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হবে, তাই বলে সাহিত্য সম্পর্কে নিশ্চিত বোধে পৌঁছেও এই ধরনের কাজ কখনও সমর্থনযোগ্য নয়।'

একজন বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব অভিরুচি, চিন্তা, চেতনা, মতাদর্শ, পছন্দ, অপছন্দ, থাকতেই পারে। এসব সম্বলকে অবলম্বন করে তিনি তার লেখায় সোচ্চার হবেন, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তার বিচারে যদি কোন লেখককে লেখক না মনে হয় অথবা 'প্রতিভাবান বালক' বলে মনে হয় তাহলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিচার করতে হবে। অপক্ষপাতমূলক আচরণ থাকতে হবে তার লেখায়। এখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ, ভিন্নমতাবলম্বী, কিংবা ভিন্ন গোত্রের কোন স্থান নেই। বুদ্ধদেবের 'প্রতিভাবান বালক' উক্তিটি আসলে দুরভিসন্ধিপ্রসূত নির্বোধ এক উক্তি, যা ব্যক্তিগত উষ্ণার ফলশ্রুতি এবং বুদ্ধদেবের এই লেখা আসলে দিক-নির্দেশনাহীন। কারণ, 'কালের পুতুল' গ্রন্থে 'নজরুল ইসলাম' শীর্ষক লেখাটি না আলোচনা না সমালোচনা শুরুতেই লেখক লিখেছেন– 'বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে- মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করেছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। ...আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোনো কবি হননি।' অন্যত্র লিখেছেন– 'বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর সবচেয়ে বড় কবিত্ব শক্তি নজরুল ইসলামের।' এউ বুদ্ধদেব বসু কবি নজরুলের স্তুতি গাইতে গাইতে সহসা আক্রমণ করে বসলেন সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক আচরণে। বুদ্ধদেব লেখা দিয়ে নজরুলকে বালক প্রমাণের অপচেষ্টা করলেন। কিন্তু নজরুলের কোন লেখা দুর্বল, কোন লেখায় কাব্যময়তা নেই, তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ আক্রমণের ঝোঁকে লিখেছেন– অনেক লেখা তিনি লিখেছেন- যাতে শুধুই হৈচৈ আছে কবিত্ব নেই।' একটি কবিতাও বুদ্ধদেব লিখে দেখাতে পারলেন না, যাতে করে নজরুলের অ-কবিত্ব পাঠক বুঝতে পারেন। আসলে বুদ্ধদেব

www.pathagar.com

বসুর এই লেখাটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বাজে লেখা, এ কথা বলতে পারি। কারণ, এই লেখাটি পড়ে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য আলোচনা সম্বন্ধে ধারণা পাল্টে যেতে থাকে। তিনি কতোটা কাব্যবোদ্ধা ছিলেন? বিশ-চল্লিশের ফারাক বুঝতে অক্ষম। অথচ কবিগুরুর অপরিণত বয়সের আক্রমণাত্মক লেখা আর পরিণত বয়সের ভুল সুধরে পুনরায় লেখা- এসবই সৎ ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতাই প্রমাণ করে। অথচ বুদ্ধদেবের এই লেখাটি বালখিল্যতায় পর্যবসিত। মাতালের পথচলার মত তিনি নজরুল সাহিত্যে হেঁটেছেন। তিনি লিখেছেন- 'শোনা যায়, নজরুলের গান সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি'- পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এতবেশি গান রচনা করেননি।' আশ্চর্য হয়ে যাই, এক সমালোচক কত কম জেনে একজন কবিকে আক্রমণ করতে পারেন, বুদ্ধদেব তার প্রমাণ। 'শোনা কথা'র তালে বুদ্ধদেবের মতন আলোচক নাচতে পারেন তাও লিখে জানিয়ে গেছেন, আশ্চর্য তার স্থূল চিন্তা!

নজরুল অসংখ্য অসংখ্য গান লিখেছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এই সত্যতার দালিলিক প্রমাণতো নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে ও তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করলেই পাওয়া যেত। ওই লেখাতেই গ্রামোফোন কোম্পানীর কথা বলছেন, তবে সংশয় রেখে। বুদ্ধদেব বসু চতুর এবং নিজ অস্তিত্বের সাথে তিনি অসৎ আচরণ করেছেন। কারণ এই বুদ্ধদেবই বলেছেন- 'কত গান সুন্দর আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর চলে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো একটা অমার্জিত শব্দ প্রয়োগে সমস্ত জিনিসটিই গেছে নষ্ট হয়ে।... গীত রচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো- শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি নিখুঁত হতো, তাহলে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। কিন্তু একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হলো।' আশ্চর্য এবং হতভম্ব হয়ে যাই নিচেই তিনি লিখেছেন- 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা সর্বহারা'র কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়েছেন সে মালা ছোট কিন্তু অক্ষয়।' যে বুদ্ধদেব প্রথমে লিখেছেন, পৃথিবীর সকল কবির চেয়ে নজরুল বেশি গান রচনা করেছেন, তিনিই লিখলেন সে মালা ছোটো। আবার লিখেছেন- রুচিহীনতার কারণে তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না, পরক্ষণেই প্রত্যয়ন করছেন তাঁর গান অক্ষয়। পাগলের প্রলাপ বকেছেন বুদ্ধদেব। নজরুলের গান সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে চা'টেবিলে তর্কবাগীশ খেতাব পাওয়া যায়, কিন্তু সাহিত্যের যে কোন শাখায় চলা যায় না।

এই বুদ্ধদেব জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার করেছেন তার মেধা দ্বারা। কিন্তু নজরুল বিষয়ে লিখতে তিনি পক্ষপাত দোষে অভিযুক্ত। হয়ত কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি এ কাজটি করেছেন। নইলে এমন খাপছাড়া লেখা তিনি কি করে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিলেন? যে লেখার শুরু স্তুতি, মাঝপথে অসাহিত্যিকসুলভ আচরণ আবার শেষ পঙ্‌ক্তিতে

www.pathagar.com

স্বীকারোক্তি শেষ দু'লাইনে লিখেছেন- 'বাংলা কবিতার ইতিহাসেও তার আসন নিঃসংশয়, কেননা তার কবিতায় আছে সেই শক্তি, যাকে দেখামাত্র কবিত্বশক্তি বলে চিনতে ভুল হয় না।' শেষ পঙ্‌ক্তি পাঠে প্রশ্ন জাগে একজন প্রতিভাবান বালক(?) কি ক'রে বাংলা কবিতার ইতিহাসে নিজেকে সংযুক্ত রাখবেন? তার কবিতা, তার পুরো সাহিত্য দেশ, কাল, ঐতিহ্য, ইতিহাস, দর্শনকে যদি লালন না করে, তাহলে সে তো মহকালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার কথা। বুদ্ধদেব বসু হয়ত বুঝতে পারেননি, এ ধরনের অন্ত:সারশূন্য লেখা তাকেও একদিন মহাকালের কাঠগড়ায় হাজির করাতে পারে। নজরুলের প্রভাব তো সে সময়ের অনেকের মাঝেই ছিল। 'বুদ্ধদেব বসু'র 'বন্দীর বন্দনা' নামটি কাজী নজরুল ইসলামের 'বন্দীর বন্দনা' থেকে নেওয়া। জীবনানন্দের প্রথম পদক্ষেপ নজরুল পদাঙ্ক ধরেই চলেছিল। মোহিত লালের 'নাদির শাহ', 'বেদুঈন', 'কালাপাহাড়' জাতীয় কবিতার উৎসে নজরুলের প্রভাব অনস্বীকার্য। ...কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব কাটাতো একটু দেরী হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ 'কালাপাহাড়' ও 'রুদ্র বোধন' [বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) শ্রী সুকুমার সেন, এপিএইচডি এফ-এম]

বুদ্ধদেব আজ যদি থাকতেন, তাহলে তিনি কি পরিণত রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে নজরুলকে নিয়ে আবারও লিখে তার ভুল শোধরাতেন? একজন কবিকে একজন সমালোচকই পর্দার আড়াল থেকে বের করে এনে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারেন সূর্যালোর মতন। কিন্তু সমালোচক যদি ভুলভাবে কবিকে হাজির করেন, তাহলে সাময়িক বাহবা কুড়ালেও একদিন তাঁকেও আঁস্তাকুড়ে পচতে হয়। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য জীবনে মাইকেল, নজরুলকে আক্রমণ করেছেন ভুলভাবে, স্থূল চিন্তায়- যা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। প্রতিনিয়ত তিনি ক্ষয় হতে থাকবেন কালের সূর্যে। আর কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যে গত একশত বছরে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি যে নামটি উচ্চারিত। নজরুল ইসলাম তার কাব্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, দর্শন আতিশয্য, যমক, অনুপ্রাস, রূপক, ইন্দ্রিয়াতীত উপমা, সমাসোক্তি প্রভৃতি বারে বারে এসেছে। ক্রমশ উত্তরণ দেখা যায় তার কবিতায়। প্রবন্ধে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে, নাটকেও চালিয়েছেন বাস্তব প্রেক্ষাপটের পটভূমিনির্ভর অসামান্য লেখা, গানে তিনি হয়েছেন কালজয়ী এক অমর গীতস্রষ্টা।

নজরুল এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান মানবের নাম, তিনি জীবন সাধক ছিলেন। জীবন-রহস্য উন্মোচনের সত্য অনুসন্ধিৎসু সাধক। পরম সত্যকে পাবার সাধনা ছিল তাঁর। যুগে যুগে বোদ্ধা পাঠক থেকে শুরু করে গণমানুষ, সকলেই নজরুলকে চিনবে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে।

www.pathagar.com

স্ব-কাল ও সকালের গায়ক আব্বাসউদ্দীন

পূর্বকথা ঃ একজন তরুণ লেখক হিসেবে পঠন-পাঠন চলে গো-গ্রাসে। সামনা-সামনি, আড়ালে যা কিছু মনে হয় পাঠ উপযোগী, গিলে ফেলি। অনেক দিন আগে দেশের বাড়িতে (বগুড়া) আব্বা একটি রেডিও কিনেছিলেন। ১৯৭৮-৭৯-এর দিকে। তখন পল্লীগীতিমূলক অনুষ্ঠান হলে লক্ষ্য করতাম, আব্বা মনোযোগ সহকারে শুনছেন। এভাবে অমর কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের সাথে পরিচিত হই। তার সুললিত কণ্ঠ শুনি। দিন যায়। কর্মক্ষেত্রে ঢাকায়। রাজধানীর সব কিছুই রাজসিক। আশ্চর্য ও বিমোহিত হয়ে এক সময় আবিষ্কার করি নিজেকে আব্বাসউদ্দীন পরিবারের সাথে। ষাট দশকের কবি আল মুজাহিদীর মাধ্যমে আমার পরিচয় ঘটে আব্বাসউদ্দীন ঘরানার উত্তর প্রজন্ম (সরকার মাহবুব, সালেম সুলেরী, সাকিব সুলেরী, কিসলু মাযহার, মহিউল আলম স্বাধীন, শাহনাজ পারভীন, জেনিসা মোমতিনা, বিন্‌তে)-এর সাথে। আব্বাসউদ্দীনের সবুজ পথ বেয়ে এদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে শিল্পর জন্য শিল্পীর হৃদয় উৎসারিত সুর। আমি এই পরিবারের সাথে মিশতে গিয়ে আব্বাসউদ্দীনের আরো গভীরে প্রবেশের দরোজা খুঁজতে থাকি। এবং এক সময়.....

আব্বাসউদ্দীন : ঐতিহ্যের সবুজ চাঁদ : ভারতের কুচবিহারে, বলরামপুর গ্রামে জাফর আলী আহমদের (উকিল) ঔরসে অমর সংগীতজ্ঞ আব্বাসউদ্দীন (১৯০১-১৯৫৯) সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী এই অমর কণ্ঠশিল্পীর সংগীত জীবন শুরুর ইতিহাস সুখের ছিলো না। তৎকালীন সময়ে অনেক ধন-সম্পদের মালিক জাফর আলী আহমেদ সাহেব পুত্র আব্বাসকে জাঁদরেল ব্যারিস্টার করবেন এই আশায় পুত্র আব্বাসকে সংগীতচর্চার সুযোগ দেননি। তবুও বাধা-নিষেধের আগলের মধ্যে থেকে আব্বাসউদ্দী

www.pathagar.com

সংগীতচর্চা করেছেন এবং মফস্বল শহরে একজন খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, ধনীর দুলাল হলেও আব্বাসউদ্দীনের কলকাতা আসার সুযোগ হতো না। একবার এক বন্ধুর বিয়েতে কলকাতা ভ্রমণের সুযোগ পান। সুরের ঢেউয়ে যে আত্মা সদা ছটফট করে, কলকাতা এসে তিনি কি চুপ থাকতে পারেন। আর তাই সংগীতের অমোঘ টানে তিনি ছুটে গেলেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে, গান Record করার জন্য। কিন্তু এবার তাকে ব্যর্থ হতে হয়। এরপর তিনি রংপুর কলেজে বিএ পড়ার সময় কলকাতায় চলে এলেন এবং কবি গোলাম মোস্তফার সাথে একটি মেসে আশ্রয় নেন। মেসে থাকা অবস্থায় শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের বিকাশ শুরু হয়। এই সময়ই গ্রামোফোন কোম্পানিতে আব্বাসউদ্দীনের কয়েকটি আধুনিক গান রেকর্ড হয়। এবং জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে যান আব্বাসউদ্দীন। নতুন দরোজা খুলে যায়। শুরু হয় নতুন আঙ্গিনায় বিচরণ।

চৈতন্যে তোলপাড় করা নান্দনিক আগুন ঃ বিশ্বাস হচ্ছে আত্মার খাদ্য। বিশ্বাস থেকে চিন্তা, আর চিন্তা থেকে কার্যের উৎপত্তি। প্রত্যেক মানবের কার্য তার বিশ্বাসের অনুরূপ হবে। দু'শ' ইংরেজ শাসনের ফলশ্রুত : দমন ও নির্যাতনে তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের আত্মগৌরব, আত্মশক্তি অবলুপ্ত হয়ে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিল। নদীর স্রোত যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার চলমান রূপ ধ্বংস হয়ে কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করে। জাতিগতভাবে মুসলমান সমাজ আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি হারিয়ে চিরকাল আশ্রয়হীনা লতার ন্যায় শোচনীয় দুর্গতিগ্রস্ত অবস্থায় কালের চরকায় দিন কাটাচ্ছিল। মুসলিম জাতির মনে পার্থির কোনো প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা প্রভুত্বনীতির প্রবাহ ছিলো না। নির্জীবতার সুরে সেসব নিঃসার হয়েছিল। ভারতবর্ষে মুসলিম বাংলার এই পটভূমিতে দেশের দিগন্তে আত্মজাগরণের, আত্মচেতনায় অদ্ভুত এক কওমী এক সুর মুষলধারা বৃষ্টির মতোন ঝরে ঝরে জাম হতে থাকলো বাঙালি মুসলমানের হৃদয় মন্দিরে। সে সুর প্রবাহিত হতে থাকলো আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠ থেকে। জাতীয় জাগরণের কবি কাজী নজরুলের লেখা গানে প্রাণের সুরে, হৃদয়ের সুরে দিল ধাক্-ধাকাইয়া গেয়ে উঠলেন আব্বাসউদ্দীন।

i. ও মোর রমজানের ঐ রোজার শেষে
   এলো খুশীর ঈদ।

ii. তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।

iii. আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি-নাহি-ভয়।

iv. আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়।

v. যাবার বেলা সালাম লহ হে পাক রমজান।

গোলাম জিঞ্জিরে আবদ্ধ মুসলমান সমাজে মুসলিম গায়ক আব্বাসউদ্দীনের পূর্বে

www.pathagar.com

মোহাম্মদ কাসেম (কে. মল্লিক) ছাড়া আর কেউ ছিলো না। এই কলঙ্কের অবসান ঘটিয়ে যুগলবন্দী ভূগোলময়, হাজির হলেন নজরুল ও আব্বাসউদ্দীন। নজরুল বেঁধেছেন গান আর আব্বাসউদ্দীন দিয়েছেন ভালোবাসাময় মধুমাখা সুর। বাঙালি মুসলমানের এই ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ এই দুই প্রতিভার আবির্ভাবে বাংলার মুসলমানের মনে নবজাগরণ এসেছিল। কারণ, তৎকালীন বাঙালি মুসলমান নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে তাদের অবস্থা হয়েছিল সংকটাপন্ন। গোঁড়ামি, ডেঁপোমী, কুসংস্কার তৎকালীন মুসলমান সমাজে এতোটাই অনুপ্রবেশ করেছিল, জীবন-যাপন ও সুস্থ বুদ্ধিবানদের জীবন হয়েছিল দুর্বিষহ। ইসলাম ধর্মের কল্যাণের নামে তারা জাতি-ধর্মের কি ক্ষতি করছিলেন, তা তারা জানতেন না। কুসংস্কারপূর্ণ সেই সমাজের নির্জীব জীবনে নজরুলের লেখা গানে আব্বাসউদ্দীনের মোহময় সুরে মুসলমান সমাজ যেন নবদিগন্তের নতুন সূর্য দেখলো। সংগীতবিরোধী সেই সময়ের মৌলবীদের রক্তচক্ষুতেও জলের ধারা নেমে আসত আব্বাসউদ্দীনের গানের আবেদনে। তৎকালীন একটি ঘটনা বেশ আলোচিত। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক গোলটেবিল বৈঠকে যাবার পূর্বে আব্বাসউদ্দীনকে একবার মিলাদের দাওয়াত করেছিলেন। মিলাদ শেষে বড় বড় পাগড়ি ও জোব্বা পরিহিত মাওলানাদের সামনে ফজলুল হক বললেন– 'আব্বাস গান গাও'। মৌলভীদের মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে ফজলুল হক সাহেব পুনরায় বললেন– 'আপনাদের যাদের আপত্তি থাকে তাঁরা যেতে পারেন, এবার হারমোনিয়াম নিয়ে আব্বাসের মিলাদ পড়া শুনব' সত্যিই তখন মৌলভী সাহেবরা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দ্বারপ্রান্তে হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আব্বাসউদ্দীন গান ধরলেন :

i. আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি-নাহি-ভয়,

ii. তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।

আব্বাসউদ্দীনের দরাজকণ্ঠের সুরময় মূর্ছনায় মৌলভী সাহেবরা বিমোহিত হয়ে পরিবর্তিত মুখে একে একে আসন গ্রহণ করেন। আব্বাসউদ্দীনের গান প্রসংগে মাওলানা আকরাম খাঁ বলেছিলেন– 'এই রস দিয়ে আমাদের নিরস সমাজকে জাগাতে হবে।

আব্বাস উদ্দীন ঃ উত্তর আধুনিক নন্দন পুরুষ ঃ দেশ, কাল, ঐতিহ্যর পথ বেয়ে আব্বাসউদ্দীন পৌঁছেছেন মহাকালের এক মহৎ দরোজায়। আধুনিক প্রাণ এই মানুষটি স্বজাত, ধর্ম, আধ্যাত্ম, দেশ-কালের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। নিজস্ব চেতনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লালন করে জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেবার এই উত্তর আধুনিক প্রবণতা, আব্বাসউদ্দীনকে পল্লী ভাওয়াইয়া ও ইসলামী সংগীতে আজ স্বতন্ত্র মহিমায় চিহ্নিত করেছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আব্বাসউদ্দীন গানের মাধ্যমে চোখের পটে ভাসিয়ে তুলতেন মুসলমানদের অনেক বীরত্বপূর্ণ করুণ কাহিনী। আর গভীরভাবে মনে রেখাপাত করে দিতেন মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যের কথা। শুধু কি সুর আর পংক্তির স্টাইলে তিনি সংগীতে প্রবাদপ্রতিম হয়েছেন? তাঁর চেয়ে বড় কথা, উপলব্ধির

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিবর্তন সাধন করেছেন সংগীতের মোহাচ্ছন্ন জাল বিস্তার করে। এ প্রসংগে কবি-প্রাবন্ধিক-দার্শনিক ফরহাদ মজহার বলেছেন– 'আব্বাস কেবল সংগীতের জন্য তার আমলে খ্যাতিমান হননি। গান গাওয়ার পারদর্শিতা, কণ্ঠ, ও উপস্থাপনের জন্য এমন অনেক গায়কের আমরা নাম করতে পারবো যাঁরা তাঁদের বিনোদন গুণের জন্যেই লোকপ্রিয় ও প্রশংসিত। কিন্তু সংগীতের সীমিত জগতের মধ্যেই তাদের গুরুত্ব, নান্দনিকতার সীমানা ছাড়িয়ে তাঁদের ভূমিকা কোনো গভীরতর সামাজিক বা রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করেনি। সেটা দোষের নয়, কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় আব্বাসের মত গায়ককে নিয়ে। তাঁর গান পরিবেশের নান্দনিক দিক তাঁর সামগ্রিক অবদানের সম্ভবত সবচেয়ে গৌণ দিক। এই গৌণতার মানে এই নয় যে, বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান গৌণ। না, মোটেও তা নয়। আব্বাস মুশকিল বাঁধান ঐখানে যে, তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য এতো গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে সংগীতের ক্ষেত্রে তার নান্দনিক অবদান ঐ ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাতে কেবলি ঝাপসা হয়ে যায়। অথচ তাঁর দরদী গলা তবুও এক অনন্য ইশারায় কানের কাছে অনবরত দোল খেতে থাকে। কিন্তু কেন দোল খায় আমরা বুঝতে পারি না।

আব্বাসকে নিয়ে এই এক অনন্য মুশকিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্যের ওজন আব্বাসের নান্দনিক অবদানের ওপর এতো ভারী যে, ওর তলা থেকে পৃথক করে নিয়ে আসা কঠিন কাজ। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে পৃথক করার দরকার কি? দরকার এ কারণে যে, এটা না হলে আব্বাসউদ্দীনের মূল্যায়ন হবে না। তিনি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক চেতনার বিবর্তনের একটা বড় পথফলক। সেই ফলকে কি আঁকা আছে তার হরফগুলো আমাদের চোখে ক্রমাগত ঝাপসা হয়ে গেলে নিজেদের অতীত আমরা ভুলব। সামনে অগ্রসর হবার পথ খুঁজে পেতেও কষ্টকর হবে।

আমরা কি বলতে চাইছি তা স্পষ্ট হবে যদি আব্বাস সম্পর্কে স্রেফ একটা কথা সবাইকে আবার মনে করে দেয়া যায়। সেটা হলো এই যে, আব্বাসউদ্দীন বাংলাভাষী মুসলমানদের গান গাইতে শিখিয়েছেন। গান গাওয়া যে হারাম কিছু নয়, এমনকি আল্লা-রাসূলের নামও হারমোনিয়ামে বাজিয়ে ও তবলায় সঙ্গত করে গাওয়া যায়, আব্বাস নজরুলকে দিয়ে গান লিখিয়ে ও গেয়ে সেটা প্রতিষ্ঠা করে ছেড়েছেন।

এ এক অসামান্য প্রগতিশীল কাজ করেছেন আব্বাস ও নজরুল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা করতে হয় সুরকার কমল দাশ গুপ্ত ও চিত্তরায়সহ আরো অনেক প্রগতিশীল সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীতপ্রেমিকদের যাঁরা গান ও সংস্কৃতির প্রতি অনীহাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত তৈরী করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু তারা নিজেরা মুসলমান ছিলেন না। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে, নজরুলের নিজের সুর করা গানগুলো বাদ দিলে জনপ্রিয় ইসলামী গানের অধিকাংশই সুর করেছেন কমল দাশ গুপ্ত ও চিত্তরায়। ইসলামী গান না গেয়ে গানের প্রতি মুসলমান

www.pathagar.com

সমাজের কাঠমোল্লা মানসিকতা ভাঙ্গা অসম্ভব ছিলো। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে মনে হয়, নজরুলের লেখা আর আব্বাসের গাওয়া ইসলামী গান ছিল কঠিন বিশুদ্ধবাদী মুসলিম মানসিকতার ওপর বৃষ্টির মতো, যারপর ওর ভেতর সংস্কৃতির অংকুর সহজে নিজের শেকড় প্রোথিত করতে পেরেছে। আব্বাসউদ্দীন মুসলিম চেতনার শেকড়ে সংগীতের যে বীজ বপন করে গেছেন কালের পরিক্রমায় আজকের মুসলিম পরিবারে তারই বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একই বাড়িতে হারমোনিয়াম, তবলার পাশে নামাজের চৌকি ও জায়নামাজ আজকাল দেখা যায়। সংগীত, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রতি গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আব্বাসউদ্দীন বুদ্ধি, মেধা ও সুরের ত্রিমোহন সংযোগে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। এখানেই আব্বাসউদ্দীনের সার্থকতা।

আব্বাসউদ্দীন : বাঙালি মুসলমানের পথিকৃত ঃ স্যার আবদুর রহিম বলেছিলেন, 'We Muslim have to fight three enemies, the Britishes on the front, the Hidus on the right and mollas on the left.' মুঘল সাম্রাজের পতন ও ইংরেজ রাজশক্তির উত্থানের পর থেকে ভক্তিবাদী ও প্রেমমূলক ইসলামের ক্ষয় শুরু হয়। ইংরেজের হাতে পরাজয়টা ভারতীয় মুসলিম সমাজ মেনে নেয়নি। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত নিজেদের হাতে গৌরব ফিরে পাবার জন্য তারা লড়েছে। এই লড়াই বিফল হলেও ১৯০৯ সালে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী মেনে নেয়। কিন্তু কংগ্রেস তা মেনে নেয়নি। অবশেষে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মহাকবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল প্রথমবারের মত উচ্চারণ করলেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। মিঃ জিন্নাহ ভারতের মুসলমানকে তার কৃষ্টি ও ধর্মে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বেঁচে থাকার জন্য সে পথের আলোকরশ্মি নিয়ে এলেন। বিশুদ্ধ মুসলমান বানাবার মানসিকতা নিয়ে মুসলমান পল্লী নির্মাণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ডাক দিলেন। নজরুল ও আব্বাস ইসলামী গান নিয়ে ঘুমন্ত মুসলিম জীবনে জাগালেন নবজাগরণের সাড়া। নিজ সম্প্রদায়ের ব্যথা ও উত্থানের আকুতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা তারা সমীচীন মনে করেননি। আব্বাসউদ্দীন গাইলেন ঃ

i. বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান।

ii. দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে দ্বীন ইসলামি লাল মশাল।

iii. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।

iv. খয়বর জয়ী আলী হায়দার জাগো জাগো আরবার।

এই একটা দিক নিয়ে বিচার করলেই আব্বাসউদ্দীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের ভার টের পাওয়া যায়। আব্বাসউদ্দীন আমাদের গান গাইতে শিখিয়েছেন এক ঐতিহাসিক সত্য নির্মাণের প্রাথমিক স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে। যদিও তিনি ছিলেন লোক সঙ্গীতের সম্রাট। লোকসঙ্গীতের চাইতে ইসলামী সংগীত প্রাসংগিক কারণে আলোচনা জরুরি।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমান সমাজ পাকিস্তান সৃষ্টি করে প্রাথমিকভাবে এক বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতায় নিজেকে আবিষ্কার করে। আর্থিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যে বৈষম্য দেখা দেয়, রাজনৈতিক মোকাবিলায় এ অঞ্চল খুব একটা কামিয়াবী অর্জন করতে পারেনি। আব্বাসউদ্দীনের মৌলিক কৃতিত্ব দিয়ে ঐশ্বর্যের নতুন জগতে এদেশে সুর করলেন প্রবাহিত। ফলে নাগরিক ও গ্রামীণ মানুষের দেশজ ঐতিহ্যে এক নতুন সেতুবন্ধন ঘটালেন। এতোকাল যে শিল্পী বাণী বিন্যাস ও পরিচর্যার বৈদগ্ধে গানের আবেগকে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কালের দাবীতে স্ব-জাতের ভূমিতে তিনি হয়ে উঠলেন অসামান্য জনপ্রিয়। জনপ্রিয় শিল্পী আব্বাসউদ্দীন যে আশ্বাসে বিশ্বাস করে পাকিস্তানে নবো উদ্যোমে সংগীত স্কুল গড়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, কালের দুঃখময় স্মৃতি, তিনি ব্যর্থ হন। আব্বাসউদ্দীন নিজের কণ্ঠেই বলেন– 'একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আধুনিক মুসলমান গায়কদের মধ্যে ইসলামী গান গাওয়ার রেওয়াজটা উঠে গেছে। যে ইসলামী গানের রসধারা পান করে ঘরে ঘরে বাংলার মুসলমান সংগীতমনা হয়ে উঠেছে, এই ক'বছরে শিল্পীরা সেই ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ইসলামী গানকে একেবারে বর্জন করে বসবে, এটা ভাবতেও দুঃখ হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যে কোনো গানের আসরে গায়ক-গায়িকা মাত্রই কোনো একখানা আধুনিক গানের পরেই গেয়ে উঠেছেন একখানা ভজন। আর আমাদের এখানকার শিল্পীরা ইসলামী গান গাওয়াটা যেন হীনম্মন্যতা মনে করে গান না। মেয়ে শিল্পীও বহু এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করছি তাঁরা পল্লীসংগীত বা ইসলামী গানের অনুরক্ত নন। আমাদের পল্লীসংগীতে অফুরন্ত প্রাণসম্পদ রয়েছে, এদিকে একটু মনঃসংযোগ দিলে এ সংগীতের ধারাকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করে তোলা যায় এবং জগৎ সভায় একে চিরকাল শ্রেষ্ঠত্বের সুউচ্চ শিখরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। আমাদের তরুণ শিল্পীরা এদিকে অবহিত হোন, এই আমার কামনা ও প্রার্থনা'। [আমার শিল্পী জীবনের কথা : পৃষ্ঠা-১০০]

আমাদের দেশে আজ একটি বিষয় রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে যে, যদি কোনো কিছুর মাঝে ইসলাম আছে এমনটি প্রকাশমান হয়ে পড়ে তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল/সাম্প্রদায়িক/ মৌলবাদী এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের বাহুল্যতা দেখা যায়। যেহেতু আব্বাসউদ্দীন পল্লী সংগীতের পাশাপাশি ইসলামী সংগীত গেয়ে এ অঞ্চলে কিংবদন্তী হয়েছেন, তাই একশ্রেণী ঐতিহাসিক সত্যের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়। আব্বাসউদ্দীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূগোলের সীমানার কূল-কিনারা করতে না পেরে তথাকথিত প্রগতিশীল সিল দেয়া একদল ইতিহাস অজ্ঞ ভ্রান্তির মাঝে বসবাস করছে। আজ বাংলা গানকে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে নতুন দিক-নির্দেশনা দিতে চাইলে আব্বাসউদ্দীনের ভান্ডারে আমাদের যেতেই হবে। কারণ, আব্বাসউদ্দীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বাংলা গানের

www.pathagar.com

রাজ্যে অনুপ্রবেশ কিংবা ইতিহাস রচনা অলীক স্বপ্নের নামান্তর। আব্বাসউদ্দীনের সংগীতের স্বাদ ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে গ্রোথিত হয়ে আছে, আগামীদিনের অনুপ্রেরণা হয়ে।

তথ্যসূত্র :

i. সময় কথা বলে : বেগম লুৎফুন্নেসা আব্বাস।

ii. আমার শিল্পী জীবনের কথা : আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ।

iii. আব্বাসউদ্দীন : আল মাহমুদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান সৈয়দ : বাংলা কবিতার আধুনিক কৃষক

প্রাক্‌কথন : কবিতা কবির ব্যক্তিগত অবদমনের চিত্রকল্প। কবিতা কোন ব্যস্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেলসম্যানের দৈনন্দিন তৎপরতার গল্প না। একটু চিন্তা-আত্মরতির সুযোগ। মানুষ তাঁর প্রাণিত্বটুকুই কবিতার ফর্মালিনে ডুবিয়ে রাখে সভ্যতার প্রয়োজনে। যেনবা একটি অ্যালার্মযুক্ত ঘড়ি- ভোরের প্রথম ফ্লাইট ধরিয়ে দেবার মতো যে আমাকে জাগিয়ে রাখে। কবিতার একটি সাদা সততা আছে। সততা একটি দিকের মত বিপরীতসহ। সভ্যতার শিশু বয়সের একটি সরল যোগ অঙ্ক ট্রেসিং কাগজে যার বহিরাবরণের চিত্র আঁকা যায়। অকবি কবিতার বহিরাবরণের চিত্র আঁকে নকল নবিসের মতো আর ধোঁকা দেয় সাধারণ আত্মভোলা পাঠককে শব্দের জটিল জ্যামিতিতে। কিন্তু স্বভাব কবি মৌলিকত্বের অনুসন্ধানে বিভোর যাত্রী। তার পকেট ভর্তি ইতিহাসের বাদাম, আঙুলের ফাঁকে দর্শনের প্রজ্বলিত মোমবাতি, হৃদয়ে অনাগত সৃষ্টির একতারা। কে এমন আছেন আমাদের বাংলা সাহিত্যে, যিনি ইউরো স্রোতে ভিজে আমাদের চিনিয়ে দিলেন বাংলা কবিতার নতুন রাজপথে। তাকে কিভাবে পরিচিত করানো যায়? আজকের তরুণ তাকে শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেবে? আগামীকালের সূর্য? নাকি সন্ধ্যার প্রথম চাঁদ? অনেকগুলো, অনেক রকমের সৃষ্টিশীল লেখক একসংগে মাত্র একজনের মধ্য জন্ম নিলে যে ব্যাপারটি দাঁড়ায় সেটিই আবদুল মান্নান সৈয়দ। বোধে, অনুভবে এবং পরঙ্গমতায় তিনি মনেপ্রাণে সৎ ও শুদ্ধ। এ কারণেই জটিল আর অনিশ্চিত পথপরিক্রমায় যতদূর পথ পাড়ি দিয়েছেন ততদূরই ফলবান এবং সমৃদ্ধ তিনি। এই কষ্টকর আর চিন্তাময় পথ সৃষ্টিতে তার শান্তিময়তা আর দৃঢ় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দ্যায় এই দুঃখভরা দেশে সাহিত্যকর্মীদের সাহিত্যচর্চা দুঃখচর্চারই নামান্তর। তারই মধ্য আবদুল

www.pathagar.com

মান্নান সৈয়দ বিদেশী ঢেউ আমাদের উর্বর সবুজে প্রবাহিত করলেন সম্পূর্ণ নতুন চিন্তায়। কবির বিশাল রচনাবলীর দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। সৃজনশীলতা যে মগ্নচৈতন্যেরই ধারক, আবদুল মান্নান সৈয়দের কর্ষিত ভূমি তাঁর সফল উদাহরণ। বৈচিত্র্যময়তা এবং ভিন্ন পথযাত্রা তাঁর মজ্জারক্ত উন্মাতাল করেছিল বলেই তিনি এরকম বলতে কুণ্ঠিত হন না– 'অনুভবহীন পুরোনোর অনুকরণ' মঙ্গলকাব্যের শতাব্দীব্যাপী রক্তহীন, কাব্যহীন চক্রবর্তী গ্রথিত বুঝি আমাদের মজ্জারক্তে পশ্চিমে যেখানে নবনব আন্দোলনের পূন্য পৃষ্ঠদেশে সাহিত্যের রাজপুত্রের দল অবিশ্রাম কম্পমান, অগ্রসরমান, আমাদের প্রতিষ্ঠিত্বের দল গড্ডলের সেবাব্রত ও সময়ের উল্টো পথে নিখিল থেকে বিচ্ছিন্ন (কথাসাহিত্য প্রাসঙ্গিকঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ)। এরকম অভিযোগ সর্বগ্রাসী ছিল এই জন্য যে, তিনি 'সাহিত্যে সর্বজন ব্যবহারযোগ্য প্রস্তাবের অসারতা' সম্বন্ধে সম্যক সচেতন ছিলেন আর তার ফলেই কবিতাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রবল পরাক্রম পদপাত এবং নতুনত্ব সন্ধানী, চাই নতুন প্রকাশরীতি, অগোচর মনোবিন্যাসের উন্মোচন সর্বপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর মনোভূমিই মৌল অংশীদার সাহিত্যের সব শাখায় দাপটের সাথে বিচরণ করলেও সব ছাপিয়ে যে চিত্রটি প্রতিভাসিত হয় সেটি তাঁর কবিতা বিশ্বাস তাঁর কবিতার সৌন্দর্য এতোটাই স্পর্শকাতর, পাঠক পাঠ করা মাত্রই প্রবেশ করেন নিজ জগত সংসার ত্যাগ করে মান্নান সৈয়দের নির্মিত নতুন জগতে। যে জগত দিনের চেয়ে রাতকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ঈশ্বর, শয়তান পরস্পর মল্লযুদ্ধে আবর্তিত হয়। যৌন জ্বালায় অস্থির কবিসত্তা। বাস্তবতা থেকে একটানে উঠিয়ে নিয়ে পরাবাস্তব জগতে পাঠককে হাজির করে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয় মান্নান সৈয়দের কাব্যস্বর্গ। এর পেছনে কাজ করে চিত্ররচনার ক্ষমতা। ভাষার বলিষ্ঠতা ও গতিময়তা তাঁর দুর্বোধ্য ভাবনাকে সুখপাঠ্য করে দেয়। তিনি পাঠক মন জয় করে নেন মান্নানীয় স্টাইলে। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' দ্রোহের সামনে নতুন আণবিক শক্তি রূপে হাজির হয় মাটির কলস, আর পিতলের তৈজসপত্রের মাঝে কাঁসার থালাবাসন নিয়ে গঠিত হয় হাজার বছরের বাংলা কবিতাকে প্রবল ঝাঁকুনি দেয়। কেঁপে ওঠে এর ভীত। অস্থির নয় সুস্থির হয়ে কবিতার তুমুল বিলোড়িত ধ্রুপদী আয়োজনকে করলেন দিগন্ত প্রসারিত।

অন্ধকারের গুহা এবং দৃশ্য পরবর্তীঃ 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের' মধ্যই আবদুল মান্নান সৈয়দ পাঠকের হৃদয়ে প্রথম ধাক্-ধাকাইয়া প্রশ্ন ছোড়েন। এবং তাঁর সমস্ত চিত্তভাব, প্রতীতি ও প্রাবল্য ফুটে তোলেন কবিতার পংক্তিতে। প্রথম ধাক্কাতেই পাঠক এ পথে হোঁচট খায়। দ্বিতীয়, তৃতীয়বার চলার পথে পাঠক আস্তে আস্তে বোধের এন্টেনায় ধারণ করতে সক্ষম হবেন মান্নান সৈয়দের চেতনার ঢেউ।

'হ'তে পারতাম যদি তোমার হাতের কররেখা, তোমার পিঠের সেই তিলখানি,/ গ্রীবার বঙ্কিম ভাঁজ, তাহ'লে কি এড়াতে পারতে, শম্পা?/ তোমার চোখের হ্রদে চুরি ক'রে চলে

www.pathagar.com

যাবো রাঁজহাস, তোমাদের বাড়ির সুমুখে ফুটপাতে ঝরবো মুহূর্তে, তোমার বুকের চাঁদ দেখে মেঘের ভিতর দিয়ে বজ্র চ'লে যাবো– ক'রে দাও মিল্টনের মতো অন্ধ, বেটোফেনের মতন বধির।' (বেগানা সেরেনাদ-২)

উপরে কবিতা পড়লে মনে হতে পারে কবিতাটি অপরিমার্জিত। কবির স্বপ্নকল্পনার নিজস্বতা যেন জোর করে পাঠককে গিলাতে চাইছেন। কিন্তু এসব তথ্য সত্যি নয়। কারণ কবি নিজস্ব ভাষায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন– 'আমি ছিলাম ছোটবেলা থেকেই দুঃস্বপ্নগ্রস্ত, দুঃস্বপ্নের সন্তানও বটে। আমার প্রথম দিককার কবিতায় জীবনের এই দুঃস্বপ্নের ছায়াই বিস্তারিত।' (আমার কবিতা ঃ আমার বিশ্বাস)

কবি প্রথম থেকেই দুঃস্বপ্ন আর কল্পনাবিলাসী, বাস্তবের চাইতে পরাবাস্তবকে চেতনার স্রোতে আবর্তিত করেছেন তাই কবির কবিতা অজাগতিক, রহস্যময় অন্ধকারগুহায় সর্বদা 'জন্মান্ধগুচ্ছ' বিচরণ করে। পাঠককে কবির কবিতার মর্মোদ্ধার করতে হবে অন্ধকার গুহ থেকে বের করে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় বসিয়ে। কারণ, পল্লবের পর পল্লব ঘেরা সংবরণ ভেদ করে চলে যায় তাঁর প্রতিভা। কবিতো সময়ের মানুষ। তাই লিখে যান– 'ঈশ্বর নামক গৃহপালিত মিস্তিরি ভুল সিঁড়ি বানাচ্ছে আমাদের উঠানে বসে– আগুনের যে অসম্ভবের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আমরা সাবই পাতালে নেবে যাবো হঠাৎ।' (পাগোল এই রাত্রিরা)

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে' আস্তিক্য আর নাস্তিক্য দুটোই সমভাবে প্রকাশমান। 'খটখটে মাটির ভিতর উনিশ বছর আমি ছিপ ফেলে বসে আছি আত্মার সন্ধানে।' (পাগল এই রাত্রিরা)। এই পংক্তিতে মরমী শিল্পীদের ভাববাদী সংগীতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আবার কবি যখন লিখেন– 'আমার এক হাত ধ'রে টান দিয়েছেন শয়তান, আর এক হাত ঈশ্বর -কী উল্লাসে আমাকে নিয়ে! আমি, ঐ দুজনের ভোজ, মাঝখান থেকে আমার দু'হাত দু-দিকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো, থামছে না, স্বগতের মতো উল্টোদিকে হাত দুটো চলে যাচ্ছে সম্পূর্ণ' (পাগল এই রাত্রিরা)। এই পংক্তিগুলোর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়। একদিকে শয়তানের আমন্ত্রণ, অন্যদিকে ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা। মাঝখানে বিব্রত দিশেহারা কবি। উভয়েরই শিকার তিনি। নিয়তির হাতে নিপীড়িত মানুষ যেমন অসহায় কবির অবস্থাও তেমনি।

মজার ব্যাপার, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতাগুচ্ছে ঘটনার ঘনঘটা প্রায় কিছুই মাটির সমতলে ঘটে না। সব কিছুই ঘটে আকাশে, জ্যোৎস্নার ভেতর, কুয়াশার ভেতর, শয়তান মারফত, ঈশ্বর মারফত। এমনকি শহরের প্রাত্যহিকতার দৃশ্যাবলী, খদ্দের, দোকানদার, বেশ্যা, প্রিয়তমা ও পুলিশকে কবি হওয়ায় ভাসিয়ে দেন নীল বেলুনে ভরে। পরাবাস্তবতার দুঃস্বপ্ন ফ্রয়েডিয় মনোবিকলনের আক্ষেপে ফাটতে থাকে, শিমুল তুলার কোষের মত। জ্যোৎস্নামহিত রাত্রি এক ফেরেববাজ ফেরেশতা অথবা জটিল জাদুকরের

www.pathagar.com

মতো সব কিছু চেনাকে করতে থাকে অচেনায়। 'জ্যোৎস্না ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, সব দরজায় আমার চারদিকে যতোগুলি দরোজা আছে সময়ের নীলিমার পাতালের; জ্বলছে গাছ সকল সবুজ মশাল। বাস একটি নক্ষত্র, পুলিশ একটি নক্ষত্র, দোকান একটি নক্ষত্র; আর সমস্তের উপর বরফ পড়ছে।' (অশোক-কানন)

চরের মাঝির সোনার ঘরা ও রক্তিম তরমুজঃ জীবনের প্রত্যহিকতায় প্রয়োজন আছে শিল্পের, কবিতার। আমাদের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতম বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে শিল্প। আর কবি হন সে শিল্পের চিন্তাদাতা। কবির চারপাশ ভিড় করে থাকে কল্পনা আর স্বপ্নের জগত। স্বভাব কবির জীবন্ত ছবি হল নারী প্রতীক। নারী, রূপ, শৈল্পিক গড়ন কবিকে নিত্য আহ্বান কর ভোগের দিকে, তৃষ্ণার দিকে। এ এক নিরন্তন আকর্ষণ। আর কবিকে সেই ভোগ, তৃষ্ণা জীবন সম্পর্কে করে সচেতন, আগ্রহী, উদগ্রীব। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় নগ্নতা, যৌনতা আসে সকালের কুয়াশার ডানায় চেপে। সূর্য যতই তাপ ছড়াতে থাকে মান্নান সৈয়দের কবিতার নগ্নতা ততই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অসীম শক্তিধর উপমার শস্যক্ষেত্র মান্নান সৈয়দ তাঁর কলমের ডগায় ধারণ করে ফসলের সমস্ত মৌসুমকে প্রভাবিত করেন। কুয়াশার মেঘ কেটে গেলেই চোখের সামনে প্রকাশমান রূঢ়, তীক্ষ্ণ, নগ্নতার আধুনিক আয়না;

i. 'চর তুমি

সবুজ রক্তিম তরমুজের মতো তোমার হৃদয়

কালো জলে সোনার ঘড়ার মতো তোমার নিতম্ব

সবুজ পাতা- ঢাকা হলুদ- তরুণ ফুলকপির মত তোমার স্তনযুগ

সূর্যের দীঘল সাত-আঙুলের অপেক্ষায়

জোয়ার এলে

আমি প্রবেশ করি তোমার চরশরীরে এলোমেলো

রঙিন সায়ার নিচে দুঃসাহসী হাতের মতো।'

(তুমি ৬)

ii. 'রক্তে আবার অগ্নি জ্বলেছে, বেজেছে ঘোড়ার চিঁহি

সাত-সাগরের তরঙ্গ-ডাকে দুয়ার ভেঙেছে গৃহী।

সবচেয়ে বড় বিস্ময় আনে শিশ্নের উচ্ছ্রিতি

www.pathagar.com

তোলপাড় আর আকুল করেছে শরীরের সামগীতি।

শুধু জেগে আছে মানুষ-মানুষী, স্নায়ুর ঝনন-রনন

ওগো বাহুবন্ধন!

কাকাতুয়া আর টিয়ে পাখিদের কেবলই স্বনন-ক্বনন

ওগো উরুবন্ধন'

(বাহুবন্ধন উরুবন্ধন)

iii. ''স্তন' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র যেন

নারীর যৌবন শব্দ করে।

'নিতম্ব' শব্দটি যেন সোনার কলসির মতো ঠিক

নারীর পিছন তুলে ধরে।'

(শব্দ)

খবীর শুদ্ধতম বিশ্বাস, কবিতা ঃ আত্মউচ্চারণের মধ্যদিয়ে কবির হৃদয়ে তল্লাশি চালালে কবির অপরিমেয় শিল্প চৈতন্যের ঋদ্ধ স্বপ্ন প্রকল্পনার সংবেদী স্রষ্টার মরমী অস্তিত্ব পাওয়া যায়। 'কবিতা লেখার জন্য নিজের গভীর বিবরে ঢুকে যাওয়া চাই, সেখানে সমাজ নেই, ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই, সেখানে আছে এক অপার অনন্ত আমি। সেখানকার সমুদ্রের নাম আমি, আর যে একখানি দ্বীপ আছে, তার নামও আমি, আর সেই দ্বীপে যে একখানি কাগজের নৌকা বাঁধা আছে, তার নামও আমি।' (কবিতা, করতলে মহাদেশ, আবদুল মান্নান সৈয়দ) এ ধরনের সৎ উচ্চারণ মান্নান সৈয়দের কবিতার অন্তবিষয়, বর্হিবিষয় ও সামগ্রিকতাকে বুঝতে সাহায্য করে। একথা অবলীলায় বলা যায় মান্নান সৈয়দের মধ্য এক নিরীক্ষাপ্রেমী, সত্যান্বেষী, প্রাকৃতিক মনন, অভীপ্সা ক্রিয়াশীল। ফলশ্রুতিতে, স্থিরতায় তিনি অভিনিবেশী হয়েও অস্থির, পর্যায়ক্রমে অগ্রযাত্রার সড়ক অতিক্রমণে নিদ্রাহীন সীমান্ত জোয়ান, শব্দের উৎস সন্ধানে চৌকশ এক ডুবুরী। তাঁর শিল্প চেতনা বিশুদ্ধতায়, অপাপে, সুন্দরতায়, পবিত্রতায় সমাকীর্ণ।

সত্যানুসন্ধানে তিনি পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান। তিনি প্রকৃতই শব্দের তীব্র পরিগ্রহণ ক্ষমতার অন্বেষায়, চিত্রকল্প ও উপমা উৎপ্রেক্ষার নব-নির্মাণের মহিমা অর্জনে ব্যয়িত করেছেন পরিশ্রমী ঘাম, কুণ্ঠাহীন মেধা, চতুরতা, রুচি ও শিল্পবোধ। আসলে, শব্দের প্রতি মুগ্ধবিস্ময় থেকেই কাব্যকলার উৎসার; চিৎপ্রকর্ষতা কবিতার পরবর্তী বিবেচনা। মান্নান সৈয়দের কবিতায় শরীরী আধুনিকতাকেই বহন করেননি, কবিতার আত্মাকেও অমোঘ, জটিল ও বৈদগ্ধ্যে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন।

www.pathagar.com

i. মান্নান সৈয়দের পরিশ্রমী ফসল ঃ শবে বরাত

আঁধারপিয়াসী আমি, রাত্রিমুগ্ধ, ছেলেবেলা থেকে
দিবসের মধ্যে আমি আঁধার খুঁজেছি দীর্ঘদিন,
করেছি আঁধারকেই প্রদীপের শিখায় উড্ডীন,
ধৃতিমান। অমাবস্যা প্রতিম আবেগে
আজ আমি খুঁজে চলি ক্ষীণরেখা ঈদের চাঁদের
মানসেরই মগ্নলোকে, জমিনে যে বিচ্ছুরণ ঠেকে
তারই বাদশাহী চাই, প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষ থেকে
ছায়া চাই, স্বপ্ন চাই ফুলন্ত ফলন্ত আশ্বাসের আস্বাদের।

ii. মান্নান সৈয়দের মেধার পরিচয় ঃ 'অচেনা মাছ'

তোমাদের শহরে এসেছি একটি অচেনা মাছ
দেবদারু গাছের সবুজ ছায়া-পড়া স্বপ্নাভ-নীল জলের ভিতর দিয়ে
পাখির সীবন-করা রৌদ্র-বাতাসে-হেমন্তে-সোনায়-বানানো চাঁদরের ভিতর দিয়ে।
রামধনু দিয়ে তৈরি ব্রিজের তলা দিয়ে
আরো ছোট শহরের পাথর-আর-মৃত্যু-বাঁধানো করিডোরের মধ্য দিয়ে
বাংলার পাড়াগাঁর শ্যাওলা-রঙ হৃদয়ের মধ্য দিয়ে
এসেছি সোনার টুকরোর মতো চক্‌চকে মাছ তোমার রূপালিস্রোতে
ভুলে-যাওয়া কোনো নগরের হারানো চারির মত তোমার বিদেশি জলে
মনে ভাবছি কোথায় আমার প্রধান দরোজা
সময়ে হারিয়ে যাওয়া প্রধান দরোজা
লুপ্ত শহরের প্রধান দরোজা।

iii. মান্নান সৈয়দের বিশ্বাস ঃ 'আম্মা'

আম্মা শব্দে মাটি ফুড়ে জেদে ওঠে ঘাস।
আম্মা শব্দে ভ'রে ওঠে অফুরান নক্ষত্রে আকাশ।

www.pathagar.com

আম্মা শব্দে দিবালোক পাতাল অবধি চলে যায়।

আম্মা শব্দে অন্ধরাত্রি জ্বলে ওঠে আরেক আভায়

আম্মা শব্দে নিভে যায় হাবিয়া দোজখ

আম্মা শব্দে বেহেশত থেকে

মর্ত্যে নামে অমল আলোক।

iv. মান্নান সৈয়দের রুচি ঃ 'চাঁদে পাওয়া'

চাঁদ তুমি কি একটা অথই পাড়াগাঁর মেয়ে ঃ দুঃখ-শোকে কুঁজো হয়ে যাওনি, করুন তবু লাবণ্যময়ী, যাকে ভালোবাসে বেঁচে থাকো আমরা সব স্রস্ত ও কামপাণ্ডুর যুবার দল?

v. মান্নান সৈয়দের উপমায় মান্নান সুলভ ঢঙ ঃ 'মাছ'

মাছ তুমি হারুনার রশিদ, নিশিপোশাকে বেরিয়ে

ঘুরেছো, শহরময়-প্রসাদে ও কুঁড়ে ঘরে।

দেখেছো শূন্য জুড়ে তারাদের চাকা ঘুরে যায়

মাছ তুমি চলেছো কোথায়?

অন্ধকারের নিঃসঙ্গ বংশীবাদক ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ নৈশ প্রেমিক। নিঃসঙ্গতা তাঁকে প্রথম জীবনে শুনিয়েছে বাউল সঙ্গীত ও মাঝরাতের রাখাল বাঁশির মায়াময় সুর। তাইতো পরবর্তীতে তাঁর লেখার মধ্য দিনের আলোর চেয়ে রাত্রের জ্যোৎস্না ও কুয়াশাই মহামহিমভাবে লক্ষণীয়। দিনের আলো কবির কল্পনায় বৈরিতা সৃষ্টি করে, তজ্জন্য রাত্রির রহস্যময়তা, বহুরুপিনী কবিকে উৎস মূলে পৌঁছে দেয়, মান্নান সৈয়দ যে রাত্রি নিবিষ্ট হবেন তা যেনো জানা কথা, কেননা পূর্বাপর তাঁর যাত্রা পরোক্ষ দিনের আলোর এবং বৌদ্ধিকতার। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের অনেক পংক্তিই রাত্রিনাম্নী ও রাত্রিবোধক। কারণ আবদুল মান্নান সৈয়দ বরাবরই আত্ম-মর্মরিত কবি। তাঁর স্বশিল্পসত্তায় যে সমকালীন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ডানাঅলা বস্তুপুঞ্জ, নির্বস্তুক বিস্ময়বোধ ও অতৃপ্তি, বিষাদ ও বৈকল্য কিংবা বলা যেতে পারে, দ্রুত পরিবর্তনকামী প্রকরণ-প্রক্রিয়া তাঁর কবিতা ভুবনে উপজীব্য সতত সঞ্চারণশীল অবিচল বিশ্বাসবোধই তাঁকে করে তুলেছে রাত্রির বিস্ময়কর জগতে পরীক্ষাপ্রিয় এক স্বতোৎসারিত কবি ব্যক্তিত্ব।

'এই রাত্রিরা বেথেল্ হাম্‌কে ব্রথেল-এ পরিণত করে, করুণ কবাটের মতো ঝোলানো বাড়ির দেয়াল থেকে লুটিয়ে থাকে যেন বর্ম কিংবা বিরুদ্ধ পদ্ধতি হাওয়ার-রূপালি চাবির

www.pathagar.com

অভাবে। এই রাত্রিরা সেই লাল আলোর ভালো যা তোমাকে প্রশস্ত স্ট্রিট থেকে নিয়ে যাবে কঙ্কালের সরু-সরু পথে, অনাব্য স্ত্রীর মতো কেবলি অন্যদিকে।' (পাগল এই রাত্রিরা)

পাগল এই রাত্রিরা কবিতায় নরকের পাতাল ভ্রমণের তাগিদে ঈশ্বর তৈরি করেছেন সিঁড়ি, যা আগুনের ওপর নির্মিত। এ দৃশ্য কবির আত্মায় প্রবেশমাত্র আত্মার প্রদেশ থেকে একে একে অতৃপ্ত যৌন বাসনা, ধর্ষকাম, উল্লাস ও ক্রন্দন সামরিক কায়দায় মার্চ পাস্ট করে বেরিয়ে এসে ভয়াল সুন্দর ক্লাসিক নৃত্য শুরু করে দেয়। কবির ক্রন্দন ঢেউ জোয়ার বইয়ে দেয় ঃ 'আমার একটিমাত্র কান্নার ফোঁটার উপর বিরাট একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, নোঙর নেমে গেছে মাটি ভেদ করে পাতালের দিকে, মাল্লারা দড়িদড়া ছুঁড়ে দিচ্ছে চারদিক থেকে, যে মমতার দড়ি আমাকে ফেলছে বেঁধে; আমার প্রণয়িনীরা পরপারে ইজিচেয়ারে ব'সে আলো ফেলছে মুখ দিয়ে একটিমাত্র হাতে ভীষণ-সুন্দর তালি দিচ্ছে, আমাকে ঘিরে ঘিরে নাচছেন সাত-আটজন তিনকোণা-চারকোণা-পাঁচকোণা আয়না। (পাগল এই রাত্রিরা)।

খণ্ডিত বিচারের দাঁতালো আক্রমণ ঃ অনেকেই পুরো মান্নান সৈয়দকে না জেনে খণ্ডিত মান্নানকে আক্রমণ করে, দাঁতালো আক্রমণ। মনে রাখতে হবে, তাঁর কবিতা নিয়ে দাঁত কড়মড়ানির পূর্বে বিশ্বসাহিত্য ও ষাটদশকের দ্রোহের আগুনে পুড়ে যাওয়া তামাটে শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে। তবেই চৈত্রের দুপুরে ছায়া ও কবিতা অনুধাবন করা সম্ভব। কারণ মান্নান সৈয়দের বিষয় নিষ্ঠা থেকে মনের খোলা বাতাসে নির্মল আধুনিক চর্বিত চর্বণকে সযতনে এড়িয়ে যখনই Text গ্রহণ করতে যাওয়া হয়, পাওয়া যায় গুচ্ছ গুচ্ছ আধুনিক শব্দ বিন্যাসের মুগ্ধ বেহেশ্‌ত, 'চন্দ্রমল্লিকার অগ্নি কেটে দিচ্ছে রাতের বাতাস, ধ্যানের ঢেউ-এ চ'ড়ে এলো জাহাজের মত বড়ো হাঁস, তারই নাম বস্তুগ্রাস'

ব'লে শবে বরাতের স্থির মোমবাতিগুলি চ'লে গেলো লক্ষ বছরের পথ সারে সারে অন্তর্গত রক্তপাতে তৃপ্তিহীন নীলকান্ত প্রশ্ন জ্বেলে ঃ কোনোদিন পাবো কি তোমারে? কোনোদিনই পাবো না তোমারে? হ'তে পারতাম যদি তোমার হাতের করেরেখা, তোমার পিঠের সেই তিলখানি, গ্রীবার বঙ্কিম ভাঁজ, তাহলে কি এড়াতে পারতে, শম্পা? (বেগানা সেরেনাদ-২)

কবির এই সকল কবিতায় শুধু সুররিয়ালিজমের চিত্র অনুভূত হয় না, আধুনিক কবিতার প্রায় সব কুলক্ষণের শরীরে ব্যাপ্ত। তাই 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' নিয়ে আজ যাদের চিৎকার-মানি না, তাঁদের বুঝতে হবে, যুগের ক্ষয়চিত্র, হতাশা নেতিবোধ, মৃত্যুচিন্তা, যৌনতা, পচন, বিকার-উপমা ও চিত্রকল্পের প্রাচুর্যে শব্দানুষঙ্গে এক বিরাট দ্যোতনা এবং কবির স্বপ্নজগতে তাঁর বিস্ময় ও উত্তেজনা এক সুদূর, সৌন্দর্যের বাগানে নিয়ে যায়। এবং কবির ঐ সকল কবিতাগুলোই মৌল আধুনিক কবিতা হিসেবে বিবেচ্য। তাই আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

সৈয়দের ইতিহাস, বরাবর ঘড়ির কাঁটাকে উল্টে দেওয়ার ইতিহাস, চারিদিকে ঘের তুলে অবাধ সাঁতারের অনুমোদনের ইতিহাস। আন্তরিক নৈকট্যে তাঁর কাব্যকে জানার চেষ্টা হচ্ছে কম। গভীরে গিয়ে কবিতাকে স্পর্শ করবার সাহস হয়নি কারো। আর তাই নোংরা রাজনীতির রঙিন গেলাসে পান করছে তরমুজের রস। তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথাই বলা যায়, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে (কাব্য সংস্কৃতি), আমাদের ষাটের ইতিহাসের মানসে আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রবলভাবে, বিস্তৃতভাবে আধুনিকতার মৌলিক প্রতিনিধি।

'প্রতীক''উপমা'র আধুনিক কৃষক ঃ 'ঘোড়া', 'মাছ' মান্নান সৈয়দের প্রিয় প্রতীক। তাঁর ঘোড়াও জীবনানন্দ বাবুর ঘোড়াগুলোর মতোই রাত্রীচারী, প্রবল ও রহস্যময়। ভিজে মাঠে, লেনে-বাইলেনে, সমুদ্রের মত অন্ধস্ট্রিট; গনগনে জানোয়ার যেন তারা সীমাবদ্ধতাকে লংঘন করে বর্তমান থেকে উড়ে যায় স্বপ্নের ঘোড়া, প্রাবল্য ও নতুনতার ভেতর। 'ও চৈত্র ও ডানাঅলা ঘোড়া' কবিতাটি শেলীর 'ওয়েস্ট উইন্ড'কে মনে পড়ায়। পশ্চিমী বায়ুর স্থান নিয়েছে ডানাঅলা ঘোড়া এবং চৈত্রের প্রাবল্য উদ্যামতাকে শেলীর মতোই স্পন্দমান আশাবাদিতায় আহ্বান করেন মান্নান সৈয়দ ঃ

'ও ডানাঅলা ঘোড়া

আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও তোমার পিঠে এক নক্ষত্রের মতো

ছেঁড়া এই বর্তমান থেকে রাজকুমারীর মতো।'

আর এক 'কালো ঘোড়া লাগাম রেকাবহীন ঘোড়া' কবির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি প্রশ্নচিহ্নিত করে চলে যায়- 'যাঁর নিচে সংখ্যাহীন যাত্রা ছিলো অপেক্ষায়।' একুশের চেতনাকে দীপ্র ঘোড়ার প্রতীকে বর্ণনা

'একুশ বিশুদ্ধ ঘোড়া বায়ান্নের পদতল থেকে

যাত্রা করে চলেছো একুশ শতাব্দীর দিকে।'

'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে ভীতি সঞ্চারক ও সংহারী অশ্বক্ষুরের আওয়াজ শোনা গেলেও অন্যত্র 'ঘোড়া'প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে শুভব্যঞ্জক, ধনাত্মক ও প্রবল। কখনও বা নবীন আনন্দ ও নতুন জন্মের সাহসকে মূর্ত করে।

'আমার হাত ফশ্‌কে শাদা একটি ঘোড়া বেরিয়ে গেছে প্রান্তরে/ ফাল্গুনের এই দিনে। (স্বপ্নের এন্টেনা ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ); এবং কখনও সে দুর্মর জীবনের অন্য নাম, বেঁচে থাকার অভিজ্ঞান ঃ

ক্যাটারপিলার আর বুলডোজার যতোবার মানুষের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে

www.pathagar.com

ততোবারই মানুষের ক্ষত থেকে ছুটেছে গোলাপ...

ততোবারই কবিতার শব্দে আতীব্র উঠেছে বেজে অশ্বক্ষুর ধ্বনি

(রাত্রি, পার্কস্ট্রিটে এক রাত্রি)

মান্নান সৈয়দের দ্বিতীয় পাতাল প্রবেশের অর্থাৎ পরাবাস্তব কবিতায় সমকালে মাছের প্রতীকী চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাছের এ্যাকুরিয়াম ভেঙে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে

ফাল্গুনের সোনামাছ, তারামাছ, এঞ্জেল ফিস

(আবহমান বসন্ত : পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি)

কিংবা

'তোমাদের শহরে এসেছি একটি অচেনা মাছ

দেবদারু গাছের সবুজ ছায়া-পড়া স্বপ্নাভ-নীল জলের ভিতর দিয়ে

পাখির সীবনকরা রৌদ্রে-বাতাসে হেমন্তে সোনায় বানানো চাঁদরের ভিতর দিয়ে'

(শহরের অচেনা মাছ)

অথবা

মাছ, তুমি হারুনার রশিদ, নিশিপোশাকে বেরিয়ে

ঘুরেছো শহরময়–প্রসাদে ও কুঁড়েঘরে

দেখেছো শূন্য জুড়ে তারাদের চাকা ঘুরে যায়।

মাছ, তুমি চলেছো কোথায়?'

(মাছ)

এখানে কবির চোখ মাছের চোখে প্রবিষ্ট হয়ে দেখছে। সাবমেরিনের পেরিস্কোপ কিংবা সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার দিয়ে রাত্রিতে সার্চলাইটের মতো দেখছে, ঘুরছে শহরময়। কখনো নিশাচরী বাগদাদী খলিফার রাহস্যিকতার সাথে নিরঞ্জন সমদৃষ্টির নিরপেক্ষতাকেও মূর্ত করতে চায়। কবির চিন্তা, চেতনার আশ্চর্য্য নিঃশব্দ এই 'মাছ' প্রতীক। তাই সহসা মান্নান সৈয়দ মান্নানের সৃষ্টিকেই প্রশ্ন করে বসেন। 'মাছ, তুমি কি আমারই চোখ?'

www.pathagar.com

আসলে যেকোন কবির আরাধ্য ও প্রাপ্তির যে ব্যবধান চিন্তাস্রোত ও বস্তু-বিশ্বের যে পার্থক্য ক্রমাগতভাবে তাকে রূপান্ত আত্মমর্মরিত ও প্রশ্নময় করে তোলে তারই মর্ম যাতনাসূচক ধনুর্বান কবিতার শরীর ও মজ্জায় ও আত্মায় জেগে ওঠে। অবশ্য তা সমকাল সত্য ও অনির্বচনীয়তাকে ও বৈকল্যকে সমভাবে উৎকীর্ণ ও উপজীব্য করে। আবদুল মান্নান সৈয়দ সে সূত্রেই যেমন জীবন চিন্তা-চেতনায় সচলতার সন্ধানী তেমনি মনন, সৌন্দর্য্যবোধ ও যুক্তি-অযুক্তি প্রাবল্যও অপ্রতিহত। বস্তুত চেনা-জানা পৃথিবী বহির্ভূত যে অচেনা, অদেখা জগৎ কবির অন্তঃভাবনায় পরিক্রমশীল, তাঁর অতিনির্দিষ্ট আয়তন বা বলয় যেমন আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে নিমজ্জিত তেমনি তার অস্তিত্ব নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দ, ও পরাক্রমশালী, পৃথিবীর বিবিধ দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ স্পর্শের জটিল জামদানি বুনোটের উপর ঘুরে বেড়ায় তাঁর নিশিজাগা রহস্যময়ী বাগদাদী খলিফার অভিজ্ঞ চোখ। জীবনকে নানাভাবে ছেনে তার সমস্ত মাধুরী ও লাবণ্যকে তিনি দেখেতে চান, তাঁর এই নিবিড় ইন্দ্রিয় সম্ভোগ তাঁকে ক্রমাগত আলাদা করেছে। আর তাই বাংলা কবিতার আঙ্গিকগত ঐতিহ্য অনুসরণ সত্ত্বেও মান্নান সৈয়দ পশ্চিমী কবিতার জানালাটাকেই মেলে ধরেছেন তাঁর কাব্য ভুবনে, এ কারণে বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের রহস্যময় জগতের দিকে তিনি অগ্রসর হোন কাব্যযাত্রার সূচনা লগ্নেই। জীবনের জটিল সব অলিগলি হেঁটে চলেছেন তিনি এক স্বতন্ত্র দৃষ্টি আর উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর কবিতার প্রাণ, এখানেই তিনি নির্মাণের জগতে এ মহৎ স্রষ্টা।

'কবিতার জলোচ্ছ্বাসে ভেসেছে আমার চরগুলি।

দুমড়ে পড়েছে সমকাল। ঝড়ে উড়ে গেছে বাস্তবতা।

কোথায় গিয়েছে ভেসে মানুষিক সব জটিলতা।

কল্পনার জলোচ্ছ্বাসে ভেসেছে আমার চরগুলি।'

(জলোচ্ছ্বাস)

www.pathagar.com

আল মুজাহিদী : স্বতন্ত্র এক কবিসত্তা

প্রাককথন ঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন ঃ Poetry is emotion recollected in tranquility. ভ্রান্তি বিলাস চর্চার এই যুগে সাহিত্যের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এখন এক অসকাল। সমাজ থেকে গণজীবন, গণজীবন থেকে মাটির কাছাকাছি, তারপর এক বিশ্ব এক সমাজ এবং মানবতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আজকের নষ্টালজিক সমাজে দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রেম ও গভীর মমতার এক মাইলফলক এঁকেছেন একজন কবি। নির্মল সত্তা, গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়-আশয়কে পুঁজি করে তিনি লিখে চলেছেন কবিতা। যেহেতু সমগ্র মন দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয়, মনের কোনো এক খিল দেয়া কামরায় অনুভূতির স্বতন্ত্র বৃত্তি নেই তাঁর, তাই তিনি সর্বাগ্রে ডাঙার নরম সবুজ মাটির মত কবিতাকে করেছেন ফলময়। মহৎ কবিতা তাঁকেই বলা যায় যা একাধারে সমসাময়িক, শাশ্বত, যুগধর্মী, ঐতিহ নির্ভর এবং যুগান্তরগামী। ফ্যাসিস্ট তামসিকতার নগ্ন অভিযানে আজকের কবিতা অঙ্গন যখন কলুষিত তখনো তিনি সামাজিক দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। তিনি কবি আল মুজাহিদী। গভীর, গভীরতরভাবে তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করলে অনেক পরীক্ষিত ও বাস্তবীকৃত শিল্পচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুচিন্তিতি, সুলিখিত, প্রকর্ষিত চিত্তের ফল সর্বদা সুস্বাদু হয়। দেশ-কাল-বিশ্ব ভেদাভেদে আল মুজাহিদীর কবিতা ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, ঐতিহ্য মানবতার যে কথা লিখে চলেছেন তা চিন্তারাজ্যে নতুন ভূ-খণ্ড আবিষ্কার করে। এ কারণে আল মুজাহিদীর কবিতাকে বলা যায় চলমান, ঘূর্ণ্যমান, সংক্রমণশীল এবং মৌল বিশ্বাসের প্রতিরূপ। প্রেম মানব জীবনের চরম অমূল্য সম্পদ। যত্নবান ও সচেষ্ট শব্দশিল্পী আল মুজাহিদীর কাব্যিক পটভূমি মাঝে-মাঝেই প্রেমময় হয়ে ওঠে।

মৃত্তিকার কবি ঃ মাটির আদম ঃ অ্যাংলো-স্যাকসন মহাকাব্য 'যদি উলফ'-এ আমরা দেখি যে অন্ধকার সাগর থেকে একটি ভয়ঙ্কর বেরিয়ে আসছে মৃত্তিকার মানুষকে আঘাত

www.pathagar.com

করবার জন্য। দীর্ঘদিন মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ একত্রিত হয়ে সমুদ্রের ভয়ঙ্করকে ধ্বংস করেছে এবং অবশেষে মানুষের জন্য মৃত্তিকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল মুজাহিদীর কবিতায় বারে-বারে, ফিরে-ফিরে 'মৃত্তিকা' শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ কারণে অনেকেই এটাকে শব্দদূষণ আবার অনেকে অতিকথন বলে নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হলে খুব একটা বেশিদূর পথচলা যায় না। কেন একজন কবি আল মুজাহিদী একটি শব্দকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন যুগ-যুগ ধরে। শব্দ সচেতন কবি আল মুজাহিদীর এই রহস্যময় অবস্থান আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অন্য এক বাস্তব অনুভূতির দুয়ারে। একটি বিষয়ের বারংবার ব্যবহার আসলে ঐ বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। কবির এই মৃত্তিকা শুধু কি মাতৃভুমির ভূ-খণ্ডের? নাকি সমগ্র বিশ্ব-ভূখণ্ডের মৃত্তিকার, আগে এই বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

'হে মৃত্তিকা, তুমি আজ সেই প্রাকৃত সাংস্কৃত পারসীয় আরবীয় লাতিন হিব্রুর

সংগীত স্তবক উপহার দাও। অরণ্যে উদ্যানে পাখির পালকে

আমি আজীবন বন্দী-অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমার;

তুমি গোটা মানব জাতির অস্তিত্ব স্পন্দন

আমি আজ তোমার কাছেই ফিরে আসি

পদ্মা মেঘনা যমুনা বিধৌত পলল ভূমিতে

তুমিই আমরা

আমিই তোমার অখণ্ড গতির

মহাকাব্য।'

(মৃত্তিকা অতিমৃত্তিকায়)

মৃত্তিকা অনুরাগ কেবল রোমান্টিক আবেগই নয়, বাস্তব পৃথিবীমুখী চেতনার উষ্ণ প্রকাশ। এই যে ঐতিহ্যানুরাগী, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এটা তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য এবং রক্তের সাথে মিশে গেছে। ফলত তাঁর কবিতায় বিশ্বসাম্রাজ্যকে উপস্থাপন করার এই মনোবাসনা মানবিক চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত উদগীরণ। একজন কবি যখন মানসিক দিক দিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে ও যত্নসহকারে উচ্চনিনাদিত শব্দাবলী ও তত্ত্বের বিশাল আকাশ নিয়ে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে যান তখন পৃথিবী তাঁর কাছে বড্ড ছোট্ট হয়ে যায়। বিষাদ ও নৈরাশ্য যখন কবির চারপাশ অক্টোপাসের মতন জড়িয়ে রাখে সামাজিক বিশৃংখলার সুযোগে, তখনও কবি মৃত্তিকাকে আগলে রাখেন পরম মমতায়। এক আশ্চর্য

www.pathagar.com

মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন কবির চারপাশ। দুঃখ যেখানে উঁইপোকার মতন আঘাত হেনে কুড়ে কুড়ে খেলেও তিনি সলাজ ভঙিতে বলেন ঃ

i. সুমৃত্তিকা, আমাকে কি দেবে কেবল কটাক্ষ? নাকি হিমঝরা সুখের জলধি
কতো আর পাড়ি দেবো নদ-নদী
স্রোতস্বল বঙ্গোপসাগর–কাল নিরবধি!
শ্যামল প্রেয়সী সৃমুত্তিকা
এ-বাংলার দারুণ দহন এই বুকে–শুধু দুঃখ দেবে, দাও
কালের ক্রন্দসী, আমাকে কাঁদাও–
আমার জীবনে কতো যে রোদন, আহা!

(সুমৃত্তিকা)

ii. আমি স্বপ্নের জাগরণে এখনও মাটি চাই
তুমি সেই মহান মৃত্তিকা, আমার স্বদেশ
তোমার বিষবু চোখের কোটরে কম্পমান
আমার অস্তিত্ব।

(স্বদেশের নান্দীপাঠ)

কবি আল মুজাহিদীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব সংলগ্নতা একই সঙ্গে অর্থময়। মানবিক অস্তিত্বের সার্থকতা সন্ধানে সদাসতর্ক কবি একদিকে যেমন দেশের 'মানচিত্রে তার গন্তব্য খুঁজে পান' অন্যদিকে আবার 'সার্বভৌম সূর্যের কোরাসে' 'দীর্ঘতম ভবিষ্যৎ' সন্ধান করেন। 'বন্দী শিবিরে সূর্যোদয়ে' যেমন তিনি 'স্বদেশ ভূমি'তে ফিরে আসার কথা বলেন তেমনি 'উৎস মানুষ' কবিতায় নিজের হৃদস্পন্দনে শুনতে চান 'সারা মানবজাতির' হৃদস্পন্দন।

'হে আমার অস্তিত্বময় একান্ত মৃত্তিকা অতিমৃত্তিকা,
এখানে কেবল চলমান পৃথিবীর, পৃথিবীবাসীরা বেঁচে থাকে।'

ইতিহাস, ঐতিহ্যের সবুজ মহাদেশ ঃ ' Poetry is excellent words in excellent arrangement and excellent metre.' দশ-পনেরো হাজার বৎসর পূর্বে আল্টামিরার গুহাগাত্রে নানা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

পাথরের গায়ে এমন আশ্চর্য সজীব মূর্তি যে আদিম কারিগররা রেখে গেছেন তাঁদের কলাকৌশলের তারিফ না করে আমরা পারি না। সভ্যতার গোড়াতে শিল্পকলার মূল্য ছিল নিতান্ত প্রয়োগসিদ্ধ। সভ্যতার এই উৎকর্ষ পর্যায়ে প্রাপ্ত ইতিহাস সকল দেশে, সকল কালেই কবি-লেখকরা আলোকিত করেছেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারময় ইতিহাসকে আলোকিত রৌদ্রে টেনে এনেছেন কবিতার উপমা, রূপক, শব্দচয়ন, আতিশয্য, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাসের চিত্রকল্পময় কারুকাজে। আল মুজাহিদী ঠিক অনুরূপ কাজটি করেছেন সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংবদ্ধ অক্ষর দিয়ে।

i. 'মৃত্যুবাণ যীশু খৃষ্ট ক্রুশ প্রস্তরখণ্ড
বেথেলহেমের পর্ণকুটীর
মৃত্যু যেন সুগম্য চৈতন্য মুহাম্মদ অলৌকিক
সিনাচাক মহাপুনরুত্থান।'

ii. ইতিহাস শোণিতাক্ত
মহান যীশুর হৃদপিণ্ড ক্রুশদর্ণ
আমরা এখন শনাক্ত করতে পারছি না শত্রু-মিত্র
চতুর্দিকে কী ভীষণ অন্ধকার।

iii. আমি জন্ম-জন্মান্তরের নান্দি পাঠ করি।
অগ্নিচুল্লিগুলো ভস্মীভূত হোক আমার বিদগ্ধ নিঃশ্বাসে।
হৃদয় নামক অস্ত্র হোক আমাদের পারিজাত-পুষ্প
এই ধ্বংস আর ভস্মরাশি থেকে আমি জেগে উঠে আবার
নির্মাণ করবো পৃথিবীর মনোজ্ঞ উদ্যান।
পৃথিবীর বেঁচে থাকা পাখি, ফুল, নদী, নিসর্গ, সমুদ্র, নীলিমা
নর, নারী, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, নিঃস্ব, অসহায়-আর্ত সকলেই উচ্চারণ করে
আর ধ্বংস নয়। ভস্মস্তূপ নয়।
'নো পাসারান'
নো পাসারান।
(নো পাসারান)

www.pathagar.com

iv. হে ঠাণ্ডা কফিন!

তুমি কাঁদবে না একবারও

মৃতভূমিবাসীদের জন্য?

আমি তোমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দেখলাম

মৃত ব্যক্তিদের আত্মা

গুমরে গুমরে কাঁদছে

বিভীষিকাময় আগস্টের

আগ্নেয় প্রত্যুষ।

(আগ্নেয় প্রত্যুষ, ৬ আগস্ট)

v. হিরোশিমা,

তোমার মৃত্তিকা আর

ভূগর্ভস্থ প্রাচীন করোটি, হাড়গোড়

আমি আমার আত্মার আর্কাইভে

সংগ্রহ করে রেখেছি।

(হিরোশিমা, মন, আমুর নাগাসাকি, মন আমুর)

vi. জলপাই-রঙ বেয়াড়া গাড়িটার নীচে পড়ে আছে

মানুষের সারি সারি অসংখ্য গলিত লাশ

সাদা আলখাল্লায় ঢাকা আমার কফিনের ভাঁজ পাশে রেখে দাও

আমার ফেলে আসা কালোরাতির পুরনো পাণ্ডুলিপি

(জলপাই-রঙ বেয়াড়া গাড়ী)

বাংলাদেশের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তিক স্বরের স্রোত অতি ক্ষীণ। বুদ্ধিবৃত্তিক কবিতা শুনে শুনে হয় না, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যদিও ভালেরির মন্তব্য 'কেবল বুদ্ধি দিয়ে কবিতা হয় না।' একথা সত্য, তদুপরি বুদ্ধির চৌকসতা আর কবিতার বিষয় একজন কবি যখন উপলব্ধি করতে পারেন What is his aim তখনই বুঝি সত্যিকার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হিরোশিমার জন্য কবির যে দরদ, উপলব্ধি, বোধ, তা বাংলা

www.pathagar.com

কবিতা কেন আমার মনে হয় বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। কথাটি এজন্য বললাম, ধ্বংসযজ্ঞের মাঝে একজন কবি হৃদয় কী পরিমাণ শোকাচ্ছন্ন তা বোঝা যায় আল মুজাহিদীর 'কাঁদো হিরেশিমা কাঁদো নাগাসাকি' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে। 'All great poetry is realistic'– কথাটির ব্যাখ্যা আল মুজাহিদীর কবিতায় পাওয়া যায়।

ইতিহাস সচেতন কবি আল মুজাহিদীর কবিতায় শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতার আবহে তাঁর এ শব্দচয়ন অনেক পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে; কিন্তু মূল বিষয় নিগূঢ়ভাবে পর্যালোচনা করলে থমকে যেতে হয়। শব্দের বাঙ্ময়তার প্রকৃত জীবনদর্শন জীবন্তভাবে ধরা দেয়। এই শব্দের জীবনদর্শনই যাঁর করায়ত্ত তাঁর শৈল্পিকসত্তা নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। এক্ষেত্রে Matthew Arnold-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য– 'The grand power of Poetry is the power of so dealing with things as to awaken in us a wanderfully full, new and intimate sense of them, and our relation with them.'

কবিতায় শৈল্পিক অলংকার, জীবনদর্শন এবং ভাবের গভীরতা নিয়ে যে কবির কাব্যযাত্রা তিনি কালের প্রয়োজনে বারংবার আলোচিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী, বায়রন, হুইটম্যান আবার বাংলা কবিতায় (আধুনিক যুগে) মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবিদের কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে শৈল্পিকসত্তা, জীবনদর্শন, ভাবের গভীরতা, অনুভূতির ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা। অতি সামান্য বিষয়কে তাঁরা অসামান্য রূপ দিয়েছেন। আল মুজাহিদীর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব সাহিত্য অঙনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। অনুভূতির কল্লালোকে আবর্তিত হয়ে তাঁর নির্মাণশৈলী ভাবের গভীরতা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন নন্দনপ্রেমীদের দৃষ্টি কাড়ে।

i. কখনো বসন্ত যদি দোলায় পল্লব এই রাতে
তুমি তো ফাল্গুনি মেয়ে, আহা তোমার চোখের নীড়ে
জেগে আছে নীল পাখি লাল জবা কতো কৃষ্ণচূড়া।

(সুমৃত্তিকা)

ii. মেট্রোপলিটন মানুষেরা হাভাতের মতো আত্মসাৎ করে রাত্রির নিটোল চাঁদ আর রুটি
ঈশ্বরের বাজেট ঘাটতি ঘটে যায়; তবু আমার জিহবায় লেগে থাকে
কবিতা প্রসাদ–কবিতার চেয়ে অতিরেক আর কিছু
রোচে না এখন আমার জিহবায়।

(মেট্রোপলিটন পংক্তিমালা)

www.pathagar.com

iii. তুমি জেনে রেখো, পাখিরা নিকট প্রতিবেশী মানুষের। মানুষেরা
পাখির বসতি খোঁজে আজকাল– শান্তিময় ডুমুর উদ্যান, নিজ নিজ
সম্প্রদায়- নিজস্ব জাতির।

(ডুমুর বাগান)

iv. হে বন্দী শিবির! তুমি কেনো আড়াল করেছো আমার সূর্যকে
রাজধানীর প্রত্যুষ, জ্যোৎস্নার শামিয়ানা, লোকালয়।

(বন্দীশিবিরে সূর্যোদয়)

v. তুমি তো ফাল্গুনি মেয়ে, আহা, তোমার চোখের নীড়ে
জেগে আছে নীল পাখি লাল জবা কতো কৃষ্ণচূড়া।

(সুমৃত্তিকা)

ঐতিহ্য ও ব্যক্তি প্রতিভা প্রসংগে টি, এস, এলিয়ট বলেছেন ঃ What I mean by tradition involves all those habitual actions, habit & custom from the most, singificant religions rites to our conventional way of greeting a stanger, which represent the blood kinship of the same people living in the same place.

অর্থাৎ একটা ভৌগোলিক খণ্ডের রক্তের সম্পর্ক সম্পর্কিত জনসমষ্টির নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সামাজিক-ধর্মীয় প্রথাদি ঐ বিশেষ জনসমষ্টির ঐতিহ্য এবং এ ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধবস্তু মাত্র নয়, প্রচুর সাধনার মধ্যদিয়ে তাকে পাওয়া যায়। এবং এর সাথে The historial sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presense অর্থাৎ কেবল অতীতের অতীতটাই নয় বরং অতীতের বর্তমানটাই ইতিহাস চেতনার উপজীব্য। আল মুজাহিদী খোলা চোখের কবি। তিনি সংযমী এবং ঐতিহ্যের আঙিনায় ভাষার অভিজাত পুরুষ। ঐতিহ্যনির্ভর এই কবির কবিতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিক মেজাজের এই কবি সমকালীন কবিতার মৌল স্বভাবটি আশ্চর্য সুষমায় নিজের আয়ত্তে এনেছেন।

i. আমি আজ তোমার কাছেই ফিরে আসি
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত পলল ভূমিতে
তুমিই আমার
আমিই তোমার অখণ্ড গতির
মহাকাব্য।

(মৃত্তিকা অতিমৃত্তিকা)

www.pathagar.com

ii. হে আমার অস্তিত্বময়তার একান্ত মৃত্তিকা, অতি মৃত্তিকা

এখানে কেবল চলমান পৃথিবীরা, পৃথিবীবাসীরা বেঁচে থাকে

আজ এই নির্বাসন থেকে ও নিঃসঙ্গতার করিডোর থেকে পাঠ করছি তোমার

আবেগ উপচে পড়া কখনো বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত পত্রালির মতো হৃদয়ের ক্রোড়পত্র।

ঋতুর বৈচিত্র্যে তুমি বারবার লুকিয়ে উঠো

নবোদ্গম উদ্ভিদের মতো।

(মৃত্তিকা অতি মৃত্তিকা)

নান্দনিক সবুজ আহার ঃ ইংরেজীতে 'সিলোজিস্টিক প্রগ্রেশন' বলে একটা কথা আছে অর্থাৎ যুক্তিবাদী অগ্রসরমানতা। এমনভাবে কবিতার শব্দগুলো অগ্রসর হবে যে পাঠকের কোন কিছু নির্মাণ করবার সুযোগ দেয়া হবে না। অর্থাৎ কবি নিজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য ব্যাকরণের বন্ধনের সাহায্যে এমনকি আবেগের সাহায্যে এমনভাবে কবিতার বাক্য নির্মাণ করবেন যে কবির উদ্দিষ্টের অতিরিক্ত কোন কিছু পাঠক কল্পনা করতে পারবেন না। কবির বক্তব্য পাঠক গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র আরম্ভ '

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি

বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে

অকালে, কহ, হে দেবী, অমৃতভাষিণী

কোন বীরবহে বরি সেনাপতি পদে

পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষোকুলনিধি

রাঘবারি।

এখানে পাঠক বা শ্রোতার কোন সুযোগ নেই কোন নতুন তথ্য সংযোজনের বা নতুন শব্দ প্রয়োগের। কবি কোন ফাঁক রাখেননি। কি ধরনের যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু হল? সম্মুখ সমর। বীরবাহু কোন ধরনের বীর ছিলেন? বীর চূড়ামণি। বীরবাহুর বয়স কত ছিল? অকালে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এর পরবর্তী অবস্থা কি? রাঘবারি অর্থাৎ রাবণ পুনরায় কাকে যুদ্ধে পাঠালেন? এই 'পুনঃ' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ অংশটি পাঠ করলে দেখা যায় এমনভাবে সিলোজিস্টিক প্রগ্রেশন ঘটেছে যে পাঠক বা শ্রোতার কোন শব্দ পরিবর্তনের কোনই সুযোগ নেই। তেমনি আল মুজাহিদীর স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের কবিতা 'বিজয় দিবস'ও তেমন একটি কবিতা। এই কবিতায়

www.pathagar.com

যদিও কিছুটা আবেগ আছে তবু কবিতাটির সমস্ত অবয়বে কোন ফাঁক নেই। পাঠক শ্রবণমাত্র অভিভূত হবে এমনটি ভাবা যায়।

'কূলায় প্রত্যাশী পাখিদের মতো আমি ফিরে আসি নিজ বাসভূমে
রাজপথে কালো পিচঢালা অ্যাশফল্টে কোনো কনভয় লরি নেই
জলপাই রঙ খাকি উর্দি পরা গাড়ি
ওড়না উড়িয়ে স্কার্ফ পরা শ্যামলী মেয়েরা
তাদের নিজস্ব প্রিয় রাজধানী দেখে নিচ্ছে সহস্রবার
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
শিশু-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা
বিপণির কাসকেটে রাখা স্বর্ণ দ্রব্যগুলো বুলোচ্ছে আদরে
ওরা যেন এক একজন মাতৃভূমি
এরা যেন এক একজন উদার নীলিমা
ওরা যেন এক একজন প্রত্যুষের সমুদ্র বলয়
ওরা যেন এক একজন মসলিন প্রজাপতি
প্রত্যুষের আলো থেকে জেগে ওঠা প্রতিমা মৃত্তিকা
নীল চোখের স্তবক
এই পৃথিবীতে এক একজন শরীরী উপত্যকা'

আল মুজাহিদীর 'সিলোজিস্টিক প্রগ্রেশন' অর্থাৎ যুক্তিবাদী অগ্রসরমানবতার সাথে যুক্ত হয়েছে 'কোয়ালিটেটিভ প্রগ্রেশন' অর্থাৎ গুণগত অগ্রসরমানতা। এখানে আল মুজাহিদীর যে গুণের কথা বলছি, তা ঠিক যুক্তির সাহায্যে না সাজিয়ে গুণকে একের পর এক সাজিয়ে, গুণ মানে কোয়ালিটি- অভ্যন্তরীণ সত্তাকে আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্ট করছি। যেমন শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা। শামসুর রাহমানের এই কবিতায়, আবার আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' কবিতার শব্দের গতিবেগের বিন্যাসে গুণগত অগ্রসমানতা অত্যন্ত কৌশলের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ সত্তার উন্মোচন সাধিত হয়েছে। এক একজন কবির 'কোয়ালিটেটিভ প্রগ্রেশন' পাওয়া যায় ভিন্ন-ভিন্ন কবিতায়। বর্তমান আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নিগূঢ় ছেঁড়া বক্তব্যের পাশাপাশি সংযমী, ঋজুতার যে মহৎ দৃষ্টান্ত আল মুজাহিদী স্থাপন করেছেন তা গুণগত অগ্রসরমানতায় একদিকে সৃষ্টি নৈপুণ্যে ব্যঞ্জনময় অন্যদিকে পরিশীলিত চিৎপ্রকর্ষের অভিজ্ঞান।

www.pathagar.com

i. আমি স্বপ্নে জাগরণে এখনও মাটি চাই
তুমি সেই মহান মৃত্তিকা, আমার স্বদেশ
তোমার বিষুব চোখের কোটরে কম্পমান
আমার অস্তিত্ব।

(স্বদেশের নান্দীপাঠ)

ii. একজন কবি না এলে নদীতে জোয়ার ভাটা থেমে যেতো ঃ
শুক্লপক্ষ দ্বাদশীর চাঁদ থমকে দাঁড়াতে অন্ধকারে,
একজন কবি না এলে কেবল হত্যার উৎসব লেগে থাকতো এ গ্রহে
আমি জানি একজন কবি না এলে 'সুদীর্ঘ বর্বরতায়'
জর্জরিত হতো আমাদের এ পৃথিবী
আমি আজ একজন কবিরই, চাই অনিবার্য আবির্ভাব।

(বসন্ত কামিনী)

iii. হে পৃথিবী, আজ দেখছি তোমার নিজের মঙ্গল চেতনায় তুমি মগ্ন
আর আমি আমার প্রেয়সীর জন্যে বিলাপ করছি
আর আমার পিতৃপুরুষের ফসিলের জন্য।
নাগাসাকি, তুমি বাংলার এ মৃত্তিকা থেকে কুড়িয়ে নাও
শতাব্দীর ঝরাপাতা
এলিজিগুচ্ছ।

(নাগাসাকি সভ্যতার শেষকৃত্যে)

পরমাত্মার সন্ধানে স্বপ্ন বিলাস ঃ একজন কবি সহজেই জগতের বাধা-বিপত্তির মাঝখানে নিজস্ব স্বপ্ন দেখেন। নির্ভূতের গহীন জানালায় বসে প্রত্যক্ষ করেন জগতের বিষম পার্থক্য। অস্তিত্বের সাথে অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব কবিকে দগ্ধ করে। শিল্প-প্রকৃতের সারসত্তায়; শব্দের অনুকল্প স্থাপনা, দৃশ্যের সচেতনের অদৃশ্যতা-অচেতন-বোধ সৃষ্টি; তরঙ্গায়িত উপলব্ধির বস্তু কাঠামো বিনির্মাণ– এসব পরীক্ষা-প্রক্রিয়া প্রকল্পই কবিতার শরীর ও মন নির্মাণে কবির এ ভাষিক শিল্পের সংস্থিতি। যেখানে অনিশ্চয়তা-নিশ্চয়তার অন্তর্লোক সর্বাধিক বিকশিত হতে চায় সেখানে আল মুজাহিদী এলিয়ট মতাদর্শের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাবলে মৃদু আবেগ যুক্ত, ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কবি। অতিরিক্ত আবেগ যাকে কখনো গ্রাস করেনি, সতত প্রবাহমান তিনি। পূর্বসূরী ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশিষ্ট কাব্যতত্ত্বের প্রতি নির্মম মত পেষণ করেছিলেন টি, এস এলিয়ট। তিনি লিখেছিলেন– 'The business of the poet is not to find new emotions. But to use the ordinary ones and in working them up into poetry to express felling which are not in actual emotion at all. And emotion which he has never experienced will serve his turn as well as those familiar to him. Consequently, we must beleive that emotion recollected in tranquillity is an inexact formula: For it is neither emotion nor recollection, nor without distortion of meaning, tranquillity' (The music of poetry : T.S Eliot)

আবেগের মাত্রাতিরিক্ত সৌধ আল মুজাহিদী ঝেড়ে ফেলেছেন অনেক আগেই। ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিক ধাঁচ, আর আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যকলার সাথে আল মুজাহিদী মিশে গেছেন সাম্প্রতিক কবিতায়; অনিবার্যভাবে, এ এক পরম প্রাপ্তি পাঠকদের। এলিয়টের ক্ষ্যাপা কাব্য সমালোচনা আল মুজাহিদীর কবিতার জমিনে প্রজোয্য নয়।

আল মুজাহিদীর কবিতায় নারী ঃ স্বপ্ন প্রার্থনার সম্মিলিত ঢেউ ঃ ত্রিশের আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকদের ভাষা ছিলো ঋণসর্বস্ব। ইংরেজী জানা এসব কবিদের চেতনায় বিশ্বদরবার ছুটে আসত সবসময়। নারীকে রবীন্দ্রনাথের কিংবা নজরুলের আধুনিক দৃষ্টিভঙিকে এরা পাশ কাটিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্কার্ট, মিডিতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। দেশ, কাল, সমাজের নারীর আচরণ এদের কবিতায় ফুটে উঠত পাশ্চাত্য নারী ঢঙে। অথচ এদের অগ্রপথিক এলিয়টের নারীর ব্যাপারে আগ্রহ ছিল রক্তমাংসের মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মত, নর-নারীর সম্পর্ক তাই নানান জটিলতা নিয়ে উপস্থিত তাঁর কবিতায়। আধ্যাত্মিক ভাববাদের কাছে এলিয়টের নারীকে তিনি সমর্পণ করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেছিলেন। এলিয়ট নারীকে প্রস্তাব দেন ভ্রমণের: রাত্রি যাপনের ঃ

তাহলে বেরিয়ে পড়ি তুমি আর আমি দুজনায়

যখন ছড়ানো সন্ধ্যা আকাশের গায়

যেনো রোগী টেবিলে শায়িত, আচ্ছন্ন ইথারে;

চলো যাই সেই পথে জনশূন্য প্রায় সেই দিক

যেখানে আপন মনে কথা বলে নির্জন পথিক

অশান্ত এক রাতের পালা শেষ হলে হোটেলের

www.pathagar.com

এবং কাঠের গুঁড়ো রেস্তরাঁয়, যেখানে জমেছে খোলা ভাঙ্গা ঝিনুকের

সেই পথ যা এগোয় একঘেয়ে কুতর্কের মতো,

চতুর মতলবে নিয়োজিত

এবং যা ঠেলে নিয়োজিত

এবং যা ঠেলে দেয় চূড়ান্ত প্রশ্নের দিকে.....

জিজ্ঞাসা করোনা যেন, 'সেটা কী আবার?'

চলো যাই, এই তো সময় বেরোবার।

(টি.এস.এলিয়ট ঃ জে, অ্যালফ্রেন্ট প্রুফকের প্রেমগীতি, অনুব জগন্নাথ চক্রবর্তী)

এলিয়টের এই প্রস্তাব ভ্রমণের; রাত্রি যাপনের সেখানে আল মুজাহিদীর কবিতায় নারী চরিত্র দেশ, ঈশ্বর, বিশ্ব সম্মিলিত সংমিশ্রণের সাথে একমাত্রায় মিশে গেছে। আল মুজাহিদীর নারীপ্রেম আসলে জগৎসংসারের দৈহিক কামনা-বাসনার উর্ধ্বে এক আলাদা সত্তা।

i. হে আমার অস্তিত্বময়তার একান্ত মৃত্তিকা, অতিমৃত্তিকা

এখানে কেবল চলমান পৃথিবীরা, পৃথিবীবাসীরা বেঁচে থাকে

আজ এই নির্বাসন থেকে ও নিঃসঙ্গতার করিডোর থেকে পাঠ করছি তোমার

আবেগ উপচে পড় কখনো বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত পত্রালির মত হৃদয়ের ক্রোড়পত্র।

ঋতুর বৈচিত্র্যে তুমি বারবার লুকিয়ে উঠো

নবোদ্গম উদ্ভিদের মতো।

(মৃত্তিকা-অতিমৃত্তিকা)

ii. খেলা করো রাতদিন। বন্দী খাঁচার শিকলি কাটো তোমার করাত দিয়ে;

তুমি ডানা ঝাড়ানোর গান গাও শুধু।

তুমি কেন অম্ল-অণু শুষে নাও অরণ্যের শীর্ষ চূড়া থেকে? প্রকৃতির জরায়ু

যোজিত করো তুমি; সংকলিত করো ফল-মূল জংঘার আঁধার থেকে।

(ডুমুর বাগান)

গ্লোবাল ভিলেজে চেতনার নেপোলিয়ান ঃ আল মুজাহিদী হাজার বছর ধরে মানুষের

www.pathagar.com

চিন্তা ও সংস্কৃতির দীর্ঘ বিকাশের ধাপটিকে তাঁর কবিতায় রূপায়িত করতে চেয়েছেন এবং তাঁর দেশ কাল সংস্কৃতি কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়। সকল কালের এবং সকল মানুষের সভ্যতা ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি একাত্ম ও উত্তরাধিকারী ধারণা অনুভব করেছেন। তাই ব্যাবিলন এবং গ্রীসীয় সভ্যতা তাঁর কাছে সুদূরপরাহত মনে হয় না। মানুষের মৃত্যু হলে তবু মানব থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে এসে আজকের মানুষের কাছে চেতনার হিসাব নিতে আসে। আল মুজাহিদীর আবিষ্কৃত জীবনাদর্শ তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। মানুষের উপলব্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাস তাঁর কাব্যে।

'আমরা কি করে যাবো মৃতকল্পে হিমযুগে, বধ্যমূমে

পৃথিবীর মৃত ঘড়িঘরে।

যদি কালের রাখাল ছুটে আসে দ্রুত পায় প্রস্তুতায় জনপদে, সাগর প্রান্তরে–

আবার জাগিবে প্রাণ, এইসব পোড়াজমি, পল্লবিত হবে– মহাবিক্ষর কালে

পৃথিবীকে বলে দাও পৃথিবীবাসীর কথা।'

শিল্প, সাহিত্য পরিবর্তনযোগ্য এবং সভ্যতার মতোই গতিময় অর্থাৎ ক্রমঅগ্রসরমান। কবিতার নির্যাসটুকু হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় একই, কিন্ত এর বাইরের যে অলংকরণ, অন্তরের যে গীতপ্রবণতা তা বিভিন্নকালে ভিন্নভাবে কবি চেতনায় ধারণকৃত। শিল্প অভিনিবেশ ও গভীরতা দাবি করে। আপাতকালীন সে খোলস পাল্টে হালকা হলেও তার মর্মে ছড়িয়ে আছে তীক্ষ্নতা, ঋজুতা। কালে কালে যে ধ্বংসযজ্ঞ, মৃত্যু চিন্তা কবি-সাহিত্যিকদের চেতনায় গাঢ় হয়ে বসে আছে তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ শিল্প। এক একটি আরম্ভের ঠিক জন্মের মত যেমন শেষ আছে, ঠিক তেমনি আছে সম্ভাবনা। হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাসে চর্যাপদ, বৈষ্ণব, পদাবলীর মাধ্যমে যে পথ ক্রমশ মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, ফররুখ আহমদ অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার মডার্নিজম, পোস্টমডার্নিজম তত্ত্বভাবে ক্রমশ এগুচ্ছে সেই মিছিলে আল মুজাহিদীও অংশগ্রহণ করেছেন। তবে ভাষা, বিষয়, চিন্তার ক্ষেত্রে আল মুজাহিদীর টেকনিক সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অন্যরকম। যদিও এদেশের পঠন-পাঠন এখনও রোমান্টিসিজমের দিকেই ঝুঁকে আছে। আল মুজাহিদী রোমান্টিক ধারার কবি হলেও তাঁর মাঝে কাজ করে ঐতিহ্য, মানবতা, সমাজমনস্কতা, ইতিহাস চেতনা এবং বিশ্ব ভূ-খণ্ডের এক ও অভিন্ন অবস্থান। এই চিন্তা-চেতনার জন্য তাঁর কবিতার বাচনভঙি আলাদা কাব্যস্টাইলের পথ খুঁজে পেয়েছে। এজন্যই তিনি বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ধারার কবি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক–

আমার মৃত্তিকা তুমি জন্মমুহূর্ত বাঙ্ময় করে। তোমা বুকের লতানো

পত্রপল্লবীতে আমার উন্মেষ; দিগন্তের খণ্ড খণ্ড মেঘ ঝরে পড়ে। জোয়ান

www.pathagar.com

কৃষক বুকের জমিতে ফলায় শস্যকণা।

এত 'অস্থির আলো-আঁধার নেভে আর জ্বলে

জীবনের জোনাকির ঝাড়ে নেমে আসে নারী এক দেবীর মতন।

পাখি অগুনতি পাখি, কোটি কোটি পাখি আকাশ রেখায় শুধু ডানা

মেলে ভেসে যায়।

এইসব প্রাচীন, প্রাগার্য পাখির বুকের গভীরে–

পালকের নিচে শুধু জ্বলে স্বভূমি-স্বদেশ, অরণ্যের উষ্ণ উত্তরাধিকার।

শেষ কথা ঃ আল মুজাহিদীরা কবিতার বিষয়বস্তু একটি উদার মানবতাবোধ, দেশপ্রেম, নারীপ্রেম ও নিসর্গ নিমজ্জনে চক্রাকারে সৌরজগতের ন্যায় ঘুরছে এটা তাঁর কবিতা পাঠে বোঝা যায়। বিশ্বসংস্কৃতির নানাবৃত্তি, মিথে তাঁর মনোযোগ। ইতিহাস ও কিংবদন্তী থেকে অনায়াসে অনুষঙ্গ ও উপমা চয়ন করেন এবং যে চেতনার মাঝে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তাকে লাগে এক অবারিত দূরযাত্রা, যেদিকে পড়ার সময়ও আমরা নিতে থাকি তাঁর সঙ্গ। তাঁর কবিতায় আশার পাশাপাশি কিছুটা সংশয়বাদও কাজ করে। এই সংশয় আসলে তাঁর আত্মার অতৃপ্তি। অধিকতর ক্ষুদ্রস্তরে নেমে না এলে তাঁর কবিতায় প্রেরণা কিভাবে কাজ করছে তা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁকে বুঝতে হলে সভ্যতার আদি ইতিহাসের উপর জানাশোনা থাকা উচিত। ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাদী এই কবি কাল পেরিয়ে মহাকালে আলোচিত হবেন এ আশা করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

i. হেমলকের পেয়ালা : আল মুজাহিদী

ii. মৃত্তিকা, অতিমৃত্তিকা : আল মুজাহিদী

iii. কাঁদো হিরোশিমা কাঁদো নাগাসাকি : আল মুজাহিদী

v. ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক : আবু সয়ীদ আইয়ুব

vi. বাংলা সাহিত্য প্রসংগ : আবুল বশর

vii. The music of poetry: T.S Eliot

www.pathagar.com

ফরহাদ মজহারের ২০ এবাদতনামার তাফসির

আজকের এই নির্মম সময়ে আমাদের স্মৃতি হতাশায় কাটুক, এ আর কাম্য নয়। সংস্কৃতির নগ্ন দুর্দশার এই অসকালে দিকপতি সাহিত্যের আমর্ত্যবর্গ কী ভীষণ নির্বাক। কারো বা অস্বচ্ছ দৃষ্টি ধৃতরাষ্ট্রবৎ, কারো বা চোখের চৌহদ্দিতে কানামাছির কালো কাপড়। আজকের এই দিশাহারা সময়ে একজন পথপ্রদর্শকের প্রার্থনায় দুরুবক্ষ কখনো যায় মা মেরির কোলে, কখনো হযরত ফাতেমা (রাঃ) কোলে, জন্মভূমির এই হাহাকার মুহূর্তে নবপাঠে, নবসাজে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত, স্বাধীনসত্তায় নির্মিত, বুদ্ধিবাদ, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, আল্লাহর সাথে ঠাণ্ডা সংলাপ, সময়ক্ষেত্রে উত্তেজক বাক্যবাণ, বাঙালি মুসলমানদের জন্য নতুন ভাবনার কাব্যগ্রন্থ ফরহাদ মজহারের 'এবাদতনামা।'

প্রথমে এই বইটি প্রকাশলগ্ন থেকে এদেশে বিশেষত প্রগতিক্যাম্পে দারুণ সমালোচিত। পাশাপাশি অজ্ঞ, মূর্খ বাঙালী মুসলমান যাঁদের ধর্মজ্ঞান অ, আ, ক, খ পর্যায়ে, তাঁদের মাঝে দারুণ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তথাকথিত প্রগতিশীল আর লেখাপড়া না জানা মৌলবাদীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে। নানাবিধ জীবনবোধ, নির্জনধ্যান, জীবনদর্শন থেকে সাম্প্রতিক এই কবিতার দুর্দিনে পুরানো গ্রন্থটি পুনরায় পাঠক দরবারে। উদ্দেশ্য, এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, কুসংস্কারপনা থেকে আধুনিকমনস্ক জীবনের অগ্রযাত্রায়, আল্লাহর সাথে আশরাফুল মাখলুকাতের নানাবিধ সংলাপ উদ্ধার। এ প্রজন্মের তরুণ চোখে বিষয়টির দৃষ্টিভঙ্গিতাও মুখ্য ব্যাপার।

প্রথমেই 'উৎসর্গ পদ্যে'র শরণাপন্ন হওয়া যাক। নিজেকে কমিউনিস্ট ঘোষণা দিয়ে একজন ফরহাদ মজহার আল্লাহর সাথে দ্বন্দ্বে-জিজ্ঞাসায়-প্রশ্নে-তর্কে লিপ্ত হন। 'মোমিন

www.pathagar.com

ও বুর্জোয়া জোড়ে চলে বগলে বগলে'– এই পংক্তির মাঝে ইসলামের ইসলামী শব্দ 'মোমিন' ও কার্ল মার্কস প্রণীত 'কমিউনিজমের শব্দ বুর্জোয়া পাশাপাশি অবস্থান দিয়ে কবি দু'টি মতবাদের চরম লোভাতুর, অজ্ঞতা, লোভ বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'বিশ্বাস ও বুদ্ধির' সংঘাত কবি উল্লেখ করেছেন। বিশ্বাস নিজের সত্তার বিষয়, মনভালোগত বিষয়। যা একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আত্মোপলব্ধির চৈতন্যে ধারণকৃত চেতনা। আর বুদ্ধির ব্যাপার নিজের মস্তিষ্কে ধারণক্ষমতার দৃঢ়তা। একজন চৌকস, ধী-সম্পন্ন মুসলমান নিজ সত্তার সাথে বোঝাপড়া করে সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজেকে হাজির করেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমান শরীয়া অনুসরণ করেন না বুঝেই, না পড়েই, অনেক সময় শুনে-শুনে। তাদের কাছে 'এবাদতনামা' নাস্তিক্যের দলিল সদৃশ।

'উৎসর্গপদ্য' থেকে ঃ

'ভণ্ডামি করি নাই; জনগণ নিজের নৌকায়,

তুলিবার ভাঁওতায় মসজিদে নামাজ পড়ি না।

এখানে দু'টি বিষয়ে উল্লেখ। যেহেতু কবি স্বঘোষিত কমিউনিস্ট অর্থাৎ বিপ্লবী তাই নামাজে পা-বন্দি হয়ে আল্লার দীদার লাভ করতে চান না। এবং ভবিষ্যতেও এ কাজ কবি দ্বারা হবে না। আবার নামাজ যে ব্যক্তি নিয়মিত চর্চা করে ইসলাম ধর্ম, তাঁকে মোমিন, নামাজি এসবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদেশে মানুষ নামাজের মুসল্লি সেজে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে নিরীহ, বোকা সাধারণ মুসলমান থেকে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রণিধানযোগ্য। এদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি বড় পুঁজি। ধর্মের লেবাস ধারণ করে সাধারণ জনগণকে সহজে ধোঁকা দেয়া। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, নাম-দস্তখত পণ্ডিতের সংখ্যাই বেশি। কবি সেই ভণ্ডামিতে যেতে চান না আল্লাহর সাথে। বিপ্লবী হওয়ার কারণে আল্লার সাথে ধান্ধাবাজি, লুকোচুরি, ইহলৌকিক অবৈধ সুখের পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে অনিচ্ছুক তাই আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ও বুদ্ধির নিমিত্তে তিনি মসজিদে যান না; কিন্তু বুদ্ধিকে ক্রীতদাস বানিয়ে আল্লাহ্‌কে মহাব্বত করেন। যাঁর জন্য দুনিয়াবী কোনো দরবারে হাজির হন না। কিন্তু মনের মদিরায় সংগোপনে উঁকি মারে যদি প্রকৃত মোমিন মুসলমান এই গ্রন্থটি পড়েন তাহলে হয়ত কবির জন্য প্রাণভরে দোয়া করবেন। এদেশে সে ধরনের মুসলমান আছে কতজন?

এবাদতনামা-১-এ কবির সুন্দর পূজার দিক উন্মোচিত হয়েছে টগর ফুলের পাপড়িগুলোকে আল্লাহর পবিত্র নিরানব্বই নাম স্মরণে তস্‌বিহ'র মত জপ্‌তে চান কবি। আল্লার নাম অতি সুন্দর আর সুন্দর বন্দনাই মানব মনের একান্ত ব্যক্তিগত অভিলাষ। কবি কল্পনার জাল এমনভাবে বুনতে চান যেন বা আল্লার নাম তস্‌বি দানার মতো

www.pathagar.com

অসংখ্যবার উচ্চারণ করলে এই পৃথিবীতে হত্যা, খুন, সন্ত্রাস, পরশ্রীকতারতা, অসূয়াবৃত্তি, বন্ধ হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। এখানে আমরা কবি ফরহাদ মজহারের কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাই না। বিপ্লব কথাটির আভিধানিক ব্যাখ্যা 'উৎসর্গপদ্য' পরবর্তী 'এবাদতনামা : ১'-এ এসে ইসলামের ধর্মগুরু হজরত মুহম্মদ (দ:)-এর মানবতামুখী ধাবিত। এক্ষেত্রে আমরা লেনিনের 'ধর্মগ্রন্থ' গ্রন্থে তাকালে দেখি লেখা আছে, 'The Marxist must be a muterialist, J.e an enemy of Religion' (Religion by lenin. p-21) অর্থাৎ মার্কসবাদী হতে হলে তাকে জড়বাদী হতেই হবে, অর্থাৎ তাকে হতে হবে ধর্মের শত্রু। এক্ষেত্রে পরিষ্কার হওয়া যায় ফরহাদ মজহার নিজেকে মার্কসবাদী কিংবা কমিউনিস্ট যেভাবেই প্রথমে 'উৎসর্গ পদ্যে' নিজেকে ঘোষণা দিয়ে যাক না আসলে তিনি চিন্তা বিপ্লবী এবং ইসলামী বাম। তাঁর চিন্তায় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতত্ত্ব সর্বদা নাড়া দেয়। তাই ফুলকে সাক্ষী মানেন :

'রোজহাশরের দিন তুই তবে সাক্ষ্য দিস ফুল
সুন্দরের এবাদতে কেটে যায় কবির জিন্দেগী।'

[বলি ও টগর ফুল]

দ্বিতীয় এবাদতনামা- 'বৃক্ষতলে চোর কিংবা বাদাম ভিখারী'। এখানে কবির দৃষ্টি ভঙিমার গভীরতা আঁচ করা যায়। রমজান মাসে শেষ দশদিন মসজিদে মসজিদে মুসল্লিরা এহ্তেকাফ করে থাকেন। পূর্ববর্তী জিন্দেগীর তামাম গুনাহ্ মাফ করার আল্লাহ্ প্রদত্ত সিলসিলা। কবি এই প্রেক্ষাপট টেনে এনেছেন দ্বিতীয় চতুর্দশপদীতে। 'কাঠবিড়ালীকে আমি মাঝে মধ্যে এহ্তেকাফে দেখি মহাবোধিবৃক্ষ তলে'। প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দ প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। সমাজের বুর্জোয়া মুসলমান শ্রেণী সারাবছর অন্যায়-অবিচার-জুলুম-বে-ইনসাফ পূর্ণ কাজ-কারবার করে। অথচ পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ প্রেমে এমন দিওয়ানা হয়ে যায়, ফলত শেষ দশদিন- এহ্তেকাফ ধ্যানে বসে যায় মহাবোধিবৃক্ষ তলেস্বরূপ মসজিদে। সারাবছরে পাপ-তাপ নিশ্চিহ্ন করার মানসিক বাসনায় ধনিক শ্রেণীর এই কাঠবিড়ালীর ধ্যান-তপস্যা আসলে লোক দেখানো, অন্তঃসারশূন্য, ফাঁপা। এই মহৎকার্যে কুটিল অন্তর কখনো আল্লার দীদার পায় না। আর মাসুম বিড়ালরূপী মোমিন বান্দা ধন-সম্পদ সামাজিক ঐশ্বর্য-আভিজাত্য এসব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবাদতের শেকড়ে নিজ আত্মা গ্রথিত করেন। মোমিনের এবাদত দুনিয়াবী জিন্দেগীর জন্য লালায়িত নয়; বরং এক অমর প্রত্যাশা করে তাঁর পরলৌকিক জীবনের জন্য। পক্ষান্তরে কাঠবিড়ালীর পার্থিব ধন-সম্পদের আশায় বোধিবৃক্ষতলে উপস্থিত। কবি চমৎকার উপমায় এ দৃশ্য বর্ণনা করেছেন!

'তবু কাঠবিড়ালীর হুঁশ নেই বাদামের প্রতি

www.pathagar.com

কণামাত্র কোন লোভ তার তথাগত তবিয়তে

লক্ষণীয় নয়। ঘাস আর বৃক্ষে-বৃক্ষে তার

আধ্যাত্মিকতা ব্যাপ্ত; এই দৃশ্যে কে আমি, কোথায়?

[বৃক্ষতলে চোর কিংবা বাদাম ভিখারী]

এই কবির খেদোক্তি শেষ দু'পংক্তিতে। তিনি তথাকথিত ধার্মিক লেবাসধারী চতুর মুসলমানদের এহ্‌তেকাফের বিড়াল বানিয়েছেন। এ পর্যন্ত পাঠে মনে হয় কোন ধর্মপ্রচার ধর্মের এহেন মুখোশ পরা দুর্দিনে ধর্মব্যবসায়ীদের মৃদু শাসন করছেন বুদ্ধিবৃত্তিক সুরে। কিন্তু একজন কবি, তাঁর কবিত্ব স্বভাব নিয়ে যখন পাঠক দরবারে নিজেকে মেলে ধরেন তখন আসল স্বরূপ প্রকাশ পায়। কবিরা ধর্মপ্রচার নয় আবার ধর্মকে পুঁজি করে সমাজ-সংসারে ফায়দা লুঠতে পারেন না। প্রকৃত কাব্যসত্তা সৃষ্টির মাঝেই খুঁজে পান আপন রূপ, বিষয়, বৈভব, যশ, ঐশ্বর্য কবি কণ্ঠে ঘোষিত হয় ঃ

'না, আমি কামেল নই, নই এহ্‌তেকাফের বিড়াল

আমি কবি : বৃক্ষতলে চোর কিংবা বাদাম ভিখারী।' (ঐ)

এবাদতনামা ঃ ৩ 'সকল প্রশংসা তাঁর'ঃ এই গ্রন্থের এই কাব্যে পরমসত্তার সাথে উত্তেজক বাক্যের প্রশ্নে কবি জানতে চান প্রশংসা যদি একমাত্র প্রাপ্য হয় এবং নিন্দা, অপরাধের শাস্তি মানুষের পেতে হয় তাহলে এ কেমন ইনসাফ। কবির আক্ষেপ, ক্ষোভ সৃষ্টিকর্তার প্রতি, এ কেমনতর বিচার যেখানে সৃষ্টিকর্তার পথে চলে পুরস্কার জান্নাত আর বেপথু হলেই দোযখ। এক ধরনের হুমকি, ভয় দেখিয়ে এই রাজকার্য চালানো কবির পছন্দ নয়। এখানে কবির মাঝে বুনো ষাড়ের বিদ্রোহ কাজ করেছে। কবির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সত্তার উস্কানিতে এই কাজ করেছেন। সুবেহ্ সাদেক থেকে রাত পর্যন্ত মানুষ কর্মের পাশাপাশি ধর্মচর্চা করে। কবি এই কথাটি আল্লাহর সাথে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। যদি সে কদাচিৎ ভল করেই থাকে তাহলে শাস্তি কেন?

এবাদতনামা ঃ ৪- 'নয়াঅভ্যুদয়'ঃ কবি একজন বাংলাদেশী নাগরিক। কাব্যচর্চা মেধা বিকাশ, উন্মেষ, চিন্তাশক্তির প্রখরতা কবির এদেশ থেকেই উত্থিত। কবি ঘোষণা দেন :

'দাও বাক্য, বলো 'হও' আমি জন্মদান করি প্রাণ

বঙ্গোপসাগরে- করি বালি-নুন-শঙ্খ-কাদা-তীরে'

[নয়াঅভ্যুদয়]

নতুন এক ইশতেহার কবি ঘোষণা করতে চান। এদেশের সাধারণ মানুষের মনোবিকাশ, মানবচৈতন্যের সৌকর্যসাধন করতে চান তিনি তাঁর তলিকায়। তিনি অকপটে বলে

www.pathagar.com

বসেন তিনি মোঘল নন, তুর্কী নন, দ্রাবিড় নন, ব্রাহ্মণ নন, আর্য নন কিংবা মৌলবীর সন্তানও তিনি নন। তাহলে কবি কে? এ প্রশ্ন পাঠকের অন্তরে দানা বাঁধার পূর্বেই কবি জানান দেন, তিনি মাটির অন্তরে এ ভূমণ্ডলে নয়াঅভ্যুদয়ে এক মানব। যাঁকে তাঁর আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রক্কালে আমলকি সৃষ্টির মাজেজা দিয়েছলেন।

এবাদতনামা : ৫- রূহ ও নফসের দ্বন্দ্ব : এইখানে কবির বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা জাগ্রত হয়েছে। সাধারণ অস্তিবাদী মানুষ রূহ ও নফসের বিষয়ে মাথা ঘামান না। প্রথাগত ধর্মানুসারীদের নিঃশর্ত নিবেদনই একমাত্র লক্ষ্যপথ। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক জ্ঞান কবির কাছে এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব হলো গতিময়তা ও পরিবর্তনের দ্যোতক। দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে কোন অস্তিত্বই সম্ভব নয়। ইতি নেতি বা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে গতিশীল হয়। দার্শনিক হেগেলের কথা আমরা স্মরণ করি ঃ 'আমাদের চিন্তাই যে, কেবল অস্তিনাস্তি এবং নাস্তির, নাস্তিত্বের মাধ্যমে নতুনতর অস্তির উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয় তাই নয় চরম সত্তাও অনুরূপ অস্তি ও নাস্তির দ্বন্দের মাধ্যমে নিজের সত্তাকে সৃষ্টি করে চলে' এ কবিতায় প্রথম প্রশ্ন মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষকে সকল মানবীয় গুণাবলী দিলেন সঙ্গে দিলেন স্বাদ নিরূপণের জন্য জিহ্বা। কিন্তু মহান স্রষ্টা এই বাকযন্ত্র দিয়ে সর্বদা নিজের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। এখানেই কবির সাথে স্রষ্টার প্রাথমিক দ্বন্দ্ব। সৃষ্টি যখন করলেই তখন হামেশা এবাদত করতে হবে এমন কঠোর কর্মসূচি কেন দিলে? মানুষের মন, মেজাজ সবসময় ভালো থাকে না। মন ভালো না থাকলে তখন এবাদত কেমনে হবে? কবি আরও আক্ষেপ করে বললেন, তুমি তো ইচ্ছা করলে জিহ্বার ন্যায় ছহি গ্রামোফোন বানাতে পারতে। সেই গ্রামোফোন মেশিন দিয়ে অনবরত আরবীতে তোমার রেকর্ড বাজত। কিন্তু তুমি আল্লা তা না করে রক্ত-মাংসের মাটির শরীর বানালে। রূহ দিলে, নফস দিলে। কিন্তু সুন্দরের পূজারী কবিদের স্বভাব-চরিত্র বানালে বেয়াদব মার্কা। এখন কবিরা বেয়াদবী করলে আল্লাহ ক্ষেপ কেন? প্রিয় নবীজী (দ:) কবিদের সমর্থনে বলেছিলেন, 'কবিতা জ্ঞানের ভাণ্ডার'। সেই জ্ঞান যাঁরা পয়দা করছে তাদের বেয়াদবী কসুর করা হবে কি? কবি এখানে স্বাধীনসত্তার রূহকে নিয়ে ইচ্ছামত সুন্দরের জয়গান গাইতে চান। অজ্ঞ মানুষ যেমন আলেমের নিকট তর্ক-বিতর্ক করে প্রকৃত পথের হদিশ জানতে চায় কবি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সাথে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত। জানার আশায়। পাবার আশায়। সনদপত্র।

এবাদতনামা : ৬- দুনিয়া রেজিস্ট্রি কর ঃ ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ তামাশা, ঠাট্টা বন্ধুর সাথে করা যায়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে ব্যঙ্গ করা এক ধরনের পাগলামি। কিন্তু ফরহাদ মজহার পাগল নন। স্বঘোষিত কমিউনিস্ট। যেহেতু একজন বিপ্লবী কমরেড বা সাহাবী তাই এখানে তাঁর মাঝে শ্রেণীগত চেতনার সূক্ষ্মদৃষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়। দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। অথচ জমিদখল, চরদখল হয়ে যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর চোখ ইশারায়।

ধরো আমাদের গ্রামে আলহাজ্ব ছামাদ মৌলবী

www.pathagar.com

তিনি খোদ নিজ নামে বাহাত্তর বিঘা হালটের
জমির মালিক, তেতাল্লিশ চেয়ারম্যান, ষাটবিঘা
রশিদ কন্ট্রাক্টর, ইটের ভাটার ছরু মিয়া
চৌদ্দবিঘা বিশ ডেসিমাল, বাকি থাকে ছমিরুদ্দি
চন্দনের বাপ, হারাধন– প্রত্যেকেই কমবেশি প্রভু
মালিক এ জমিনের– প্রত্যেকেই তোমার শরিক
তোমার শরিক নাই এ কথা তবে কি বোগাস?

এদের দলিল যদি মিথ্যা হয় যাও আদালতে
উকিল ধরিয়া কর দুনিয়া রেজিস্ট্রি নিজ নামে।

[দুনিয়া রেজিস্ট্রি কর]

একজন বিপ্লবী সাহাবী নিজের অনুভূতি আল্লাহর কাছে জানাচ্ছেন অতি কর্কশ ভাষায় নালিশী ভঙিমায়। আল্লাহর কোন শরিক নেই। তিনি একক। অদ্বিতীয় ও মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাব আল-কোরআনে স্ব-মহিমা এভাবেই প্রকাশ করেছেন আল্লাহ্। আর ফরহাদ মজহার আল্লাহকে প্রশ্ন করেছেন ঐ জায়গাতেই। এ দুনিয়া তোমার একথা মানি, স্বীকার করি; কিন্তু তোমার দুনিয়ায় মহাজনী কারবার, জমিদখল এসব কেন? সুশীল সমাজ গঠন হচ্ছে না কেন? জমির ভাগ-বণ্টনে ইনসাফ নেই কেন? শ্রেণীগত এত প্রভেদ কেন? এইখানেই ফরহাদ মজহারের আস্তিকতার শেকড় খুঁজে পাওয়া যায়। স্বঘোষিত কমিউনিস্ট বুলি কপচায়ে সমাজতন্ত্রের পতনে নিজে হয়ে যান দিশেহারা। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। কিন্তু অরাজকতাপূর্ণ সমাজের পরিস্থিতি দেখে বাম চেতনা রক্তে আগুন ধরায়। আর তখনই হয়ে যান ইসলামী বাম। ইসলামী বামপন্থিরা মার্কসবাদী হয়েও মার্কসীয় তত্ত্ব গ্রহণ না করে মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সমাজ ব্যবস্থায় আস্থা ফিরে পান, কারণ এখানে শ্রেণীগত কোনো বৈষম্য নেই, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়। হাবশী গোলামও হতে পারে, রাষ্ট্র নেতা। আর তাই ইসলামে এলেও জমিনের ভাগ-বাটোয়ারা। সর্বদা আল্লাহর গোলামিতে একজন কবির মন চায় না। আর তাই একজন কবি চায় মুক্ত আকাশ। অরণ্য। শুদ্ধ বাতাস। দুনিয়াতে মানুষের এহেন মাতব্বরি (অমুক জমি আমার, তমুক জমি আমার) এতসব হম্বিতম্বিতে কবি শরণাপন্ন হন সৃষ্টিকর্তার দরবারে। তুমিই যদি প্রকৃত মালিক তবে এই সকল নকল মালিক কারা? এদের অপসারণ করে তোমার সম্পত্তি তুমি উদ্ধার কর। এখানে আল্লাহর শক্তিমত্তা কবি

www.pathagar.com

স্বচোক্ষে দেখার বাসনায় দুনিয়াবী এই অসম পরিস্থিতির মোকাবিলায় আল্লাহর কাছেই কবির দরখাস্ত।

এবাদতনামা : ৭- কলিজার ছায়া ঃ এখানে ইসলামের ধর্মগুরু মুহাম্মদ (দ:)-এর ইসলাম প্রচারের দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন কবি। আইয়্যামে জাহেলিয়াত যুগে মানুষের চরিত্র ছিল পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, এতে কোনো অনুশোচনা ছিল না, ছিল তৃপ্তি। আবার সামান্য কথা কাটাকাটিতেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যেত এবং তা চলত বছরের পর বছর পর। এই অবস্থায় মহানবীর প্রচারকার্য কত কষ্টের, কত ত্যাগের, কত মহিমান্বিত তারই এক দলিল এই কবিতা।

দুনিয়ায় দুঃখ আছে তবু তুমি সুখের সন্ধানে
কলিজা তালুতে রাখি ঘুরিতেছ খ্যাপা মুসাফির
শহরে-বন্দরে-গ্রামে-ইস্টিশানে-মন্দিরে-মসজিদে-
বাজারে ও নিরজনে। নির্বিকার নির্দয় কণ্টক
চরণে ও প্রাণে বাজে। তুমি তবু নিজের তৌহিদ
পর্বতশৃঙ্গার মতো খাড়া রাখি মাংসের বেদনা
হামেশাই সহ্য করে। গোড়ালি বিদীর্ণ করি খুন
ঝরিতেছে। তবুও আঁখির নূরে দৃষ্টির হায়াত
মহাকাল হয়ে জ্বলে– বেদিশায় ঘুরিছ ফকির।

[কলিজার ছায়া]

এবাদতনামা : ৮- সিধা কানেকশন ঃ ধর্মকে পুঁজি করে এদেশে যে ব্যবসা চলে কবি তাঁর বিরুদ্ধে। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত অক্ষরজ্ঞান জানলেওয়ালা কতিপয় আলেম (?) তাঁদের ভাসা-ভাসা বুদ্ধির জোরে ধর্মকে বানায় এক অসম্ভব কল্পনা ফানুস। অথচ মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম সর্বদা বিজ্ঞানময় তথাকথিত মৌলবাদী গোষ্ঠীর ধর্মচিন্তা আর কবির মৌল চিন্তার পার্থক্য বিশাল। কবি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করত ধর্মজ্ঞান আহরণ করে আল্লাহর সাথে সরাসরি এন্টেনা কানেকশন স্থাপন করেন। অক্ষর খুঁটে খাওয়া মৌলানার মত নয়, একজন প্রগতি চেতনার চেরাগ জ্বালানো মৌলবীর মতোন ফরহাদ মজহার তাঁর তত্ত্ব এভাবে বয়ান করেছেন ঃ

.....ধর্ম মানে ধর্মগ্রন্থ নয়
ধর্ম মানে সম্ভাবনা, ধর্ম মানে নিহিত প্রতিভা

www.pathagar.com

ধর্ম মানে প্রেম, জ্ঞান, মেধা ও নির্মাণ

তদুপরি ইতিহাস : মানুষের ক্রমে ক্রমান্বয়ে

মাংসের চেতনা থেকে বয়স্ক বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠা।

প্রাপ্ত বয়স্ক ধর্ম ব্যক্ত হয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানে

তবুও ধর্মের পেশা স্থায়ী রাখে অক্ষরের কীট।

[সিধা কানেকশন]

শেষ পংক্তি কবির বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পেশ করে। কারণ ধর্মের শোভন দিক অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মৌলবীর উদ্ধার সম্ভব নয়। যেমন একটি হাদীসে রসুল (সঃ) বয়ান করেছেন : 'পানি পান করার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ধীরে-ধীরে পান কর'। এ বাক্যের ব্যাখ্যা স্বল্পজ্ঞান বিজ্ঞানবিমুখ মৌলবী কেমনে উদ্ধার করবে। এটি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক হাদীস। যেমন : নিঃশ্বাসে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Co_2)। আর পানির সংকেত (H_2O) দুটো বিক্রিয়া করলে দাঁড়ায় ($Co_2+H_20--H_3Co_3$ অর্থাৎ বাই-কার্বনিক এসিড। মানুষের পেটে পরিমাণমত কার্বনিক এসিড সর্বদা বিদ্যমান। এক্ষণে এক গ্লাস পানি যদি পুরোটাই এসিডে পরিণত হয় তাহলে পেটে এসিডিটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই নবী এভাবে নিষেধ করেছেন পান করতে। এই বিজ্ঞানময় যুক্তি অক্ষরজ্ঞান মৌলবী কেমনে উদ্ধার করবে? কারণ সে তো ব-কলম। তাই কবি চান ধর্মের পেশা প্রকৃত শিক্ষিতজনের নেয়া উচিত তাহলে ধর্মের মাঝে এত হানাহানি, এত ফতোয়া, এত গোঁড়ামি, অন্ধকূপমণ্ডতা দূর হয়ে যেত। এই কবিতায় আমরা কবি ফরহাদ মজহারকে পাই না, আমরা পাই বিজ্ঞ মৌলবী ফরহাদ মজহারকে, যিনি তাঁর স্রষ্টার কাছে অযোগ্য, মূর্খ আলেমদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছেন।

এবাদতনামা : ৯- কাদা দিয়ে দাগা দেব ঃ কবি ফরহাদ মজহার এবাদতনামা লেখার পূর্বে মুহম্মদ (সঃ) মক্কী ও মাদানী জীবন এমনভাবে অধ্যয়ন করেছেন যাতে তাঁর চতুর্দ্দশপদীতে অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁর বর্ণবিন্যাস করতে সক্ষম হন। মসজিদে নববীর Histrical Background পাঠের পর আমি কাদা দিয়ে দাগ দেব-এর মর্ম উদ্ধার-এ সক্ষম হন। রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযান পর্ব মাইকেল আদ্যোপান্ত মানসফ্রেমে বন্দী করতে পেরেছিলেন বিধায় 'মেঘনাদবধ' কাব্য আজ আমাদের সুখপাঠ্য এবং এপিক হিসেবে। বাংলা কবিতার সাম্রাজ্যে সমাদৃত। মসজিদে নববী জন্মের লগ্নে মুহম্মদ (সঃ) শ্রমিক শ্রেণীর যে সাম্যবাণ উদাহরণ দেখিয়েছেন তা এ বিশ্বে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন একবার কাঠের গুঁড়িতে কিছু সময় হাত লাগিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রইলেন আর দিনের পর দিন শ্রমিক হয়ে শ্রমের দুর্লভ মর্যাদাদান করলেন বিশ্বনবী। হতবাক হয়ে যেতে হয়, কাব্য রচনায় ইতিহাসকে এভাবে মাত্র চৌদ্দ

www.pathagar.com

পংক্তিতে কেমন করে একজন কবি বাঁধতে পারেন। তৎকালীন মসজিদে নববীর মেঝে ছিল মাটির। ছাদ ছিলো খেজুরের ডালপালায় আচ্ছাদিত। বৃষ্টি হলে মেঝে কাদাময় হয়ে যেত। রসুলে করীম (দঃ) সিজদা দিলে কপালে কাদা লেগে যেত। এ ঘটনার কাব্যরূপ দান করেন ফরহাদ মজহার।

এশেকে মজেছি– তুমি চাষীর স্বরূপে আছো

আমি স্রেফ কাদা হবো পদযুগে হবো স্বর্ণরেণু

মসজিদে মুসল্লিরা যখন সিজদা দেবে ভূঁয়ে

আঠালো চাষের কাদা তাদের কপালে দিবে দাগ।

[কাদা দিয়ে দাগ দেব]

এবাদতনামা-১০ : সহিসালামতে আছে সবার ভণ্ডামি ঃ একজন আশেক, মাশেক, ওলী সর্বদা সৃষ্টিকর্তার সাথে তর্ক করে মহব্বতে, কবি একজন বাঙালি মুসলমান। মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষায় ইমাম গ্রুপ খুব একটা খুৎবা দেন না বা দিতে পারেন না। তাই দেখা যায়, মসজিদে জুমআ'র খুৎবার সময় পেছনে মুসল্লিরা হাসি-তামাশা করে কিংবা মনোযোগ নেই, এর কারণ যে ভাষা বোঝে না সে ভাষার আদেশবাক্য কেমনে হৃদয়ে ভয় জাগাবে? তাই কবি এখানে অকপটে বলেন, তুমি আলিমুল গায়েব, তুমি সব জানো, তাহলে শুধু আরবি ভাষায় ডাকলেই তুমি শুনবে এটা মানি না। অথচ অজ্ঞ ইমাম একথা বলেই চিল্লায়। নামাজের সময় গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে সাধারণ নামাজীদের কোনো চৈতন্যোদয় ঘটে না। অথচ সামান্য ব্যাপারেই ফতোয়া জারি করা কতক ইমামের নিকট Simple ব্যাপার। তাই কবি আক্ষেপ করেন আল্লাহর নিকট, মসজিদে ইমামদের ভণ্ডামি, অথচ নামাজে সহিসালামতে তেলাওয়াত এ কেমন শোকরগুজার?

এবাদতনামা ১১ ঃ মজেছি নিজের মোহে ঃ মানুষ, মনুষ্যত্ব, ঈমান, বিবেক এসব চতুরঙ্গ বিষয় নিয়ে কবি হাজির পাক দরবারে। মানুষকে সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে পয়দাই করলে তবে মনুষ্য মস্তিষ্কের নিউরোনে কেন ইবলিশের অবাধ যাতায়াতের ভিসা দিলে? চেতনার সাথে ধীমান জ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতা আসলে ফরহাদ মজহারকে দাঁড় করিয়ে দেয় আস্তিকতার আয়নায়। পাঁচওয়াক্ত নামাজের বিষয়ে তিনি তর্ক করেন। ঈমান আছে কিন্তু এ কেমন অভিলাষ, জাগতিক বিষয়াদি জানতে হবে আবার দিনে পাঁচবার অবশ্যই হাজিরা খাতায় নাম লেখাতে হবে?

এবাদতনামা ঃ ১২- বাংলা তোমার নয় ঃ পৃথিবীতে বাংলাদেশই সম্ভবত একমাত্র দেশ যাঁরা মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত কালো পথে ঢেলে দিয়েছে। তাবৎ বাঙালি সমাজের এ এক গর্বের ধন। কবি এই কবিতায় অপূর্ব এক বাক্‌কৌতুকে হাজির হয়েছেন

www.pathagar.com

প্রভু দরবারে। তিনি বাংলা ভাষায় ঈমান ও আকিদায় অটল থেকে জান্নাতি আতাফল খাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি আল্লাহকে বলেন, আমি খুশি, বাংলাভাষা তোমার ভাষা নয়, তাহলে ডাঁট বেড়ে যেত তোমার। এখানে স্বদেশ, মাতৃভাষার এক প্রগাঢ় টান অনুভব করা যায়।

এবাদতনামা ঃ ১৩- সব ধর্মে এককথা ঃ সর্ব ধর্ম যদি অহিংসা পরম ধর্ম প্রচার করে তাহলে দুনিয়াতে এত ধর্মের দরকার কি? সত্য-মিথ্যা তুমি ভালো বোঝো। সবাই (মুসলমান-ক্রিশ্চান-বৌদ্ধ-হিন্দু) তোমাকে ডাকে। কেন এত ভেদাভেদ, প্রভেদ, আইন করে রেখেছো। বস্তুত এ কবিতায় চিন্তাশীলদের চিন্তার খোরাক জোগানো হয়। মতবাদ মতবাদ করে পৃথিবীর তাবৎ বিদ্বানরা যেভাবে মানুষকে গোত্রে গোত্রে আলাদা করে দিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার নির্মম প্রহারে মসজিদ ধ্বংস, মৌলবাদীতার উগ্র তাণ্ডবে মুসলীম সভ্যতা বাক্‌রুদ্ধ, মিশনারীদের ধর্মব্যবসা এসব খেলা কেন থামাচ্ছে না আল্লাহ তাই জিজ্ঞাস্য-

'অবিলম্বে খেলা তবে থামাও নিষ্ঠুর

খেলোয়াড় না রহিলে দুনিয়া নিজেই ঠিক রবে।'

[সবধর্মে এক কথা]

এবাদতনামা-১৪ : কাঁধে করে ঘুরিফিরি ঃ ইসলাম ধর্মমতে মুনকার, নকীর নামীয় দু'ফেরেশতা মানুষের আমলনামা লিখছে। কিন্তু একজন কবি চিরটাকাল একা পথ চলেন। ধ্যান, আরাধনা, এবাদত সর্বত্র করি বড্ড একা, নিঃসঙ্গ। এক্ষেত্রে কবির এ কাজের সাক্ষী যদি দু'জন নূরের ফেরেশতা হন তবে কবির জন্য বড্ড মুসিতব। তাই কবি বলেন, আমি শিল্পের স্রষ্টা। আমার কাজের ভালো-মন্দ তোমার ফেরেশতা কেমনে বুঝবে। আমার ঘাড়ে বসে এ কেমন বোঝা সৃষ্টি প্রভু? হাশরের মাঠে ঐ ফেরেশতাদ্বয় যদি উল্টাপাল্টা সাক্ষ্য দেয় তবে কি তুমি আমাকে দোযখে দেবে। কবিকে এ শাস্তি দেয়া কি ঠিক?

এবাদতনামা : ১৫- স্বেচ্ছায় সিজ্‌দা চাও ঃ নামাজের সিজদা লোক দেখানো। কবির ধ্যান নফ্‌স টু আরশে মহল্লা ডাইরেক্ট। তাই এ সমাজের নামাজের ব্যায়াম চর্চায় কবির অনাগ্রহণ। স্বাধীন সিজ্‌দা কবি দিতে চান।

এবাদতনামা : ১৬- ঈমান বা রেনে দেকার্তের জ্যামিতি ঃ এক কঠিন বিষয় যা বাস্তবে উপস্থিত তা লোকচক্ষুর সামনে মেলে ধরেছেন ফরহাদ মজহার। বস্তুবাদ আর ভোগবাদী সমাজে ইসলামের একত্ব নিয়ে তথাকথিত নাস্তিক ভণ্ডদের যে বোলচাল তাঁর বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ। ইসলাম ধর্মমতে শিরককারীকে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করেন না। অথচ

www.pathagar.com

এ কাজটিই বৈষয়িক বিশ্বে অহরহ হচ্ছে। একান্ত নিজস্ব বিশ্বাসী ফরহাদ মজহার তথাকথিত ইমাম যাঁরা না বুঝেই ফতোয়া দেন তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছেন।

এবাদতনামা : ১৭- 'ফুরসত কোথায়?'ঃ সৃষ্টিকর্তার সাথে কবি আলাপ করছেন এ সনেটে। দুনিয়ায় এত কাজের চাপ, তাই সৃষ্টিকর্তাকে ডাকার সময় পাওয়া যায় না। অথচ ফেরেশতাকুলের কোনো কাজ নেই। দিন-রাত আল্লার এবাদত করা ছাড়া। অথচ মানবের যৎসামান্য এবাদত কেন তুমি শোকর করো না। প্রশ্নের এই ধরনে কবির মাঝে এক ধরনের সূক্ষ্ম চালাকি দেখা যায়। আল্লাকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয় যে, ফেরেশতারা সারাক্ষণ তোমার এবাদতে মশগুল, তাঁরা দুনিয়ার সভ্যতা গড়তে পারবে কি? সভ্যতা গড়তে পারলেও তখন এত পরিশ্রমের পর এবাদত করতে সময় ও ধৈর্য পাবে কি; কিংবা আলস্য তাঁকে একাজে কতটুকু সহায়তা করবে। এক ধরনের কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা আল্লাহর সাথে করেছেন ফরহাদ মজহার।

এবাদতনামা : ১৮- আল্লার কালাম ঃ উপমা আর বর্ণনার বাচনভঙ্গিমা একটি কবিতাকে কতোখানি উজ্জ্বল করে তোলে 'আল্লার কালাম' তার দৃষ্টান্ত। কবিতাটিতে অন্তর্নিহিত গুঢ়ভাব প্রকাশ পায়। হরিণশাবকের মূল খাদ্য মাতৃস্তন আর মূল ঠিকানা মাতৃআবাস। ঝরণা পানি তার শিক্ষাকেন্দ্র।

www.pathagar.com

কবিতার জন্য জীবন

প্রাককথন ঃ একজন কবিকে চিরটাকাল একা পথ চলতে হয়। তার এই পথচলার পেছনে কোনো বন্ধু কখনো সাহায্য করে না। কবির এই একা পথ চলার পেছনে কখনো কোনো কাব্যবন্ধু তাকে সাহায্য করেনি। কবিকে কবিতার জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করতে হয়। কবিকে আশ্চর্য এক সচেতন ঘোরের মাঝে কাটাতে হয়। কবি সারাজীবন কখনো এক ভাষায় এক স্বরে কবিতা লেখেন না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব মৌলিক বস্তুতে কবি বিচরণ করেন আপন শক্তি দিয়ে, আপন মেধা দিয়ে। এভাবেই একজন কবিকালের চৌকাঠ ডিঙিয়ে মহাকালের পথে এগিয়ে যান। সত্যের পথে একজন কবি এমনভাবে এগিয়ে যান, যেনো যুদ্ধবাজ একজন সেনাপতি। এ যুদ্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য নিজের করে পাবার যুদ্ধ, পৃথিবীর সব বর্ণিল রঙ নিজের আয়ত্তে আনার যুদ্ধ, যা কিছু সুন্দর যা কিছু কমনীয়-মোহনীয় সব কবি উপলব্ধি করেন একান্ত নিজের মতো করে। দৃশ্যমান জগৎ থেকে যে কাব্য জগতের আলাদা রাস্তা শুরু সেই চিত্তাকর্ষক পথে কবির আনাগোনা। পরমসত্য ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই-ই কবির হিরণ্যগর্ভ থেকে উৎসারিত। সর্বশেষ কথা, একজন কবি আমাদের বাহ্য জগতে, আশ্চর্য এক মোহময় জগতে আটকে রাখেন। কখনো এই ভাষা হয় বিদ্রোহের, কখনো প্রেমের, কখনো হতাশার আবার কখনো আদর্শের।

নাসির আহমেদ। আমাদের এই বাংলা সাহিত্যে সত্তর দশকের একজন কবি। কবিতায় নাসির আহমেদের আগ্রহ প্রবল, অভিনিবেশ প্রগাঢ়। একথা বললে আজ বেশি বলা হবে না বোধহয়, সমকালীন আধুনিকতার মানদণ্ডে নাসির আহমেদ আধুনিক এক কবি হলেও তার চিন্তা-চেতনার একান্ত রূপটি আসলে আমাদের বাংলা কবিতার উত্তর-আধুনিকতার মগ্ন চৈতন্যেরই বহিঃপ্রকাশ। স্নেহ-সারল্য, অবসাদ-আনন্দ, ব্যক্তিক অনুভবের একতারা হাতে নাসির আহমেদ প্রায়ই গেয়ে ওঠেন জীবনের জন্য জীবনমুখী এক উত্তর-আধুনিক

www.pathagar.com

ভাওয়াইয়া। নাসির আহমেদের কবিতা অনুধাবন করতে হলে আমাদের খুব একটা বেশিদূর যেতে হয় না সুজন বাদিয়ার ঘাট ডিঙিয়ে, নকশী কাঁথার মাঠ পেরিয়ে, শামসুর রাহমানের আধুনিকতা সাঁতরে, আল মাহমুদের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও লোকজ বিশ্বাসের প্রতি এক অসম্ভব শ্রদ্ধা রেখে এক সম্মিলিত ধারার পথে এগিয়ে চলেছেন নাসির আহমেদ। এই যে নিরন্তন পথচলা, এখানেই আমরা এক গোলক ধাঁ ধা পথে হারিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কবি আমাদের এ পথ থেকে রক্ষা করেছেন এক নতুন তরিকায়।

যদি মরে যাই, কবরের প্রতিটি ঘাসে জন্ম নেবে এক দুঃখ

এই ক্ষোভ, বুকে চাপা অব্যক্ত যন্ত্রণা!

কথা ছিলো, কথা থাকলো, বলা হয়নি, বলা হলো না।

প্রতিশ্রুতিগুলো অসহায়ভাবে কোথাও এখন বাস্তব থেকে বহুদূরে

গহন ঝোপের ভেতর রাত্রির আঁধারে হারিয়ে যাওয়া

জোনাকির মতো এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো

তন্ন তন্ন খুঁজেও সময়ের এই অতল অন্ধকার থেকে

সেই উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিগুলো ফিরিয়ে আনা যাবে না।

কথা ছিলো, কথা থাকলো, বলা হয়নি, বলা হলো না।

(কথা ছিলো, কথা থাকলো ঃ আকুলতা শুভ্রতার জন্যে)

অধিকাংশ মানুষ এরকম জীবন-যাপন করে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু একজন কবি সৃষ্টিকর্তার দেয়া ইন্দ্রিয়গুলোকে (চোখ, কান, নাক) বহির্মুখী থেকে ভিতর দিকে অর্থাৎ অন্তর্জগতে ঘুরিয়ে ধ্যানের দ্বারা শক্তির নিত্য উৎস খুঁজে বের করেন। আরাম, আনন্দ বা শক্তির জন্য একজন কবি বাইরের জগতের অপেক্ষা করেন না। সব সম্পদ একজন কবির অন্তরেই জমা থাকে। কবি কবিতার জন্য আত্মার সম্পদ থেকে রসদ বের করেন। জীবনের বিস্তৃত বিকাশ নিয়ে একজন কবি অন্তহীন পথে চলেন। আরোপিত-সত্য এবং উদ্ভূত-সত্য উভয়ের মধ্যে কবি বিচার-বিশ্লেষণ করে রাস্তা নির্মাণ করেন। কবি চরিত্রের ঘটনাগত একট বিন্যাস নির্মাণ করেন। নাসির আহমেদের কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা এই ঘটনার সামনে দাঁড়াই।

এ আসলে প্রেম নয় সংসার সাজানো কোন স্বপ্ন নয়

সংসারের বিশাল দিগন্তে

অন্ধকারে ক্ষীণ আলো নক্ষত্রের মতো

www.pathagar.com

নিজেকে ছড়িয়ে দেয় ব্যাকুল বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়

(প্লাটফর্মে মুখোমুখি, আকুলতা শুভ্রতার জন্যে)

গোধূলিময় চেতনা ঃ মহাকাব্যে অন্ধকার সাধারণত গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতীক-কখনো কখনো পরাজয়ের, হতাশ্বাসের, লাঞ্ছনার এবং গ্লানিকর জীবন-যাত্রার, আবার কখনো কখনো অন্যায় আচরণের নিষ্ঠুরতার এবং মলিন ও অসমর্থিত সম্পর্কের। এ্যাংলো সেক্সন মহাকাব্যে 'বিউলফ'-এ আমরা সমস্ত ঘটনা গভীর অন্ধকারের মধ্যে সংগঠিত হতে দেখি। সমস্ত লোক দিবসের অপরিমিত আনন্দে রাত্রিতে যখন উন্মুক্ত প্রাসাদকক্ষে বিশ্রাম করছে, তখন সমুদ্রের তলদেশ থেকে এক নিষ্ঠুর দৈত্য বেরিয়ে আসছে আর নিরীহ নাগরিকদের আক্রমণ করছে। এ দৈত্যের জয় অন্ধকারের মধ্যেই। 'বিউলফ' মহাকাব্যে আমরা মানুষের অন্ধকার থেকে আলোকে বিনির্গমনের সাধনার পরিচয় পাই এবং এখানে সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের কর্ম রাত্রিতে সংগঠিত হচ্ছে। কীটস বলেছেন- আমাদের পদচারণের সঙ্গে সঙ্গে জয়ের আশ্বাস আসে এবং জয়ের সম্ভাবনায় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসে। এবং একথা স্পষ্ট করে বলতে চাই– জয়, আশ্বাস এবং সম্ভাবনার প্রতীক ধরেছেন, আলোককে এবং অন্ধকারকে ধরেছেন বিশৃঙ্খলা, অসদ্ভাব এবং অন্যায়ের।

নাসির আহমেদের কবিতায় সেই চেতনার একটি দিক লক্ষ্য করা যায়

লোডশেডিং-এর রাতের ভয়াল অন্ধকারে নিমজ্জমান নগরীর মতোই
আমাদের দিন-রাত্রি ডুবে আছে সময়ের গাঢ় তমসায়।

নিঃসঙ্গতার কালো শয্যায় শুয়েও স্বপ্নকাতর আমি
দেখলাম এই শতাব্দীর সর্বশেষ আশ্চর্য সুন্দর এক স্বপ্ন:
কে যেন আমার চেতনার সুইচে রাখলো হাত
অমনি জ্বলে উঠলো সেই লোডশেডিং-কবলিত প্রান্তরে
লক্ষ লক্ষ ফ্লুরোসেন্ট বাতি।

(পরাবাস্তব ঃ পাথরগুলো দুঃখগুলো)

শব্দের ছায়াপথ ঃ কবিতার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন– নীহারিকার মতো পরস্পর সংলগ্ন অনেকগুলো অনুভূতি। কবির উপলব্ধি এমন প্রগাঢ় হবে যে, তিনি তার প্রতিরূপ আবিষ্কার করবেন শব্দে। আর শব্দ হচ্ছে দাবা খেলার যুঁটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির

www.pathagar.com

স্মৃতিতে যতগুলো শব্দ আছে তা' নিয়েই একজন কবির চলে বিচিত্র কথার খেলা। নতুন শব্দ যোগ করে, আবার কখনো পুরাতন শব্দকে অস্বীকার না করে একজন কবি অনবরত লিখে যান ছন্দময় মায়াবী যাদু। আয়ত্তাগত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলেন একজন কবি। সমাজ যেহেতু বৈচিত্র্যের লীলাভূমি আর শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে, শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। নাসির আহমেদের কবিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে সরলতা ও জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান আমরা দেখতে পাই, তাতে মাঝে মাঝে বিস্ময় জাগে– এতো আমাদের কথা, আমাদেরই নিজের অস্তিত্বের কণ্ঠস্বর। অস্বীকার করি না পাঠক এবং কবির সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রথম যে সামাজিক বন্ধন তা হচ্ছে ধ্বনি এবং ছন্দের কারুকার্যময় বিশ্বাসকে আলোকিত করা। আর নাসির আহমেদ এ কাজটি ভালোভাবে করতে পেরেছেন। নাসির আহমেদ বিষয়ের আচ্ছাদনকে বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ে উপস্থাপন না করে সত্তার সাথে ভাব বিনিময় করে পাঠকের দরবারে মেলে দিয়েছেন। এখানেই নাসির আহমেদ সফল।

এই ঘুম মহেঞ্জোদারো কিংবা হরপ্পার চেয়েও প্রাচীন
এই ঘুমে পাখি হয়ে গেছি আমি
অন্তহীন আকাশ আমার, পৃথিবীর আদি থেকে
অন্তসীমা পার হয়ে চলে যাচ্ছি
এক আশ্চর্য ঘুমের পঙ্খীরাজে চড়ে!
আমি আজ সেই যুবরাজ, যার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে
মহাকাল এক আশ্চর্য মুকুট।
হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার ছুটে চলেছে আমার নিঃশ্বাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
(ভেসে যাচ্ছি অনন্ত ঘুমের ডানায়)

একজন কবি বোধের রাজ্যে উপনীত হয়ে একটি বিস্ময়ের সম্মুখীন হবেন এবং সেই বিস্ময় থেকে এক সময় তিনি সৃষ্টি করেন এক নিখাঁদ পংক্তিমালা। নাসির আহমেদ শব্দের অর্থ নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার করেন। নাসির আহমেদের কবিতা আসলে চিত্তবৃত্তির প্রসার ও বিকাশ লাভে প্রকৃত কাব্যপ্রেমীদের সহায়ক হবে। কারণ তাঁর কবিতার ভাষা সংবেদনশীল, অর্থের দিক থেকে সম্প্রসারণশীল- হৃদয়ের আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে। ভাস্কর্যের সাধন যেমন প্রস্তর, চিত্রকলার উপায় যেমন বর্ণ, সঙ্গীতের যেমন ধ্বনি, কবিতার উপাদান তেমনি শব্দ। নাসির আহমেদ ভালোভাবেই শব্দের ব্যবহার জানেন এবং শব্দের ভাব-ব্যঞ্জনায় তিনি আমাদের আরো কবিতা পড়তে সাহসী করে তোলেন। আমরা আরো নাসির আহমেদের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠি।

www.pathagar.com

চেতনার রূপালি স্রোত ঃ কবিতায় যে অভিজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট হয়, তা' একই সঙ্গে এক মুহূর্তের এবং চিরকালের। মানবজীবনের যে কোনো প্রগাঢ় অনুভূতির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। প্রথম মুহূর্তে এ অনুভূতিকে মনে হয় অনবদ্য হয়তোবা আকস্মিকতা এবং ভীতি-বিহ্বলতায় পরিপূর্ণ। এ মুহূর্ত বিস্মৃত হবার নয়, কিন্তু এ অনুভূতির পুনরাবির্ভাব ঘটে না। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, আমাদের জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে এ অনুভূতি যদি জাগ্রত না হয়, তবে নাসির আহমেদের কবিতার বিশিষ্টতা রক্ষা হবে না। কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, তাহলে কবিকে চেনা যাবে না। ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার যে লাগামহীন বল্গা ঘোড়ার ঢেউ এই উপমহাদেশের বাংলা কবিতার গায়ে আছড়ে পড়ে, একজন নাসির আহমেদ যিনি সত্তর দশকে কবিতার প্লাটফর্মে আসেন এবং টিকিট কেটে চড়ে বসেন কবিতার অনন্ত ট্রেনে, তাঁর কবিতার মাঝেও দেখা যায় কালের সকল নির্মাণ কলাকৌশল। ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের যে রাস্তা সেই রাস্তাতেই নাসির আহমেদের কাব্যপথের শুরু। কিন্তু কোনো কবিই এক জায়গায় চিরটাকাল স্থির থাকেন না। নাসির আহমেদও থাকেননি। তিনি চেষ্টা করছেন আলাদা সড়ক নির্মাণের। আর এ কারণেই আমরা নাসির আহমেদের **গোপন তোমার সঙ্গে** কাব্যগ্রন্থে এক আলাদা নাসির আহমেদকে আবিষ্কার করি। এই নাসির আহমেদের জীবন আছে বলে জগৎকে উপলব্ধি করছেন আলাদা মেজাজে। আলাদা এক সত্তায় আমরা নাসির আহমেদকে দেখি যখন তিনি মহাকবি মিল্টনের মতোন তার কণ্ঠে ধারণ করেন আল্লাহর নাম। সৃষ্টিকর্তার প্রতি এই যে সমর্পণ, এখানেই আমরা দেখতে পাই এক অনন্য নাসির আহমেদ সত্তা। যিনি একজন বাঙালি মুসলমান কবি এবং মৃত্যু ভাবনায় তাড়িত; কিন্তু মৃত্যু ভয়ে ভীত নন। বরং মৃত্যুর ভেতর গভীর সৌন্দর্যের এক চারণভূমি আবিষ্কার করেছেন নাসির আহমেদ। যে খুব নিকটবর্তী হয়ে তিনি সৃষ্টিকর্তার অপরূপ সুধা পান করছেন। একজন কবি যখন বুঝতে পারেন তিনি কি লিখছেন তখন তার কবিতা আসলে সঠিক পথে চলতে থাকে। নাসির আহমেদের সাম্প্রতিক সময়ের কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে তার কবিতা একিট বাঁক নিচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের কবিতা অঙনে খুব একটা বাঁক পরিলক্ষিত হয়নি। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ, এর পরবর্তী জসীম উদ্‌দীন-ফররুখ আহমদ-সৈয়দ আলী আহসান-সৈয়দ আলী আশরাফ-আহসান হাবীব-শামসুর রাহমান-আল মাহমুদ-শহীদ কাদরী-ফজল শাহাবুদ্দীন-রফিক আজাদ-আবদুল মান্নান সৈয়দ-নির্মলেন্দু গুণ-আল মুজাহিদী এই তো আমাদের কাব্য অহংকার। আমরা আমাদের স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত করে দেখাবার এই যে কবিতার সেনাপতিরা এখানে আরো আছেন আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ নূরল হুদা– প্রত্যেকের আলাদা সড়ক নির্মাণের কী এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এই সব অগ্রজদের মাঝে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় আজ শামসুর রাহমান-আল মাহমুদ আলাদা একটি জায়গা করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

কারণ তাদের কবিতার যে পথ তা পরস্পর আলাদা। আর দু'জনেই চেষ্টা করেছেন দু'টি পর্বত স্পর্শ করতে। তাঁরা আজ সফল। নাসির আহমেদের সাম্প্রতিক উপলব্ধি ও কবিতার আঙ্গিকগত দিক থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি চলেছেন সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো, একই পথে হাঁটলে অনেক সময় পথচারীদের আলাদা করে শনাক্ত করা যায় না। যেহেতু নাসির আহমেদ এখন তার কবিতার আলাদা সড়ক নির্মাণ করতে চলেছেন, সুতরাং তাকে বাংলা সাহিত্যের সকল কবিতার রাজপথগুলোর প্রতি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, কাল হারিয়ে যায় মহাকালে। আর মহাকালের মানদণ্ডে একজন কবিকে দাঁড়াতেই হয়। তখনি একজন কবির প্রকৃত কাব্যমূল্যায়ন হয়। তবে কবিতার মধ্যে ছন্দ, গদ্যের আবহে এবং কথার পরিমার্জিত ভাষণে যে নির্মাণশৈলীতা দেখিয়েছেন, তাতে মাঝে-মাঝে ভাব-ব্যঞ্জনার পাশাপাশি নাসির আহমেদের বক্তব্য বেশ চটকদার একথা মনে হয়েছে। তবে নাসির আহমেদ লোকায়িত ধ্যান-ধারণার পাশে দেশজ জীবনযাত্রার প্রতিও কবির এক ধরনের সহমর্মিতা ও দরদ আমাদের বিশ্বস্ত করে। তিনি সম্ভবত মাটির কাছাকাছি এক আধুনিক অনুভূতিশীল ও শুদ্ধতাভিসারী কবি। যিনি জীবন, জগৎ, জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টিকর্তা সব কিছুতেই দেখেন শুভ্রতা। হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে নাসির আহমেদ নিজেকেই বারবার করে জানার চেষ্টা করেছেন। এক ধরনের যন্ত্রণা কবিকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছে প্রতিনিয়ত। আঘাত না আসলে একজন কবি ঋদ্ধ হন না। প্রয়োজনের তাগিদে একজন কবিকে যে অবস্থান থেকে রাস্তা নির্মাণের জন্য সংগ্রামে নেমে পড়তে হয়, নাসির আহমেদের শুরু ঠিক সেখান থেকেই।

i. কতিপয় হিংস্র ভাল্লুক-মেঘ ভয়াল থাবায়
ছিন্ন ভিন্ন করে গেছে আমার আকাশ
আজো মেঘমুক্ত নই আমি।
কী করে শরৎরাঙা হাসির সকাল হবে কবিতার ঠোঁটে?

(একজন পরাধীন কবির উচ্চারণ ঃ পাথরগুলো দুঃখগুলো)

ii. অথচ ধিক্কার ওঠে নিজের ভেতরে আজ
একদিন বকশীবাড়ির ওই বাঁশঝাড় পার হয়ে যেতে
ডানা ঝাপটানো কোনো পাখির শব্দ শুনে
মনে হতো সন্ধ্যার অন্ধকারে ওই বাঁশঝাড় তার
ঘন ছায়া নিয়ে ভৌতিক ঘাতক, যেন
ছিঁড়ে খুঁড়ে নেবে ঊর্ধ্বশ্বাস বালকের জ্যোতির লাবণ্য।

(বৃক্ষমঙ্গল ঃ বৃক্ষমঙ্গল)

www.pathagar.com

নদীর নূপুরে বাজে জলের কল্লোল ঃ নাসির আহমেদ জীবনের কবি। ভালোবাসার কবি। ভালোবাসেন পৃথিবীর বাতাসে মিশে যাওয়া প্রতিটি নিঃশ্বাসকে। নিজের জীবনের কষ্টকে বুকে লালন করেও তিনি ভালোবাসেন মানুষ, মাটি এবং প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার নারীকে। একজন কবির এই যে ভালোবাসাময় অধ্যায়, এখানে আমরা দেখতে পাই কবির কবিতার মাঝে আকুলতা। এই আকুলতা ভালোবাসার পথকে চেনায়। যে পথ আমরা দেখতে পাই জীবনানন্দের পথ বেয়ে তার প্রিয়তমাকে খুঁজে ফিরছে। জাগ্রত ও ঘুমন্ত, পীড়িত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শৈশব ও বার্ধক্য এইসব পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও কবি নাসির আহমেদ তার প্রিয়তমাকে খুঁজে ফেরেন। এইখানেই কবি প্রেমিক হিসেবে মহান। কবির প্রেমময় কবিতা পড়ে আমরা একথা বলতে পারি– 'জীবনের ধর্ম যা কিছুই হোক না কেন, আমি আনন্দে থাকবো। কারণ আমি কবি। সুন্দরের জয়গান গাওয়াই আমার একমাত্র ইচ্ছা। আমি মানুষকে, জাতিকে স্বপ্ন দেখাই।'

i. তোমার প্রথম স্পর্শে উজ্জ্বল সেই একলা দুপুরের জন্যে
সেই অনুপম রাত্রির জন্যে উদ্বাহু এখনো আমার স্মৃতিরা,
উৎকর্ণ আমার প্রতিটি রোমকূপ
তোমার পদধ্বনির আশায়। তুমি মানে জীবনের
সমস্ত জটিল ব্যাকরণ মীমাংসার একমাত্র অভিধান।
সেই থেকে প্রার্থনার শুরু.....

(ভালোবাসার এই পথে ঃ ভালোবাসার এই পথে)

ii. ঘনিয়ে আসছে রাত্রি
ও অরণ্য! গুটাও আঁচল
জ্যোৎস্নায় অশান্ত হবে ঢেউ!
উদ্ধারের মতো কেউ থাক বা না থাক
ঝাঁপ দেবো, ঝাঁপ দেবো আজ।

(দগ্ধ হতে হতে একদিন ঃ ভালোবাসার এই পথে)

iii. আসক্তির অসহ্য আগুনে যদি আরো বেশি আমাকে পোড়াও
পুড়ে খাঁটি সোনা হবো, তুমি পাবে অবশিষ্ট ছাই!
কী আর পরীক্ষা নেবে? এর বেশি আরো যদি চাও
পরকীয়া অগ্নিকুণ্ডে ঢেলে দেবো পূর্ণাঙ্গ সত্তাই!

(পরাণের পাখি ঃ ভালোবাসার এই পথে)

www.pathagar.com

যা উচিত এখন ঃ একজন কবি শুধুমাত্র তার নিজের জন্য বলেন না। তার স্বজনদের জন্য বলেন। তার আর্ত উচ্চারণ হচ্ছে তাদের আর্তি, যেটা শুধুমাত্র তিনিই উচ্চারণ করতে পারেন। এই বিষয়টিই একজন কবিকে গভীরতা দান করে। আমরা বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকালেও দেখি এই চিত্র। যুদ্ধের পূর্বে ফরাসী কবিতায় ছিলো আমাদের মতো সেই একই সাধারণ বৈশিষ্ট্য; কিন্তু যুদ্ধের পর কবিদের কবিতার চিত্র দেখা যায় এক আলাদা সত্তায়। ফরাসী দেশে সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি আরাগঁ। যিনি কবিতা লেখা শুরু করেন একজন সুররিয়ালিস্ট হিসেবে। কিন্তু তার কবিতার শেষে দেখা যায় কমিউনিজমের প্রভাব। আজকে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার নামে যা শুরু হয়েছে, তা কতোটা যুক্তিযুক্ত তা ভাবার বিষয়। নাসির আহমেদের একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে– কবিতাই পারে একজন কবির কৃতিত্ব টিকিয়ে রাখতে। কারণ, সীমাহীন নোংরা আবর্জনার মাঝে আজকের সমাজ এগিয়ে চলছে এক অজানা গন্তব্যে। এখান থেকে নাসির আহমেদকে বাংলা কবিতার রাস্তায় কার্পেট পাড়তে হবে। এই কাজটি তাকেই করতে হবে। কারণ, আজকের আধুনিক বাংলা কবিতার এই যে উত্তরণ, এখানে একটি বিষয় ভাবতে হয়, মাইকেল যে আধুনিকতার গোড়াপত্তন করলেন- সেখান থেকে আজকের বাংলা কবিতা কতটুকু পথ এগোলো? কবিতাকে পরিবর্তনের জন্য, একটি জাতির আচার-কৃষ্টি পরিবর্তনের জন্য স্পেনে একদিন লড়াই করেছেন সম্ভাবনাময় দু'জন কবি ক্রিস্টোফার কডওয়েল এবং জন কর্নফোর্ড। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে এই দু'জন কবি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। কবিতার কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা কবি ও জনতার মধ্যকার বাধা অতিক্রম করেছেন, এবং কবিতা ও জীবনের মধ্যকার ছেঁড়া তারটি দিয়েছেন জোড়া। এই কবিবৃন্দ আসলে উইলিয়ম মরিস, শেলী, মিল্টনের উত্তরাধিকার ছিলেন। হাতিয়ার ব্যবহারের ফলেই মানুষ একদিন আগুনকে বশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং আগুন বশ করার ফলে মানুষ সক্ষম হয়েছে ধাতুর কাজ করতে, যা না হলে সভ্যতা গড়া ছিলো অসম্ভব। সুতরাং আগুন হচ্ছে বিজ্ঞান– মানুষ এবং তার পরিবেশ যে সূত্রবলে চলে তা বুঝাবার এবং নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা। অনুরূপভাবে আশা- মনের অস্থির অতৃপ্তি, যা তাকে গভীরতর বোধশক্তি এবং দৃঢ়তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে চালিত করে, যুক্ত শিল্পের সঙ্গে। শিল্পী সবসময়ই ছুটে চলেছেন অসম্ভবের পেছনে, গ্যেটের ইউফোবিয়ার মতো, আকাশে উড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়ে ওঠে প্রজ্বলিত এবং যায় ফুরিয়ে। কিন্তু অবশেষে তার অনুপ্রেরণার কল্যাণেই এই ভিত্তিহীন কল্পনা হয়ে ওঠে শক্ত বাস্তব। নাসির আহমেদও তার কবিতা সমুদ্রকে নিয়ে যাবেন কল্পনার জগতে, যেখানে আমরা নাসির আহমেদের কবিতা থেকে পেতে পারি রুদ্ধতা থেকে মুক্তি। সাধারণ শিল্পী তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব একটা সচেতন থাকে না। কিন্তু যেহেতু নাসির আহমেদের কাব্যের মাঝে আমরা আত্মবিশ্বাসের অদম্য একটি স্ফুরণ দেখতে পাই, যা তার সচেতন চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ, তাই তার কাব্যের মাঝে একটি শ্রেণী সংগ্রামের কথা

www.pathagar.com

আসাতে হবে যা এ অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা বলে। তাহলেই বাংলা কাব্যে শুরু হবে নতুন এক ইতিহাস। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় ঃ যে-সব দেশের লোকের কল্পনাশক্তি এবং তাদের ব্যবহৃত ভাষা সমৃদ্ধ ও জীবন্ত, সেখানে একজন লেখকের পক্ষে সম্ভব তার শব্দ ব্যবহারে সমৃদ্ধ এবং প্রাচুর্যপূর্ণ হওয়া, একই সঙ্গে সম্ভব বাস্তবতার পরিপূর্ণ ও স্বাভাবিক রূপদান, যা সব কবিতারই মূল চালিকাশক্তি।

একটি বিষয় নাসির আহমেদের এই মুহূর্তে ভাবতে হবে আর তা হলো, প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রীক সাহিত্যে এখনো ইংরেজী, গ্রীক এবং আইরিশ কবিতা গোটা বিশ্ব শাসন করে বেড়াচ্ছে। একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বাংলা সাহিত্যের কবিতা আঙিনায় প্রথমবারের মতোন নবেল পুরস্কার এনে পশ্চিমা বিশ্বকে অবাক করে দেন। বাংলা ভাষার মাধুর্যময় শব্দরাজি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে যে সম্মান আমাদের জন্য নিয়ে আসেন, এরপর অনেকে না হলেও নজরুল-জীবনানন্দ-জসীম উদ্‌দীন-এর কবিতা আমাদের আলাদা এক জগতে নিয়ে যায়। আমরা চিনতে পারি আমাদের জীবন-জগৎ ও সত্তাকে। এই যে আমাদের আদিমতর বাংলা কবিতা দৈনন্দিন, আমরা যতই আধুনিকতার মোড়কে নিজেকে সাজাই না কেনো, আমরা আসলে সেই সনাতনপন্থিই থেকে গেছি। আমাদের শব্দে যতোই ঝনঝন আওয়াজ আসুক না কোনো, প্রাত্যহিক কথোপকথনে আমরা সেই অধুনাতম সময়ের ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধরে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এ কারণেই নাসির আহমদে আমাদের এখন কোন দরোজায় নিয়ে যাবেন, তাই দেখার বিষয়।

i. মনে রেখো একখণ্ড মেঘ/ ভেসে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে/ মেঘ হয়ে, মেঘের ভিতরে/ মিশে যেতে যেতে/ আরও এক ভোরের প্রস্তুতি।

ii. স্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে গেল কাচের চূড়ির মতো।/ উচ্ছ্বাস হাসিতে রাঙা হয়ে উঠলো হাওয়া। (সম্রাট)

iii. দুঃখের নির্জন কালো কফিনে শায়িত আজ একজন কবি।/ উচ্চকিত একজন এতো বৈপরীত্য আজ কেমন নির্বাক/ প্রতিবাদহীন দেখো শেষ শয্যাশায়ী।/ সাপের দংশনে নয়; তবে কি রিলকের লাল গোলাপের কাঁটায়/ মর্ম ছিঁড়ে গেছে? (একজন কবির মৃত্যু)

চশমাটা এখন থাক ঃ প্রকৃতি যদি সৃষ্টি ও কবিতার জন্য, তবে কবিতা মানুষ ও হৃদয়ের জন্যে এক উন্মুক্ত বাতায়ন। কখনো প্রার্থনা, কখনো পরিণতিতে প্রতিবাদ। কবি নাসির আহমেদের সাম্প্রতিক কবিতা পাঠ আমাদের পরিণতির পথ দেখায়। এজরা পাউন্ড ওয়েস্টল্যান্ডের পাণ্ডুলিপি পাবার পর নিউইয়র্কের এক শিল্প-সংগ্রাহক বন্ধুকে লিখলেন, এলিয়টের কবিতাটি আমাদের চুপ করে দিয়েছে ভালোবাসায়, সাংবাদিকতায়, ঐশ্বর্যের সম্পাদকীয়তে, অধিকারের আইটেমে এবং মেঘের ইমপ্রেশনের চাষবাসে। নাসির

www.pathagar.com

আহমেদও আমাদের কবিতা পড়তে সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আধুনিক সময়ের কবি। চিন্তা-চেতনার জারক রসে ডুবিয়ে তিনি আমাদের আধুনিককালে টাইটানিক জাহাজে তুলে নিয়েছেন একদিনের প্রমোদ ভ্রমণ শেষে নূহের নৌকায় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

i. যার চোখের গভীরে নীল মমতায় পদ্মফুল ফুটে আছে ভেবে
একদিন বালক-স্বভাবী মন সাঁতার না জেনেও
কী অবলীলাক্রমে নেমে গিয়েছিলো ওই অতল দীঘিতে!
আসলে তো সেখানেও পদ্ম ফুল নয়, হয়তো করুণ শ্যাওলা,
হয়তো বা অন্য কিছু ছিল রহস্যের।

(মানুষের জলছবি ঃ আকুলতা শুভ্রতার জন্যে)

ii. আমাকে একাকী প্রভু শূন্যতায় ঝুলিয়ে রেখেছো
রৌদ্র ও মেঘের কিংবা জ্যোৎস্না-নিসর্গের
কোনো ছায়া আমার শূন্যতা ছুঁয়েও দেখে না।
উচ্ছিষ্ট খাবার যেন বাসি প্লেটে পড়ে আছে
তোমার সংসারে প্রভু এত অবহেলা!

(আমি তৃতীয় বিশ্বের অনাহারী গ্রাম ঃ আমি স্বপ্ন তুমি রাত্রি)

iii. পরিণতি পাও তুমি ফুলে আর ফলে
জন্মের সমস্ত ঋণ শোধ করো উনুনের অগ্নিদাহে জ্বলে
তোমার ছায়ায় স্নেহে সমীহীন ঋণে
কৃতঘ্ন মানুষ বেড়ে ওঠে, দিনে দিনে
নিজেকেই পূর্ণ করে পরিণতি পায়;
তোমাকে হত্যার জন্যে কুঠোর শানায়।

(বৃক্ষমঙ্গল ১৩ ঃ বৃক্ষমঙ্গল)

www.pathagar.com

কালের বিপ্লবী কাপ্তান

প্রাককথন ঃ

কালের প্রয়োজনে একজন জীবনানন্দ দাশ আলোকিত, আলোচিত হয়ে ওঠেন। আলোচনার ঢেউ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কেন্দ্রে। জোয়ারের তাড়নায় যে ঢেউ কূল ভাসিয়ে দেয়, ভাটার সময় আবার হারিয়ে যায় কোথায়, কে জানে? তীরে সে সময় যা কিছু কুড়ানো পাওয়া যায়, তাই অর্জন। আবার একজন জাগরণের কবি এমনভাবে সময়, সমাজ, সভ্যতা নাড়া দিয়ে যায়, যার ঝাঁকুনি থামাতে কয়েক শতাব্দী পার হয়ে যায়। যেমন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর শাণিত লেখার সমুদ্রে আমরা যতোবারই অবগাহন করি, নতুন প্রাণ যেন জেগে ওঠে। এই তো লেখকের সৃষ্টি। এখানেই নজরুলের কারিশমা। আমরা কথা শুরু করেছি নজরুল, জীবনানন্দ অধ্যায় নিয়ে। কবিতা বিষয়ক আমাদের এই বিদ্যুৎচালিত ট্রেনটির গন্তব্য আশির দশকে। অনেকে আছেন, মনে করেন– কবিতা শিল্প তাৎক্ষণিকভাবে কাগজ-কলম নিয়ে সৃষ্ট একটি রচনা। আমরা তা মনে করি না। আর তাই মহাসত্যের দরোজায় আমরা গিয়ে আবিষ্কার করি এক স্বপ্নজগৎ। এই জগৎ অর্থাৎ আমাদের এই স্বপ্নময় জগতে একজন স্বপ্নের ফেরিওয়ালাকে আমরা পেয়ে যাই এ পর্বে। আর তাকে নিয়েই আমাদের সবুজ মিশন। তিনি আবদুল হাই শিকদার।

আবদুল হাই শিকদারের কবিতার গভীরে অনুপ্রবেশের প্রাথমিক কালে যে বিষয়টি সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে, তা হলো কালের নাখুদা হিসেবে তাঁর কবিতা আমাদের যতোটা কাব্যিক রস আস্বাদনে সুযোগ দেয়, তার চেয়েও বহুগুণ আমাদের সচেতন জীবনে যে সকল উপাদান আমাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে মানবিক করে গড়ে তুলেছে যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তা তাঁর কবিতার শরীরে লেপ্টে আছে। কখনো মায়াবী চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে আবার কখনো বর্ম পরিহিত অবস্থায়। আবদুল

www.pathagar.com

হাই শিকদারের কবিতা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে খুব সরলভাবে সরিয়ে নিয়ে সামাজিকভাবে সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে ধাবিত করে। আমাদের আগ্রহ যে কারণে. রচনা কৌশলে ব্যাকরণগত ত্রুটি যতোই থাকুক না কেন, সচেতন সৃষ্টির গুণে এবং গতিময়তায় সবকিছু বদলাতে চেষ্টা করে। একটি বানোয়াট কল্পনার জগৎ তৈরির চেয়ে, চলুন- আমরা বিচরণ করি আবদুল হাই শিকদারের সবুজ বাগানে। যেখানে দ্রোহ আসে বিশ্বাসের ঝাণ্ডা মাথায় নিয়ে, প্রেম আসে উত্তপ্ত লাভা স্রোত ডিঙিয়ে, কামনা আসে তাইফুন হয়ে।

লাল দরোজার ওপাশে লুক্কায়িত ইতিহাস ঃ প্রাবন্ধিক, গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ একদা লিখেছেন 'আবেগ কবিতার কেন্দ্রীয় উৎস'। কবিদের আবেগ থাকবে, এই আবেগের তাড়নায় অনেকে অনেক সময় সৃষ্টি করেন মহোত্তম মৌলিক কিছু। আমরা মিল্টন, দান্তে, হোমার পড়ি, প্রীত হই। কিন্তু হাতের কাছে ঘড়া ভর্তি মোহর নেড়ে-চেড়েও দেখি না কী আছে ওতে। আদিম কবিদের শিল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহিত্যচর্চায় নিবেদিত এমন যে কেউ দু'চার ছত্র অবলীলায় বলে যেতে পারবেন আশা করি। আমি এর বিরুদ্ধে নই। পক্ষে। কিন্তু একটি কথা। আমার ঐতিহ্য, ভাব, দেশ, কাল এসব ভাবনায় আমাদের কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা আগে জানা উচিত। আমরা অডিসিতে বর্ণিত চারণ ফেমিওসের কথা স্মরণ করি। সে বলেছে– 'আমি স্ব-শিক্ষিত, কারণ, ঈশ্বর আমার অন্তরে সবধরনের গান প্রোথিত করে দিয়েছেন। আনার মধ্য এশিয়ার আধুনিক লোক সাহিত্যের দিকপাল র‍্যাডলভের সত্তর বছর আগের এক মন্তব্য এ রকম ঃ 'ঘটনার গতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে কিরঘিজের একজন চারণ-কবি তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো একটি ভাব, যে কোনো একটি গল্প তাৎক্ষণিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে। তাদের একজন প্রখ্যাত চারণকে যখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি অমুক বা অমুক গানটি গাইতে পারেন কিনা, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'যে কোনো গানই আমি গাইতে পারি, কারণ ঈশ্বর আমার অন্তরে এই ক্ষমতা প্রোথিত করে দিয়েছেন। আমাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না এমনভাবে তিনি এ শব্দগুলোকে আমার জিভের ডগায় এনে দেন। আমার কোনো গানই আমি শিখিনি। সবই বের হয়ে আসে আমার অন্তরাত্মা থেকে। আমরা কথা বলছিলাম আবুদল হাই শিকদারের কবিতা নিয়ে। এই যে আদিম কবিদের অনুপ্রেরণা, পাঠক সমাজের ভালোবাসাময় স্মরণ, কোথায় আমরা তো আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এমনটি পাইনি। আর তাই মন্ত্রোচ্চারণ, ঋতুসঙ্গীত কিংবা আধুনিক ফ্যাশনে নয়– আমরা ইতিহাসে তাকালে অবাক হয়ে যাই। আবদুল হাই শিকদারের টাইট শব্দ গাঁথুনিতে বাঙলা, বাঙালীর আভিজাত্যিক ইতিহাসে কী পরম বিশ্বাসে প্রকৃতির কোলে শুয়ে আছে মৌলিক বৃত্তায়নে।

i. টঙ্গীর সোনাভান বিবি
বিকেলে পাহাড় নেই মাটির ঢিবি

www.pathagar.com

মাটির রহস্য ঘেঁটে দুই চোখে ঘোর

[মাটিতেই জন্ম নেয় আশি লক্ষ ভোর সোনাভানোন্বেষণ ঃ আশি লক্ষ ভোর]

ii. লোরকার মতো ওখানে কে পড়ে আছে

লোকটার বুকে একলা সূর্য বহুবিধ নীরবতা

স্বপ্নের সব মশকপূর্ণ চন্দ্রিমা ঝলোমলো

ডালিমের দানা গলে গলে তার লেবাসের কারুকাজ

পঙ্খীরাজের পাখার আওয়াজ শুনবার ছিলো তারই

চোখ দুটো ছিলো বন্ধ

অন্তর ছিলো হাজার দুয়ারে খোলা

[সিরাজদৌলা ঃ আশি লক্ষ ভোর]

ইতিহাসের পরিণতির ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করা যায় কবির চেতনার গভীরতা। আমরা বলতে চাচ্ছি, ইতিহাসের গভীরতর স্থানে না পৌছানো পর্যন্ত একজন কবি স্বত:স্ফূর্তভাবে এভাবে বর্ণনা করতে পারেন না। আকুলতা ও ইচ্ছা এমনই এক বিষয় যা মানুষকে পৌছে দেয় আত্মবিশ্বাসের উচ্চস্তরে। একজন সচেতন শিল্পীর গতিশীল সৃষ্টি এভাবেই বহুবর্ণিল, বহুমাত্রায় আবিষ্কৃত হয়। আবেদনের তীব্রতায় মনশ্চক্ষে ধরা পড়েন। আবদুল হাই শিকদারকে আমরা ইতিহাসমনস্ক ইতিহাস সচেতন কবি বলতে পারি। কবিতার মৌলিক বৃত্ত ভাঙতে কবি এতটুকু দ্বিধা করেননি। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আঘাত করেছেন কবিতার সাংগঠনিক (ছন্দ) পাঠশালায়। তছনছ করতে চেয়েছেন সকল পুরাতন অকৃত্রিম ফর্ম। টেক্সটকে গুঁড়িয়ে বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন নিজের কবিতার রাস্তা। ইতিহাসকে কাব্যিকতার জারক রসে না চুবিয়ে কবি একটানে উঠিয়ে এনেছেন নিজের সড়কে। এখানেই তার কাব্যের বিশালত্ব প্রমাণিত হয়।

এজিদ শিবিরে আজ উৎসব ভোজ

জায়েদ সীমার ওলী মহান সেনানী

তাদের বুটের নীচে ঝিম মেরে গেছে মাঝরাত

অথচ বাইরে এক বিরহিনী আলুথালু শুয়ে

তার দু'পায়ের কাছে অনাহার শোক

শিথানে বাগান তার নিঃশেষ শত্রুর অশ্বখুড়ে

www.pathagar.com

বুলডোজারের চাপে নিভে গেছে পদ্মলোচন।

(আরেক হোসেন ঃ আশি লক্ষ ভোর)

ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া অথচ জগৎকে জানাচ্ছেন বিপ্লবী ভাষায়। বাংলা কবিতার আটপৌড়ে সজ্জার বাইরে তিনি চেষ্টা করছেন নতুন রক্ষণশীল অথচ সার্বজনীন এক ভাষা নির্মাণের। যদিও অনেকে এই প্রক্রিয়াকে নজরুলের বিদ্রোহী যুগের ভাষা সংস্করণ বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে উদ্দেশ্য একই হলেও ভাষাগত তারতম্য আছে বৈ কি! কবিতার বিষয়বস্তুর আঙ্গিক দিক বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও আছে। কারণ, নজরুল ছিলেন গোটা ভারতবর্ষের নাগরিক। আর আবদুল হাই শিকদার বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডের অধিবাসী। কবিতার রহস্যময় রাজ্যে অনুপ্রাণিত কিংবা প্রভাবিত হতেই পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভাষাগত সাযুজ্য সর্বগ্রাসীভাবে শাসন না করে। এদিক বিচার করলে তাঁর কবিতা অনুকরণের ফসল, এমনটি বলা যাবে না। সহজাত প্রবৃত্তির বশে তিনি সৃষ্টি করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। আমরা এবার দেশ-কালের সীমানায় প্রবেশ করছি.....।

জাতীয়তাবোধ এবং রৌদ্রের নেশা ঃ বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা বাঙালি জাতি-গোষ্ঠীর সমাজ কাঠামো নানা বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠী এবং জাতিগত প্রাচীন ব্যবস্থায় ছিল বিভক্ত। ফলে অভিন্ন পরিচয়কে জ্ঞাত করা বাঙালি সমাজে খুব একটা হয়ে ওঠেনি। প্রাক-সামন্ত এবং সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় এটি স্বাভাবিক নিয়ম বলেই জ্ঞাত করা যায়। আমাদের সমাজের সমগ্র জনসংখ্যাই ছিলো জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার এক জটিল কাঠামোর অধীন। কূপমুণ্ডকতা ও মূঢ় আত্মগরিমা বাঙালি হিন্দু মানসকে যেমন সংকীর্ণ করে রেখেছিল, তেমনি বাঙালি মুসলমান সমাজও আচরণগত দিক দিয়ে ছিলো কট্টর মনোভাবের। ইসলাম সাম্যের বাণী প্রচার করে। কিন্তু এই সাম্যচেতনা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুশীলনে অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হন তৎকালীন ইংরেজ শাসিত মুসলমান সমাজ। বাঙালি হয়ে জাতীয়তাবোধে অগ্রসর হন কাজী নজরুল। অনেকটা মুসলমান সমাজের একক প্রতিনিধি হয়ে। সে ধারার উত্তরসূরী আবদুল হাই শিকদার। মানবতাবাদী ভাবধারায় ঋদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে কবির চিন্তা আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে গণতন্ত্রের সফল জয়যাত্রা বজায় রাখা। আর এ কারণেই শিল্প বিপ্লবের এ যুগে অর্থনীতি, দর্শন চর্চা, শিল্প-সাহিত্য, সমাজনীতিতে ইউরোপীয় মনোজগতকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে বাঙালির বোধ ও বিশ্বাসের আধুনিক ইশতেহার। রাজনীতির জটিল ও কুটিল অধ্যায়কে কবিতায় প্রবেশের এক অসাধ্য পরিশ্রম করেছেন কবি। বাংলাদেশী বাঙালি মুসলমানদের বিশ্বাস বৈভবে তাঁর কবিতার

www.pathagar.com

ঝরণা ধারা প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন, একথা বলা যায়। বাঙালী জাতীয়তার চেতনাকে ভেতর ও বাইরে থেকে দেখা এবং বোঝাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি তিনি ঠিকই করতে পেরেছেন।

i. হে আমার স্বদেশ

হে আমার পূর্বপুরুষের অস্থিমেশা মাটি

এবার তুমি আমার দিকে তাকাও

দ্যাখো কেমন গভীর দু'টি চোখ

আঁচলে আগুন আগলে বাঁচিয়ে রেখেছি

(আমি হাজির ঃ এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

ii. জীবন তোমাকে ঘুমুতে দেয়নি কর্মের ব্যস্ততা

স্বপ্ন ছড়িয়ে ফিরেছো চারণ-কবি

ক্লান্তিবিহীন মানুষের যুবরাজ

ক্রিসেন্ট লেকের পাথরে পাথরে নেমেছে কি তাই ঘুম?

(জিয়া শহীদ জিয়া ঃ এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

iii. শপথ তাদের যারা অত্যন্ত সঙ্গোপনে

একদিন আমার শরীরের পিঞ্জর থেকে

মুক্ত করে দেবে রূহের বন্ধন

আমি আপনাকে ভালোবাসি

(আমি আপনাকে ভালোবাসি ঃ এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

iv. আগুন ফোটে আগুন মানুষ আগুন হয়ে জ্বলে।

হাসপাতালে আছড়ে হাওয়া আগুন ছুঁড়ে বলে,

স্বৈরশাসন ধ্বংস হলো, মানুষ পেলো গতি–

দুঃখ-ক্ষুধা দুয়ারে কি গো চিরকালের যতি?

(অভ্যুত্থান '৯০ ঃ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল ঃ যুগলবন্দী ভূগোলময়)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাঙালি

www.pathagar.com

মাত্রই অংশ নিয়েছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধে। এরপর ১৯৯০ সালে রক্ত দিয়ে, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সয়ে বাঙালি জাতি জাতীয়তাবোধে অগ্নিপরীক্ষায় স্বৈরশাসকের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত কবি সমাজের বাঙালি মানস সে সময় ফুটে উঠেছিল। আবদুল হাই শিকদারও এর ব্যতিক্রম নন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জাতীয় সম্মান পুনর্বহাল করতে কবির কলম থেকে নিঃসৃত 'অভ্যুত্থান '৯০ ঃ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল' কবিতাটি শিল্পের জন্য শিল্প বিচারে কতোটা মাণোত্তীর্ণ আমরা সে পোসমর্টেমে যাচ্ছি না, বরং আমরা এই কবিতাটিকে কালের দলিল বলতে পারি।

'চাষী পুত্রের নগর ভ্রমণ' কবিতাটির মাধ্যমে এক মগ্ন চাষার নগর ভ্রমণ বর্ণিত হলেও কবিতাটি উন্নত বিশ্বের সভ্য নাগরিকদের তৃতীয় বিশ্বের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি কৌতূহল-এর এক নগ্ন চিত্র। কান্টহেগেল-ফয়েররাখের চিরায়ত দর্শন ও যুক্তিবাদ, মার্কস-এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রভাব, অর্থনীতিতে শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পুঁজিবাদ সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয়দের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি একচোখা দানব বানিয়ে ছেড়েছে। এদিকে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের উদারতাবাদ, বাস্তববাদ, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদসহ আধুনিক সমাজের ভাবাদর্শ আত্মস্থ করে চলতে হয়। আর এই চলতে গিয়ে চাষী পুত্রের প্রথম নগর ভ্রমণের মতো বিস্ময় লাগে সব কিছু। গভীর উপলব্ধির পাশাপাশি এক ধরনের সূক্ষ্ম কষ্ট জাগ্রত হয় কবির কবিতায়। তারপরও সন্তুষ্ট সৃষ্টিকর্তার এতো বরকতময় নেয়ামত প্রাপ্তিতে।

'আমার আলখেল্লার ভেতর থেকে অন্য একজন চাষীপুত্র নগর ভ্রমণে বের হন। লক্ষ্যের নবাবজাদা পিছন থেকে অভিবাদন জানায় তাকে। এলিজাবেথ টেলর নলী খাম ভর্তি করে পাঠিয়ে দেন কয়েকশ' তীব্র চুমু। ভূমধ্যসাগর থেকে গোটা সাইপ্রাস বক্ষ নগ্ন করে ডাকে। প্রভু একজন চাষীর ছেলে কি অবাক নৈশভ্রমণে বের হয় তোমার কোন নিয়ামতকে আমি অস্বীকার করি বলতো'

(চাষীপুত্রের নগর ভ্রমণ ঃ লেবিঙ ধরা নদী)

সময়ের নাখুদা ভেজে শাদা জোছনায় ঃ একজন কবিতে তার সময় ধারণ করতে হয় কবিতায়। পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী উত্তর প্রজন্ম খুঁজে নেবে পেছনের ইতিহাস। আমরা আবদুল হাই শিকদারের কাব্য-চেতনাকে সময়ের ডিপোজিট বন্ড বলতে পারি। কবিতায় লোকজ উপাদানের পাশাপাশি ভূমিজ উপদান মিশিয়ে মিশ্রণকে প্রস্তুত করেছেন মহাকালের মণ্ড হিসেবে। আবদুল হাই শিকদার যুদ্ধবিরোধী, বর্ণবাদবিরোধী, নারীর পক্ষে, প্রাচ্যের সাহিত্য ও চিন্তাধারা পঠন-পাঠনে তিনি হয়ে উঠেছেন বিশুদ্ধ সমাজ সচেতন কবি। আর কবির এই বিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে নৈরাশ্যতা, শূন্যতা, বোধের যন্ত্রণা নামক পাহাড়। শিকদারের এই সময় চেতনা আমাদের ভাবিত করে, তিনি কি Post modern poet? একটি দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে কবি যেভাবে অকপটে অবলীলায় তুলে এনেছেন, তাতে তাকে উত্তর আধুনিক কবি বলা যায়। যেখানে আবদুল হাই শিকদারের কাছে Origin বা শেকড়ের

www.pathagar.com

গুরুত্ব সর্বাধিক এবং তারপরই গুরুত্ব Phenomenon বা চলমান অবস্থা, যেখানে তিনি কবিতার মাঝে হুংকার দেন জাতিসত্তার বিবেক জাগ্রত করতে। সাহিত্যের পাশ্চাত্য ভাবনা তাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, কোথায় মার্কসের অর্থনীতির উৎপত্তি বা ফ্রয়েডের লিবিডোর অথবা ইউক্লিডের জ্যামিতি কোন ভূমির ফসল That's not a question? আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও রুচির সংকীর্ণ বৃত্তের বাইরে শিকদারের যে কাব্যদর্শন পরিস্ফুটিত সেখানে দেশীয় মেজাজে প্রাচ্যবাদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। পোস্টমডার্নিস্টদের যে সাহিত্যের প্রতি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি তা আবদুল হাই শিকদারের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। একটি কবিতা লক্ষ্য করি ঃ

যোজন যোজন সাদা জোসনার ওপর দিয়ে অনায়াসে

তোমার ঘরে ফিরবার পথ এখন কণ্টকাকীর্ণ

গজনীর গম্বুজ থেকে ঠিকরে পড়ে না শেষ সূর্যের কণা

তোমার ঘরকন্নার টুকিটাকি খুনসুঁটি কলহ বিবাদ হলো

পরাশক্তির ফেনায়িত বিয়ারের ব্যস্ত টেবিল

এবং পর্বতের সানুদেশে তীব্রখামে উৎকীর্ণ হলো

যৌবনের লীলালাস্য

তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত একটি কোকিল

(আফগানিস্তান ঃ আগুন আমার ভাই)

আর একটি কবিতা আমরা লক্ষ্য করি ঃ

আমার বুকের মধ্যে তখন সিরাজদৌলার মতো হৃৎপিণ্ড

আমার দু'চোখের মধ্যে তখন লোরকার সেই চোখ

আর আমি সিরাজ সিকদারের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালাম

(এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

এই দু'টি কবিতার ভাবচিত্র বিপরীত। ধারণা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্বজাত মতাদর্শিক কারণে কবিতা দু'টি আজ কথা বলছে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ভৌগোলিকভাবে পরাজিত অস্পষ্ট অন্ধকার যখন কবিকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায় তখনই চিন্তা ও জটিল মিথস্ক্রিয়ার কবি উৎপাদন করেন দুর্বার গতিসম্পন্ন কবিতা। এরা কারা? যারা কবিকে মৃত্যুর কোলে শোয়াতে চায়? এর উত্তর খুঁজতে আমরা মিঃ জাঁ পল সার্ত্রের দরবারে হাজির হই। ফ্রানজ ফাননের 'The Wretched of the Earth' গ্রন্থের ভূমিকায়

www.pathagar.com

মিঃ জাঁ পল সার্ত্রে লিখলেন ঃ ইউরোপীয় সেরাংশ (elite) একটা দেশীয় সেরাংশ তৈরির কাজে হাত দেয়। তারা প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের বেছে নেয়; পশ্চিমা সংস্কৃতির ছাপ স্থায়ীভাবে তাদের শরীরে এঁকে দেয় তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে শরীরে দাগ কাটার মতো করে। তাদের মুখে ঠেসে দেয় গালভরা সব বুলি। শাসন কেন্দ্রে কিছুদিন রাখার পর তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায়. একটা ধোপ দিয়ে। একটা চলমান মিথ্যা হয়ে যখন তারা ফেরত আসে, নিজেদের ভাইদেরকে আর তাদের বলার কিছু থাকে না, তারা শুধু প্রতিধ্বনি করে।' এই প্রক্রিয়াই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে Apply হয়। তবে ভিন্নমাত্রায়, ভিন্ন আঙ্গিকে। এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ধোলাইয়ের পরিবর্তে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়াকে শ্রেয় মনে করে। কারণ এ অঞ্চলে মস্তিষ্কের কামরা শূন্যতায় পরিপূর্ণ। আমরা 'এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো' কবিতায় হাহাকার, আকুলতা, দীর্ঘশ্বাস-এর বিশাল বোঝার নীচে মহত্তর কবিসত্তার মানসদিক খুঁজে পাই। একটি অবচেতন মন বিশ্বাস, আপ্তবাক্য ও জ্ঞানের ধারক হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী তলোয়ারের নীচে বলি হতে হল। জীবনপথে পরিব্রাজক বা অভিযাত্রিক ভূমিকায় কবি পদচারণা করেছেন তাই বাস্তব ও কল্পনা মিলে সৃষ্টি হয়েছে TEXT।

একজন কবি যখন দাঁড়ান, তখন শরীয়তুল্লাহর শুভ্রতা

চাঁদোয়ার মতো দুলতে থাকে আকাশে।

একজন কবি যখন দাঁড়ান

তখন সমগ্র আন্দামান পরিণত হয় একখণ্ড শের আলীতে।

অথচ স্বদেশের প্রিয় মাটির ওপর কবিকে দাঁড়াতে হলো

বেনজামিন মলয়সির মতো বঞ্চিত লাঞ্ছিত ব্যথিত ক্ষুব্ধ অব্যক্ত কষ্টের পাথর বক্ষে নিয়ে

(এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

আমরা আবদুল হাই শিকদারের কবিতার এ পর্বে বলেছি, তিনি একজন সময়ের কবি, যেহেতু আধুনিকতাবাদী কবি সমাজ কবিতার একটি ছক বেঁধে দিয়েছেন। আবার উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা সামাজিক সুষমায় বিজ্ঞানময় তত্ত্ব ও তথ্যের গুরুত্বে নিজেদের নিয়ে ভাবছেন, সেখানে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একটিমাত্র সম্পর্ক সম্ভব। একজনের হাতে থাকবে চাবুক, আরেকজনের হাতে থাকবে রক্তাক্ত পিঠ। তবে সেই চাবুক যে চিরদিন এক শ্রেণীর হাতেই থাকবে একথা বিশ্বাস করেন না কবি আবদুল হাই শিকদার। যা তার কবিতায় প্রতীয়মান। প্রকৃতির সব সৌন্দর্যে রক্তের গন্ধ আছে। ব্যাঙ খাচ্ছে কীট, ব্যাঙকে খাচ্ছে সাপ, সাপকে খাচ্ছে ঈগল। নৈরাশ্যবাদিরাই কেবল এ শিকল মেনে

www.pathagar.com

চলেন। আর তারই প্রভাব আমরা দেখি কবি জীবনানন্দের কবিতায় পেঁচার ইঁদুর ধরা পর্ব। সকলেই একই ঘরনার হলেও কেউ কেউ আলাদা ঘরনার। এই আলাদা ঘরনার কবি আবদুল হাই শিকদার। সমাজ, সামাজিক ঐতিহ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং স্থিতিময় বিভিন্ন ঘটনার প্রমাণাদি তাঁর কবিতার মাঝে হাজির হয়ে যায় একান্ত প্রয়োজনে। হতাশা নয় আশা আছে, দুঃখ নয় স্বপ্ন আছে, নির্জীবতাকে পাশ কাটিয়ে সবুজ সফল মানবিক ফসল তিনি উঠিয়েছেন নগর কবিতায়।

i. তাবত ব্যর্থতা থেকে ফিরিয়েছি আপন চাবুক
নতুন স্বপ্নের ঝড়ে দূর হোক সকল অসুখ
উদার আকাশ থেকে হে বিশাল প্রিয় বৈশাখ
আমাদের ঘরে ঘরে আজ শুধু আলোই ছড়াক

(বৈশাখ ঃ লোডশেডিং নামিয়াছে)

ii. রুখসানা
আবার ফিরবো আমি মাইল পথ চিনে,
আমাদের রমনায় আমাদের ফেলে আসা রজনী ও দিনে,
ঝোঁপ-ঝাড়ে বুক পেতে খুঁজবো সে হারানো ঝিনুক,
কোথায় রইলো গোপন না ফোটারা প্রমুখ।
চাঁদের স্নিগ্ধরোদ মাঝরাতে গেলাস উল্টালে,
মানুষেরা নিঃশেষ হলে পাথরে প্রবালে,
আমি শুধু জেগে রবো ভিখেরী আতুর রাতকানা,
রুখসানা

(রুখসানা ঃ লোডশেডিং নামিয়াছে)

বিপ্লবী, বিদ্রোহী এবং প্রেমিক ঃ প্রচণ্ড বিপ্লবী কণ্ঠ যেমন শিকদারের কবিতার পংক্তির মাঝে ছড়িয়ে আছে তেমনি বিপ্লবীর পর্যায়ে পৌছে কবিতার পংক্তি হারিয়ে ফেলছে কাব্য দ্যোতনা, এমন কবিতাও আছে। সেগুলোকে অবশ্য কবিতা বলা যাবে কি যাবে না তা যুক্তি-তর্কের ব্যাপার। কারণ, কবিতা সবসময় স্পঞ্জের মত নরম হবে, এমনটি আশা করাও ঠিক নয়। যেহেতু শিকদারের রক্তে আছে বিদ্রোহের আগুন, তাই তাঁর কাব্যফসল ঝাঁঝালো হবে বৈকি। কারণ, বিপ্লবের পথচলা যে সৈনিক অনবরত পবির্তনে বিশ্বাসী

www.pathagar.com

তার কবিতায় যখন প্রেম আখ্যান চলে আসে সেখানে যৌনতার গন্ধ পাওয়া যায়। এবং একথা বলতে দ্বিধা নেই, শিকদারের রোমান্টিক কবিতার মাঝে কুয়াশার ন্যায় চাদর বিছিয়ে আছে কামনার আগুন। যা আবদুল হাই শিকদারকে প্রবল যৌন আবেদনে সাড়া দিতে তাগাদা দেয়। কবিতার মহার্ঘ বিষয় সেটিই, যা পাঠক সমাজকে আলোড়িত করে। কবি বিপ্লবী একথা আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে, যৌনতার ক্ষেত্রে নীল কামড়েও যে কৃতকার্যতাও স্বীকার করতে হয় অনেকটা গোপন ব্যালটে নির্বাচনের মতোন। আমরা কয়েকটি কবিতার দিকে দৃষ্টি দেই। নন্দনের নান্দনিকতার মাঝে দাঁড় করিয়ে দ্যায়। এ কোন আবদুল হাই শিকদার? বিপ্লবী না প্রেমিক? নাকি কামুক পুরুষ?

রাগ করেছি ধিঙ্গিমেয়ে ছিনালপনায় পুড়ছে বুক
আমার সোহাগ উগড়ে দিয়ে শহর ঘুরে লুটছো সুখ
কার বিছানার সঙ্গী এখন পেখম খোলা রাত গভীরে
আমার চুমু সরিয়ে রেখো নয় তোমারও পুড়বে মুখ

(মানব বিজয় কাব্য)

রাখ শালী তোর ভেলকিবাজি তিনশ' নাগর মাই চাটালি
এক ভাতারে মন ভেজে না নিজের কপাল নিজে ফাটালি

(মানব বিজয় কাব্য)

তাড়াহুড়া করে সরাসরি জেনো বিছানায় আমি যাবো না
যে খাবারের নেই দূরের ঢেকুর সে খাবার আমি খাবো না
দুই হাতে চাই দুইটি পদ্ম মাংস ও মন পুরোটা
আধলায় নেই বাকিও বুঝি না লেজ দিলে দাও মুড়োটা।

(মানব বিজয় কাব্য)

টব যাচ্ছিলো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ছাদে
লাল দুটো টবে দু'দুটো গোলাপ ছিলো
পিছনে পিছনে আহা উহু করতালি
ঘ্রাণানুপ্রাণিত ছুটে যাচ্ছিলো ছাদে

www.pathagar.com

ছাদে ছিলো শাড়ি পেটিকোট আর ব্রা

ব্রাগুলো ছিলো হুকে আটকানো ছাদে

(সন্ধ্যার ছাদ ঃ আশি লক্ষ ভোর)

শয্যায় নামে কালবৈশাখী আণবিক টর্নেডো

পরস্পরের দিকে তাক করে মিশাইল টর্পেডো

শব্দে শব্দে নিস্তব্ধতা ভয়াবহতম শীত

সাগর উড়িয়ে আনে নীলমদ উদ্দাম সঙ্গীত

শেষ হয় তাড়া তাণ্ডব টব-টাওয়ার সিগন্যাল

ভেঙে পড়ে ক্ষোভ শহরের ছাদে– যেন এক হরতাল

সমরতন্ত্রের বোতাম ছিঁড়েছে সহসা অভিশাপে

চামড়ার নিচে ধুক পুক পুক দুরু দুরু করে বুক

এতোটা খনন মৃত পড়ে থাকে সরে না সুখের অসুখ।

(শয্যা পর্ব ঃ আশি লক্ষ ভোর)

আমি পড়তে পড়তে এক বৈষ্ণবীর স্তন আঁকড়ে ঝুলতে থাকি

নদীর খাড়া পার বরাবর

(মানুষ মঙ্গল ঃ আশি লক্ষ ভোর)

১৮১৯ সালের ৮ জুলাই কীটস তাঁর না পাওয়া প্রেমিকা ফ্যানি ব্রাউনকে এক কাব্যময় চিঠি লেখেন। আমরা শিল্পের নন্দন দিকটি লক্ষ্য করি- 'কারো অনুপস্থিতি আমার ইন্দ্রিয়ের ওপর ঐশ্বর্যময় শক্তির প্রভাব অনুভব করি এবং এক স্নিগ্ধ কোমর প্রকৃতি আমার ওপরে ইস্পাতের নক্শা এঁকে যায়। এরকম প্রেমের কোনো শুরু আমি ভাবতে পারি না, যেমন তোমার জন্যেই কবি, তুমিই সৌন্দর্য। চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে এই যে শিল্পে মাধুর্যতা ফুটে উঠেছে, এটিকে আমরা কি বলবো? প্রেমদর্শন নাকি পাথরের উপর সবুজ শ্যাওলার সৌন্দর্য?' আমরা আবদুল হাই শিকদারের কবিতায় প্রত্যাবর্তন করি। নারী সৌন্দর্যের অন্যতম নিদর্শন। নারীর সাথে সে কারণেই কেবল ফুলের তুলনা চলে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম, বিপ্লবী শিকদার উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহের বাণী শুনাতে গিয়ে একসময় কামনার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সর্বশক্তি দিয়ে। কবিতার সর্বশেষ যে সৌন্দর্যভূমি, তাকেও কবি সুখের টর্নেডো মার্কা অসুখ দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ছেড়েছেন।

www.pathagar.com

চিৎকার করে জানান দেন বৈষ্ণবীর স্তন ধরে ঝুলে আছেন। যেন আধুনিককালে আধুনিক নগর কবি বৃক্ষের রশির পরিবর্তে নারীর স্তন ধরে ঝুলে যমুনা নদী পার হবেন। আধুনিক রোমিওর পরিবর্তে শিকদার আমাদের সামনে হাজির হচ্ছেন আধুনিক টারজান হয়ে। এই টারজান ন্যাংটি পরে দৌড়ায় না। রীতিমত স্যুটেড-বুটেড হয়ে পেটিকোট আর ব্রা নিয়ে গবেষণা চালান। আবার কখনো কাহিনী যুগের আদলে বাদশা/রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নারীকে ভোগবস্তুতে পরিণত করেন। সুরার নেশায় চুর হয়ে রাজা যেনোবা নারীকে ডাকছে কামনার ভাষায়- 'তাড়াহুড়া করে সরাসরি জেনো বিছানায় আমি যাবো না'। আবার আর এক কবিতায় শিকদার শ্রমিক সমাজে অশিক্ষিত দলপতির মতো চিৎকার করে বলে ওঠেন- 'রাখ শালী তোর ভেল্‌কিবাজি তিনশ' নাগর মাই চাটালি'। এমন অকথ্য শব্দ কবিতায় সংযোজনের ফলে কাব্য সুষমা বিনষ্ট হয়েছে। আর আবেগের প্রচণ্ড তাড়নায় নারীর সৌন্দর্য বিভাকে করেছেন রক্তাক্ত, অপমানিত। তবে কবি বলে কথা। সৈনিক যখন ব্যারাক ছেড়ে সম্মুখ সমরে যায় তখন সবকিছু ভস্ম করে দেয়। সৈনিকের যতই যুদ্ধ উন্মাদনা থাকুক সে কিন্তু গৃহী। আমরা বলতে চাচ্ছি, একজন কবি আবদুল হাই শিকদার যিনি ঝড়ের বেগে কবিতায় যৌনতার অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন কোনো রকম সেন্সর না করেই তিনি সম্ভবত কল্পনা, আবেগ এবং অদেখা বিজ্ঞান প্রসংগে এমন বাক্য সংযোজন করেছিলেন। কারণ আজকাল আর তার কবিতা বালুকাবেলায় নগ্নপায়ে হাঁটে না। সংযত ও পরিণত শিকদার এখন আমাদের সামনে আসছে। সে প্রসংগে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

কতোটা থিয়োরি কতোটা কবিতা ঃ যে কবিতা আজ তার বাঁচবার অধিকার প্রতিপন্ন করতে চায়। তার কাছ থেকে বিশেষ অর্থে একরকম 'প্রজ্ঞান চরিত্র' আমরা দাবি করতে পারি। তার উপাদানের ভেতরে সে উপাদান-প্রদত্ত সমস্যগুলোকে আদল দেবে এবং ঐ উপাদান নিছক প্রাকৃত উপকরণ নয়, সামাজিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন; এই সূত্রে কবিতা যেসব নিরসন খুঁজে পাবে সেগুলো থিয়োরিরই সমতুল্য; তাদের মধ্যে মিশে থাকবে সামাজিক নানা উপপাদ্য প্রয়োগ প্রযুক্তির সঙ্গে যাদের গ্রন্থিবহুল এবং দুরূহ হতে পারে, এমনকি কিছুতেই নিজেদের অনায়াসে প্রয়োগসিদ্ধ না করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মর্মেই সবকিছু নির্ধারিত হয়, তারা কিভাবে সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করছে কিংবা আদৌ করছে কিনা।' থেয়োডোর আডোর্নোর এই উক্তি শুরুতে জপে আমরা এবার এগোই, শিকদারের কবিতায় কতোটা থিয়োরি কতোটা কবিতার কাব্যরস বিদ্যমান গণমাধ্যম আর আকাশ সংস্কৃতির এই বিশাল জয়জয়কার যুগে কবিতার পাঠকই বা ক'জন? এই সময়ে কবিতা রচনা করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। আমরা বলতে চাচ্ছি, সমাজ ও সংস্কৃতির শিরদাঁড় যখন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিত্য চমকের আশায়, তখনই কবিতার বিষয়বস্তুতে অর্থদ্যোতনায় আস্তরণ লাগাতে হয় বার্জার এলিট পেইন্টের ন্যায় আধুনিক শব্দ ও

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের রঙিন চিত্রায়ন। মূল সেই ভাবের দেশেই গ্রোথিত কিন্তু চলাচল আধুনিক যান্ত্রিকতার মাঝে। একজন আবদুল হাই শিকদার প্রচণ্ড বেগে কামজ কবিতা লেখেন আবার নতুন ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন কিছু লিখে ফেলেন যা মাটির শরীরে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রাণিত করে তোলে। আমরা আবদুল হাই শিকদারের কবিতায় এমনই বাক্ লক্ষ্য করি। যা দেববাণী না, আবার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত ভাষার ব্যাকরণও না। শিকদারের এই দিককে আমরা কবিতার থিয়োরি না বলে বলতে পারি ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকার। ইতিহাস এ পথে হাঁটে, আর ঐতিহ্য হাঁটে অন্য এক পথে আর একজন কবি দুই পথকে এক করে নিজেদের দিকে টেনে আনেন মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো। শিকদার এই কাজটি সফলতার সাথে করেছেন, যা আমাদের চোখে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আর এ-তো এক কবি, যে নাকি তার জাতির সম্ভ্রম ও মর্যাদার জন্য

কটিদেশে সর্বদা ঝুলিয়ে রাখতো তরবারি।

আর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি সাদা কাফন তারপর

কারবালার প্রান্তরে কাশেমের মতো

বলিভিয়ার জঙ্গলে চে গুয়েভারার মতো

কবির রক্তাক্ত শরীর লুটিয়ে পড়লো বধ্যভূমির ওপর

এই বধ্যভূমি একদিন কবির স্বদেশ ছিলো

(এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

১৯৭১ সাল রক্তের বন্যা/ কোথায় উদ্ধার তীর কোথায় স্বজন/ নায়ক আমার/ অকস্মাৎ জেগে ওঠে নূহের জাহাজ/ লাফ দিয়ে ওঠে সিংহশাবক/ ভূরঙ্গামারীর প্রতি জনপদে/ রৌমারী আর জাফলং থেকে/ ঝড় ওঠে আসে স্বপ্ন পাহাড়/ নায়ক তোমার শব্দের বরাভয়/ ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ নেচে ওঠে/ ইথারের বুক ফেটে জেগে ওঠে কমল কলি/ জেগে ওঠে দেশ মুক্তিযুদ্ধ/ নায়ক আমার বুকের রক্ত মুক্তিযুদ্ধ।

(জিয়া শহীদ জিয়া)

মানব প্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য থাকে মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তি বিশেষের যে অনন্য সাধারণ প্রকৃতি তা দিয়েই সৃষ্টি হয় সাহিত্য, থিয়োরি নয়।

চিত্তে নীল জোসনার ঢেউ ঃ কবিতার ভাষা সংবেদনশীল, অর্থের দিক থেকে সম্প্রসারণশীল-হৃদয়ের আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে। আবেগ বা মনোভাবকে জাগ্রত করবার যে ক্ষমতা ভাষার আয়ত্তাগত, সে ক্ষমতাকেই ভাষা কাব্য-ভাষা হয়, যাকে ল্যাটিনে বলা

www.pathagar.com

হয় VOX Poetica. এ ভাষা শুধু আবেগকেই প্রকাশ করেন না, অপরোক্ষ বোধকেও স্পষ্ট করে। শব্দের কিছু অর্থ যেহেতু ধারণালব্ধ, আবার কিছু অর্থ অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ। ভাষার ভিত্তিগত উপাদান যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ এরা বস্তুকে নির্দেশও করে, হৃদয় বৃত্তি প্রকাশেও সহায়তা করে। কবিতার ভাষা যেহেতু এই ভাষার দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রেই সক্রিয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আবদুল হাই শিকদারের কয়েকটি পংক্তির দিকে তাকাই।

আর গাঢ় রাত্তিরে আমার সে প্রেম/ অবহেলার শেষ পারে পেয়ে যায় ঘুমুবার চমৎকার জাজিম কোদালের

(জাজিম প্রাপ্তি ঃ আশি লক্ষ ভোর)

ফিলিস্তিনের প্রতি ধূলিকণা আমাদের মতো লাল/ নিকারাগুয়ায় আমরা স্বপ্ন দেখি/ আমরা কালো নেলসন ম্যান্ডেলা/ ইরিত্রিয়ার মরুভূমিতে আমরা ফোটাই ফুল।

(নতুন ইশতেহার ঃ আগুন আমার ভাই)

এ সকল বাক্যে বিশেষ-বিশেষ কথাই স্পষ্ট হয়েছে। চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর হৃদয়ের আবেগকে উচ্ছ্বসিত করেছে, প্রাণবন্ত বাস্তবকে প্রতিভাসিত করেছে। বস্তুর 'জীবন' প্রকাশের ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে। অনুভূতি ও আবেগের এই যে সত্যদীপ্তি, একেই আমরা কাব্য-প্রকাশ বলবো। শিকদারের কবিতায় এই যে বোধ বা অনুভূতি তা কল্পনার সঙ্গে বিজড়িত। আমরা কবিতায় মাঝে-মাঝে রূপক উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে থাকি বস্তুকে ভাষায় জীবন্ত ও বাস্তব করে তুলবার জন্য। বস্তুকে জীবন্ত করতে হলে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দে, বাক্যাংশে বা চরণে নাটকীয় আবেগ বা গতি আনবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা বলতে চাচ্ছি–প্রকৃতির কথা, প্রাত্যহিক জীবনের কথা, অনুভবের বস্তু বা আদর্শের বস্তুর কথা কবিতার ভাষায় বলতে যে গতিময়তার প্রয়োজন হয়, আবদুল হাই শিকদারের কবিতার মাঝে সে শক্তি আছে। আবদুল হাই শিকদার চেষ্টা করেছেন অবৈষয়িক এই বিষয়ের রূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ক্ষেত্রে থেকে, সাধারণ বাস্তবতা থেকে জীবনকে উদ্ধার করে এনে শব্দের জগতে দারুণ প্রাণবন্ত করতে সক্ষম। তবে শব্দ ক্ষেত্রকে জীবন্ত ও বাস্তব করে বস্তু জগৎকে আরো বেশী সত্যমূল্য দিতে গিয়ে অনেক সময় কবিতার যে কাব্যসুষমা তা হারিয়ে ফেলেছেন। অতিরিক্ত আবেগ এর জন্য মূলত দায়ী। আমরা কয়েকটি পংক্তি লক্ষ্য করি ঃ

ক্যাম নদীর তীরে বসিলাম রহমত আলী

বসিলাম ইকবাল বসিলাম রাজিব সোনিয়া

বসিলাম হারভার্ট বসিলাম সোফিয়া লরেন

www.pathagar.com

বসিলাম হাওয়া বিবি বসিলাম আদমের পুত

(ক্যামব্রীজ'৯৫ ঃ এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো)

আমাকে রেখে আমার দ্বারে কোথায় হলি নিরুদ্দেশ

হায় আবাগী হারামজাদী অনুতাপের নেইকো শেষ

বোতাম খোলা বুকের জমি তোর কারণে শূন্য আজ

আসবি না তুই অন্ধ আড়াল বিজন বেলার গন্ধ অশেষ।

(মানব বিজয় কাব্য)

ফজল শাহাবুদ্দীন আরেক শায়েব,

গণ্ডারও যোগ্য নয় ইহার পায়ের

ইহার তুলনা শুধু ধোলাইর খাল

দালালি করিয়া বহু কামাইল মাল

(খেজাব পর্ব ঃ আগুন আমার ভাই)

কবিতা ও বাক্যবন্ধ দু'টি আলাদা বিষয়। কবিতার ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দের অর্থ অনেক সময় সংকীর্ণ হয়ে যায়। শব্দই কবির মানস সৌকর্য ও সমৃদ্ধির প্রতিনিধি। শব্দ, বাক্যাংশ বা চরণের বিন্যস্ত হয়ে নতুন নতুন অর্থের আবেদন আনে। আমরা ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেইকের একটি কাব্যশিল্প লক্ষ্য কবি।

The see world in a grain of sand

And a heaven in wild flower;

Hold infinity in the palm of your hand

And eternity in an hour.

বালুকা-কণায় একটি পৃথিবী দেখা

এবং একটি স্বর্গ বন্য-ফুলে

সীমাহীন কিছু হাতের মুঠোয় ভরা

নিরবধিকার এক প্রহরের মূলে।

কবির নির্মাণশৈলীর বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু আবদুল হাই শিকদারের

www.pathagar.com

সাধারণ শব্দপুঞ্জ দিয়ে নতুন যে কালো অধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন কবিতায়, তা প্রচণ্ড আবেগায়িত হবার ফলে দুর্বল পংক্তিমালা হয়ে গেছে। একটি কবিতা সমগ্রে এ ধরনের কবিতার স্থান না দেয়াই উত্তম। বিশেষত যেখানে ভালো কবিতা বিদ্যমান। সেইসব ভালো কবিতার শব্দ গোলাপ নিজের অর্থ বহন করে না। বিশেষ বিন্যাসে সে নতুন কথার কোলাহল তুলে আমাদের ভাবায়। শিকদারের জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি ঠিক ছিলো কিন্তু কিছু কবিতা(?) সংকলিত করায় পুরো সমগ্রটির মাঝে-মাঝে যেন শিল্পবোধের পরিচয় ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমরা বলতে চাচ্ছি, অন্যায়কে পুরোমাত্রায় বিসর্জন দিয়ে শিকদারের এই নবডঙ্কা ওড়ানো কবিতার অঙ্গনে যতোই বিদ্রূপাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হোক না কেন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কালিক প্রেক্ষাপটে এই পংক্তিগুলো ইতিহাসসত্য দলিল।

জীবনের মানদণ্ডে আধুনিক কবিতার ইশতেহার ঃ আবদুল হাই শিকদারের কবিতা কি আধুনিক কবিতার ধারাবাহিকতার ছায়া আশ্রিত? নাকি নতুন এক ইশতেহার নির্মাণ করেছেন কবি। যে ভাষা বিদ্রোহের, বিপ্লবের, প্রেমের, মিলনের কিংবা বিরহে স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত। আমরা শিকদারের কবিতায় যে বিষয়টি প্রকোপভাবে লক্ষ্য করি তা, তিনি আত্মকেন্দ্রিক কবি নন, তাঁর সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা Positive emotion দ্বারা পরিচালিত। সমাজের বিশৃঙ্খলা নৈরাশ্যতা ক্লেদাক্তময় নোংরা অধ্যায়গুলোর বিরুদ্ধে আবদুল হাই শিকদারের রচিত পংক্তিগুলো অতি-আধুনিক, অতি-বিপ্লবী, অতি-সাবধানী ভঙিমায় আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের দিকে তাকাতে আগ্রহ সৃষ্টি করে। কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় পল্লীগ্রাম থেকে শহরের পিচঢালা পথ পর্যন্ত প্রপাগান্ডার গালিচায় শিকদারের কবিতা শাণিত অস্ত্রের মতো উদ্যত হয়ে ওঠে। যেহেতু ধনতন্ত্রী সমাজ এখন রুদ্ধগতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তার অন্তর্নিহিত সঙ্কট অক্টোপাশের মতো চতর্দিকে তাকে ঘিরে রেখেছে এখানেই আবদুল হাই শিকদার সাম্যবাদের পতাকা ওড়াতে চেয়েছেন। আধুনিক কবিতার সকল সীমাদ্ধতাকে তিনি শেকড় থেকে টেনে তুলে তাতে নতুন প্রাণ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে হাজার বছরের বাংলা কবিতার যে লিরিক আমেজ তাকে উনিশ শতকের আধুনিক কবিতার পুরুষরা যেভাবে ভেঙে গদ্য-ফর্মে এনেছেন, শিকদার সেখানে অনুপ্রবেশ করে রসশাস্ত্র দিকে ততোটা বিবেচনা না করে, আবেগের রহস্যব্যঞ্জনায় ব্যাপৃত না থেকে বাঙালি কবির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর কবিতায় সাম্যের হাওয়া এমনি বেগে বইছে যে, তাঁর অন্তঃসলিল মননধারাও নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনি, নিজের স্বভাব নিজের প্রতি বিদ্রোহ করে বলছে ঃ

আবদুল হাই শিকদার এই নাম শোনেনি কে
মমতার রেণু দিয়ে মানুষ ও মাতৃভূমি বুনেছে যাকে
যুদ্ধ যার নিত্য সাথী প্রেম যাকে করেছে আকুল

www.pathagar.com

আনন্দ ও অশ্রুতে ভেজা এমন গভীরতর নাম,

যার ঠোঁট সর্বদা শুকরিয়ারত নিজ মাবুদের

- আল্লাহর বান্দা সে

এমন মোহন আগুন কে দেয় সরিয়ে দূরে?

(আবদুল হাই শিকদার ঃ লোডশেডিং নামিয়াছে)

আধুনিক কবিতায় আছে একদিকে ছন্দের যন্ত্রকৌশল বর্জন, অন্যদিকে ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা। তাছাড়া আছে সাম্যবাদের ধুয়ো ভলো-মন্দ মাঝারি গলায় আধুনিক কবিরা যেখানে বিপ্লবের আগমনী গান গেয়েছেন সেখানেই আবদুল হাই শিকদার সংকীর্ণতার দেয়াল টপকে একহাতে একতারা অন্যহাতে আধুনিক সঙ্গীত সরঞ্জাম বাজিয়ে গাইছেন জীবনের জন্য আধুনিক গান। প্রগতির জন্য গান। সাম্যের জন্য গান। আমরা একথা বলতে পারি নিঃসংকোচে যে সভ্যতার স্টীম রোলার যেন চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙেচুরে দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে আর দুঃসাহসী আমাদের কবি রয়েছেন সৌন্দর্যের দরজা আগলে না। এমনটি শিকদারের কবিতায় কাব্যদর্শন নয়। তার কণ্ঠ ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ হয়ে আমাদের কাছে বাজতে থাকে। আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তার বাণী। নব যুগে আধুনিকায়নের এই ঘরানায় এই নব সৃষ্টিই আসলে আরেক আধুনিক কবিতা। যা যুগের চাহিদাকে আশ্রয় করে নির্মিত। কিন্তু এর ব্যাপ্তিকালের মানদণ্ড ছড়িয়ে উত্তরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিশ্বাসবলে আমরা বলতে পারি, শিকদার আধুনিকমনস্ক এক আধুনিক সময়ের কবি।

মৌলিকত্ব, ধারাবাহিক বৃষ্টির কবি ঃ কিছুদিন থেকে আমরা বেশ জোরের সাথে চিৎকার করে বলছি, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা কবিতায় কোনো মৌলিক স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এখন কিছু রচিত হচ্ছে শুনতে একই রকম লাগে। এ ধরনের আপ্তবাক্য আমরা পাচ্ছি অস্পষ্ট এক মহল থেকে। বাংলা কবিতার যে বিশাল বিস্তৃতি, এখানে আমরা ক'জন মৌল কবির খবর রাখি। আমাদের চার দেয়ালের পাশে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকুইবা প্রসারিত। আমরা আজকাল আর নিরপেক্ষ নামে রাজনৈতিক শব্দ ব্যবহার করে বলতে চাই, সর্বত্র শূন্যতা। পঠন-পাঠন ও দেখার দরিদ্রতা আমাদের এতোটাই নিম্নমানের, আমরা ভুলে গেছি, কে আমরা?

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব লড়াইয়ের কামড়াকামড়িতে আমরা পর্যুদস্ত এক দঙ্গল সাহসী অথচ ক্লান্ত সৈনিক। আর তাইতো আজকাল কবি পল্লীতে দেখা যায় নিজেকে কবিতার চেয়েও আকর্ষণীয় ও জরুরী করে তোলার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন, এতে কবিতার কোনো

www.pathagar.com

উপকার তো হয়ই না বরং কবি উচ্চাশার চাপে শিল্পসত্তাকে খুইয়ে বসেন। কবি আবদুল হাই শিকদারের কবিতা অঙ্গনে হাঁটাহাঁটি করলে এ ধরনের উচ্চমাধ্যমিক আতরের সুগন্ধীযুক্ত পদ-আওয়াজ পাওয়া যায় না। তবে যে বিষয়টি আকৃষ্ট করে তা মৌলতা। নিজ দেশের স্ব-পক্ষে এমন কলমবাজ কবি এ সময়ে বিরল। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শিকদারের ইঁদুর দৌড় দৃশ্যগোচর হয় না। পরিবর্তে বিবর্তনশীল এই সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত নীতি, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আবদুল হাই শিকদার রচনা করেছেন কবিতা। ধারাবাহিক বৃষ্টির মতো। অঝোর ধারায় ঝরছে। লোকায়ত স্মৃতিপিঠে সুড়সুড়ি না দিয়ে আধুনিক কালকে চিহ্নিত করেছেন কবিতার বিষয়বস্তু নির্মাণে। এই বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শিকদার কবিতার নান্দনিকতাচ্যুত হয়েছেন স্বরগ্রামে তারতম্য দেখা দিয়েছে, এ জায়গায় উপবিষ্ট না হয়ে আমরা লক্ষ্য করি কাল চেতনা কতোটা পরিস্ফুটন হয়েছে? প্রকৃতি ও সংস্কৃতির কাছে আজ একবিংশ শতাব্দীর এই ঊষাপ্রান্তে সভ্যতা যা কিছু গ্রহণ করছে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে। আমরা যারা কবিতার জমি খোঁড়াখুঁড়িতে ব্যস্ত, চূড়ান্ত আধুনিকতার নিরিখ খুঁজে ফিরছি প্রতিটি শব্দে, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ধ্রুবন্দি রসের পাশাপাশি ঝাঁঝালো-বারুদসম গন্ধ আছে এমন কবিতাও আধুনিকতার চরম নিদর্শন হতে পারে, যদি সেখানে কাব্যিক দ্যোতনা থাকে। আবদুল হাই শিকদারের কবিতায় এই আধুনিক ঝাঁঝালো দিক প্রকটভাবে আছে। আমরা একথা বলতে পারি। শারীরিক ঘাম, স্বপ্ন, সংগ্রামের ত্রিভুজ এই অভিযানে কবি কতোটা পথ সমানে গেছেন কিংবা বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন সে প্রসঙ্গ নয়, বরং দেশজ মাটির প্রতি কবির এই আকুলতা কবিতার রূপারেখাকে ধারণ করলেও শিকদার কবি হিসেবে লোরকার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে যান বাংলাদেশের মাটিতে। এখানেই শিকদারের কবিতার গভীরতর দিক উন্মোচিত হয়ে যায় আমাদের সামনে। আমরা তিন ভুবনের মাঝে পথ চলতে গিয়ে প্রায়শ যে সকল সমস্যা জর্জরিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, শিকদারের কবিতার পটভূমি সে বিষয়কে কেন্দ্র করেই নির্মিত। সে জন্যই কবি আবদুল হাই শিকদারকে কবিতা পাড়ার পড়শি বলতে পারি। জীবনানন্দ, জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ, কিংবা শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের পথে না হেঁটে নিজেই পথচলার পথ তৈরি করার প্রকল্প নিয়েছেন। সে কারণেই আশির দশকের আবদুল হাই শিকদারকে জানতে হবে। শিল্পের জন্য শিল্পীর এই যে নিবেদিতপ্রাণ পথচলা, এ তো আমাদের সাম্প্রতিক সময়ে বিরল ঘটনা।

শেষ কথা ঃ বাংলাদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃত রাজনীতির সাথে আবদুল হাই শিকদারের কবিতা মিশে গেছে আন্তরিক তাপে। অনেকেই হয়তো ছন্দ বা অন্যান্য কবিতা ফর্মের কারণে শিকদারের কবিতার নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু ইতিবাচক দিক যেভাবে দেখা যায়, তা সাধারভাবে অনেকেই খুঁজে নাও পেতে পারে। কিন্তু একজন কবির এতে ন্যূনতম ক্ষতিও হয় না। প্রজ্ঞা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে,

www.pathagar.com

আমরা খুঁজে পাবো শিকদারের কবিতার আসল কাব্যরস। ছন্দের নৃত্যঝংকার কিংবা গজলের গীতলধারা আমাদের যেভাবে মনোহরণের মন্ত্র ছাড়ায়, পাশাপাশি দেশপ্রেমের বিদ্রোহবাণী আমাদের রক্তে জাগিয়ে দেয় সমাজ, স্বদেশ ও পৃথিবী কেন্দ্রিক ভাবনার শুদ্ধ অভিসার। এভাবেই শিকদার তার কবিতার আয়তনকে দীর্ঘ করেছে। ক্রমে ক্রমে যা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। বিস্ময় ও আর্দ্রতা মাখা কণ্ঠে আবদুল হাই শিকদার যখন বলে ওঠেন 'এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো।' তখন বিড়ম্বনা ভোগের লজ্জায় শুধু কবি নন সমগ্র বাংলাদেশের মাথা কবির কাছে মুখ লুকায়। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কবির বুকে দীর্ঘশ্বাস গুমড়ে উঠেছে এবং সেই দীর্ঘশ্বাসের তাপে সমগ্র স্বপ্ন জগতে মহাভূমিকম্প হয়ে যেতে পারে। এই কবিতায় সমাজ, স্বদেশ ও সময়-সংলগ্নতার বোধ এমন তীব্রভাবে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে নাড়া দেয়, আমরা ভেবে পাই না, এতো বেদনা একজন কবি সহ্য করে শিল্পের জন্য শিল্পস্বাক্ষর রাখেন কি করে?

বর্তমান কাল কখনো টিকে থাকে না। কাল হারিয়ে যায় মহাকালে। আমরা সেই মহাকালেরই অতি সামান্য একটি অংশকে কখনো আমাদের অতীত, কখনো ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করি। বর্তমানের উষর মৃত্তিকার উপর পা রেখে ভবিষ্যতের পললভূমির দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন আবদুল হাই শিকদার। তাই তাকে আমরা সময়ের কবি ও জীবনের কবি বলতে পারি। ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশা, সাফল্য-ব্যর্থতায় ভরা জীবনের সবটুকুকেই তিনি ভালবাসেন। মাঝে-মাঝে শারীরিক শ্বাসকষ্ট তাঁর বুকে চেপে বসে। তখন কবির কাছে পৃথিবীর সকল বাতাস অপর্যাপ্ত মনে হয়। কিন্তু কষ্টের নিঃশ্বাস বুকে নিয়েও তিনি জীবনের জন্য দেশের জন্য সমাজের জন্য স্বপ্ন বিলিয়ে যান অকৃপণভাবে। মানুষের ভীরুতা, অসদাচরণ ও আদর্শচ্যুতি তাঁকে কষ্ট দেয়। তারপরও সেই মানুষ সমাজকে তিনি বুকে তুলে নেন, শোধরাবার জন্য। এখানেই কবি একজন আশির কবি হিসেবে তাঁর বিশেষত্ব মাহাত্ম।

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিকতা

১.০

কোনো মানুষই নির্বিশেষে বর্তমানের মধ্যে বাস করে না। বস্তুত সতত অপসৃয়মাণ সময় প্রবাহে নির্দিষ্ট বর্তমান বলে কিছুই নেই। দেশ ও কালের পরিক্রমায় মানব-চেতনা আদতে অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। মুহুর্মুহু বর্তমানে এই পেছনের সংলগ্নতাই অবিমিশ্র স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। নিরঙ্কুশ বিভাজ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্তমান বলে কোনো সংজ্ঞায় মানব মনকে প্রক্ষেপিত দেখতে চাওয়া তাই এক অবাস্তব ও অসম্ভব প্রত্যাশা বই নয়। এই বাস্তব সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কাব্যে আমরা ঐতিহ্যের বুনিয়াদ পাই। কারণ, ঐতিহ্যেই মানুষের ও মানবিক সংস্থার আবহমানের স্বরূপ ও তিতিক্ষার প্রকৃতি আমরা জানতে পাই এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যঞ্জনার অনুরণনকে ও নিশ্চিত নিরূপণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ঐতিহ্যের সঙ্গে তাই কাব্যের গভীর সম্বন্ধ অপরিহার্য। সঠিক ঐতিহ্যিক অন্বেষা এবং এর যথাযথ ব্যবহার কাব্যকে শুধু প্রগাঢ় মূল্যবান ও দেশ-কাল-পাত্র সান্নিধ্য করে তাই নয়, এর প্রভাব ও তাৎপর্যকেও অনেক বেশী উপযোগিতামূলক, অর্থময় ও সুদূরপ্রসারী করে তোলে। ঐতিহ্য যোগাযোগ দেশজ ও আন্তর্জাতিক একই সঙ্গে হতে পারে। তবে প্রত্যেক সার্থক কবিতারই মূলভিত্তি দেশজ ঐতিহ্য। প্রাথমিকভাবে দেশজ হয়েই তা আন্তর্জাতিক গ্রহণে, গ্রন্থণে ও শোষণে সম্প্রসারিত হয়। ঐতিহ্যের উৎসপথ ধরেই একটি দেশের রসগ্রাহিতার বিশিষ্টতার ধরন বুঝতে পারা যায়। পশ্চাতের আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রে থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশেরই মানবসংস্থার রসবোধ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্যই এর নিয়ন্তা।

www.pathagar.com

সাহিত্যের গূঢ় সমাজতাত্ত্বিক পটগ্রন্থির এই সৃজনসম্পন্নতার মাঝে আধুনিক সাহিত্যের অনুপ্রবেশ, তৎপর উত্তর আধুনিক সকল প্রকার প্রথাগত পূর্বের চিন্তার শিকলকে মুক্ত করে নতুন পতাকা ওড়াতে চায়। মৌলিকতার উৎকর্ষ বিধান, মানস উল্লাস, সময়মিধ রূপায়ণে উত্তর আধুনিক পূর্বকথার সকল বন্ধনকে নবপ্রাণ দান করেছে, একথা বলা যেহে পারে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে উত্তর আধুনিক চর্চাকারী একদল সাহিত্যিক এই নিরপেক্ষ মতবাদটিকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টায় সর্বদা জড়িত। যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা Postmodernism নাম দিয়ে এই মতবাদটিকে তাদের ধ্যান-ধারণামুখী প্রচার করে এর প্রসার ঘটিয়েছে, সেখানে আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই উত্তর আধুনিক মতবাদটি যাদে হাত দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তারা এটাকে নিজ সমাজ, জাতি-রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর ভূমিকা দিতে পারতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের হালফিল অবস্থা বড় করুণ। কারণ রাজনীতির লক্ষ্যহীন প্যাঁচালে উত্তর আধুনিক তাঁর সঠিক অবস্থান ত্যাগ করে সাধারণ মানের হয়ে গেছে। কিন্তু উত্তর আধুনিক বিষয়টি যতোটা পরিষ্কার, ততোটাই স্বচ্ছ। ধরা যাক, বাংলা সাহিত্যে সর্বশেষ যে তরুণ লেখকের আবির্ভাব, সে বিশ্বসাহিত্যের দশজন বিখ্যাত কবির নাম বলতে সময় নেবেন বড়জোর পাঁচ-সাত সেকেন্ড। আবার বিশ্ব কবিতা অঙ্গনের বিখ্যাত কবিতা 'The waste land'-এর অনেক ছাত্র মুখস্থও এবং ব্যাখ্যা করতেও পারবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই তরুণ বন্ধুটির মানসিকতার এই উন্নতিতে তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয় সে চণ্ডীদাশ, শাহ্ মুহাম্মদ সগীর, বিদ্যাপতি, মীর মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, নবীন চন্দ্র সেন, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এস ওয়াজেদ আলী, আলাওল, মুকন্দরাম, ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর, মিনুনাথ, শবরি পা, টেন্ডন পা, বাহারাম খাঁ, অক্ষয় কুমার বড়াল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কায়কোবাদ এই সব বিখ্যাত কবিদের/লেখকদের কতটুকু জানাশোনা আছে? পুঁথিসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা এসব পড়া নেই অথচ পি.বি.শেলী, জন কীটস, ডব্লিউ, বি. ইয়েটস, বায়রন, উইলিয়াম শেকস্পীয়র প্রভৃতি বিদেশের কবিদের লেখা পাঠ ও তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত। এমন একজন কবি/লেখকের হাতে যে কোনো মতবাদ

www.pathagar.com

বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, এটা স্বাভাবিক। সেই লেখক যদি কমুনিজমে দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হবে কমুনিজমকেন্দ্রিক, আবার কেউ মৌলবাদে দীক্ষা নিলে, তাঁর হাতে মতবাদটির রূপ পাল্টে মৌলবাদীর আদলে পরিণত হবে। কিন্তু জন্মকাল হতেই একটি মতবাদ তাঁর নিজের মত করে পথ চলে। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সমাজনির্ভরতা ভিত্তিক মতবাদটি কখনো গ্রহণযোগ্যতা পায়, কখনো পায় না। তবে একটি কথা স্বীকার্য, যে কোন তত্ত্বই অনিবার্যভাবে দেশ, কাল এবং শব্দের খাঁচায় আবদ্ধ এমনকি তত্ত্ব নির্মাতার শরীর বাঁকা পথে ছাপ রেখে যায় তত্ত্বে। সকলেই বাস করে একটি নির্দিষ্ট দেশে, মনোভাব প্রকাশ করে যে শব্দে তার চেতন ও অবচেতন অনুষঙ্গে জড়িত থাকে দেশান্তগত মানুষের চিন্তা-চেতনা, আর আমরা যেহেতু চিন্তা-চেতনার এই অবচেতন বিন্যাস বা পরিপাটিকেই বুঝি ঐতিহ্য নামে, আর এই ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরা, সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রসারতায় এই ঐতিহ্যিক চিন্তা-চেতনা লালন-পালনকারী সত্তার বর্তমান রূপটিকে আমরা বলতে পারি উত্তর আধুনিক। লক্ষণীয় ব্যাপার, আমরা ঐতিহ্যিক না হতে পারলে উত্তর আধুনিক আলোচনা-সমালোচনায় খুব একটা সুবিধে করতে পারবো না। রাস্তা পার হতে হলে ডানে-বাঁয়ে, পিছনেও দৃষ্টি রাখতে হয়, এটাই উত্তর আধুনিক ভাবা যেতে পারে। ঐতিহ্য আসলে একটি খাঁচা, যেখানে লুক্কায়িত লক্ষ বছরের সবুজ জমি। এই জমি বর্তমানের সম্ভাবনা– যা সকল গৎবাঁধা বদ্ধতার ভিতর দিয়েই পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই Post modernism বা মতান্তরে উত্তর আধুনিক মতবাদটি এমন এক জমিন, যা দেশ ও কালে আবদ্ধ (প্রতিটি দেশে), এবং যাঁর সীমানায় ইহজাগতিক, পারজাগতিক সকল বিষয় আপনা-আপনি বেড়ে ওঠে এবং বেড়ে ওঠে স্বাধীনসত্তায়। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা যায়, আধুনিক মতাদর্শী লেখক আকর্ষণীয়ভাবে আধুনিকতার একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তেমনি, রিয়ালিজম, রোমান্টিসিজম, গঙ্গোরিজম, কিউবিজম, চিত্রকল্পবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, যথাস্থিতিবাদ, সিনিসিজম, প্রতীকবাদ, সুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেসনিজম, ডেকাডেনটিজম প্রভৃতি ইজমের নির্দিষ্ট একটি ছকে বাঁধা। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ পৃথক Post modernism, D.W. FOKKEMA- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করেন- 'The post modernist code has its geographical and sociological limitation.' একটি উদাহরণ দেয়া যাক : একটি বাগানে একটি গোলাপ কলি ফুটল। এখন আধুনিকবাদীরা

www.pathagar.com

বলছে, তুমি ফুটে ওঠো আধুনিকতার মতানুসারে. সেখানে সুররিয়ালিস্টরা চাচ্ছে গোলাপ কলি ফুটে উঠুক সুররিয়ারিজম মতাদর্শে, এভাবে সকল 'ইজম' চাচ্ছে গোলাপ কলিটি তাদের মর্তবা অনুসারে বেড়ে উঠুক, এখানেই উত্তর আধুনিকতার সাথে সকল মতবাদের বিষয়ীগত দ্বন্দ্ব। কারণ উত্তর আধুনিক চায় না গোলাপ কলিটি কমুনিজম, ইসলামিজম, মতানুসারে বেড়ে উঠুক, উত্তর আধুনিক জোর করে না চাপিয়ে দেশ, কাল, অবস্থান ভেদাভেদে গোলাপ কলিটিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাড়তে আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে চীনের কথা বলা যায়। কুনফুশিয়াশ, মাও সেতুং যদি চীনের আদর্শ, ঐতিহ্য হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কার্ল মার্কস প্রণীত কমুনিজম প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব; কিন্তু তা সকলের বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে। এটি একটি উদাহরণ। মানবতার মনন চাহিদা যদি মাও সেতুং হয়ে থাকে তাহলে সেটি একটি তাদের শিকড় এবং ওটিই তাদের উত্তর আধুনিক বলে বিবেচ্য।

১.২

বাংলাদেশে উত্তর আধুনিক চর্চা এখন গোত্রে-গোত্রে বিভক্ত। পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় চিত্তপুষ্ট একদল উত্তর আধুনিকতাকে টেনে নিয়ে গেছেন ইউরোপের আঙ্গিনায়। বিশ্ব আঙ্গিনা থেকে ঋণ করা আধুনিকতা আমাদের বাংলা সাহিত্যের কলকাতার রাজপথে, ঢাকার রাজপথে যেভাবে দৌড়ে বেরাচ্ছে এতে করে একটি কথা বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে জানতে আমাদের বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায় ব্যাকুল নেত্রে তাকিয়ে থাকতে হবে? আর তাই আধুনিকবাদী কবিরা সে অর্থে ততোটা বিশুদ্ধ বাঙালী নয়। বাঙালী মন কাশফুলের মত শুভ্র, জোনাকীর মত মূর্ত, সূর্যের মত উদাস, চাঁদের মত সুন্দর। বাঙালী জাতি, বাংলা সাহিত্য যেসব সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁকে মাঝেই তাঁর খুঁজতে হবে। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে; পরমুখাপেক্ষী চিন্তার জোড়াতালি রসদ সংগ্রহ আসলে বাহিরের আভিজাত্যই ঠাস বুননে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। পশ্চিমা শিক্ষায়, চিন্তায়, চেতনায় বাঙালী লেখক সমাজ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ফাঁদে ধরা দিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বিকৃত মানসিকতা অর্জন করে এখন ক্রমবির্বতনে অবচেতনে যে অবস্থান তা পক্ষ-বিপক্ষ মূলকথা নয়, ইহা আসলে অন্ধ মানুষের অজ্ঞতার পটে নিয়ে গেছে। তা না হলে প্রতিটি দেশের নিজস্ব বাস্তবতায় তাঁর বিকাশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উধাও কেন? একজন ব্যক্তির জন্ম যে দেশেই হোক না কেন তার চারিত্রিক গঠন, রুচিবিলাস, ব্যবহার গভীরভাবে নিরূপিত করে তাঁর চিন্তা ও চেতনার জগৎ রূপ নেয় সেই দেশ-কালের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আদলে। উত্তর আধুনিক এই শিক্ষা দেয়। কাহাকেও

www.pathagar.com

ডাকে না, আবার দূরেও ঠেলিয়া দেয় না। কাজেই, বাংলাভাষার লেখক ইউরোপীয় লেখক ঢঙে যে প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইউরোপের Post modernism ধ্যান-ধারণা এদেশে গ্রথিত কারা সাধনা আসলে অস্তিত্বের বিপন্নতারই পরিচয় বহন করে। এদেশে মুসলমান সমাজে রীতি-নীতি তাদের ঐতিহ্য, হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি তাদের ঐতিহ্য, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেরই সামাজিক অবস্থান আলাদা, সুতরাং মানুষ মানবতার দিক দিয়ে সকলেই এক ও অভিন্ন, কিন্তু ঐতিহ্যের দিক দিয়ে প্রত্যেকেই বিপরীত মেরুতে। প্রত্যেকেই নিজ অবস্থানচ্যুত না হয়ে যদি বেড়ে ওঠে তবে তাহাই উত্তর আধুনিক। এবং উত্তর আধুনিক এ প্রক্রিয়াকেই সাধুবাদ জানায়। আমাদের উত্তর আধুনিকতা সূচিত হতে পারে আমদানী নির্ভরতা থেকে নয়, বরং ঐতিহ্যের গভীরে শিকড় নামিয়ে, যে সময়ে আমরা ছিলাম না তবু যে সময় আমাদের চেতনার গভীরে-মুসা পয়গম্বরের মত নীল দরিয়ায় পরম নিশ্চিন্তে গমন কিংবা সর্প দংশনে লখিন্দরকে নিয়ে গভীরে বেহুলার মতো অন্ধকারে একাকী চলেছে– সেই সময়কে আত্মস্থ করে এবং বর্তমানের উন্মুখ ভবিষ্যতকে চেতানায় উদ্ভাসিত করে তুলে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল আমাদের পথজুড়ে দাঁড়িয়ে নেই– বরং তাদের TEXT-এর মাঝেই আছে আমাদের পথের দিশা। উত্তর আধুনিকতার ইশারা।

১.৩

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতোন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি- চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বথের করে আছে চুপ;
[বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি : জীবনানন্দ দাশ]

আমার পূর্ববাংলা অনেক রাত্রে গাছের
পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো
কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনো বেহালা
এক সময় বাঁশির সুর
যখন রাত্রে একাকী ঘুম ভেঙে
অনবরত কোমল কোলাহলে

www.pathagar.com

স্বপ্নে মত পাতায়-পাতায়

শব্দকে দেখি

[আমার পূর্ববাংলা-৩ : সৈয়দ আলী আহসান]

দেশাত্মবোধক এই কবিতা দু'টি মানব মনের এক চিরন্তন মহিমাময় অনুভূতি। এ অনুভূতির মূলসত্তা পাল্টায় না কখনো, ভঙ্গি বদলায় মাত্র। এমন এক বদ্ধমূল অথচ বিবর্তন সম্ভাবী কাব্যে সামাজিক প্রণোদনায় বোদ্ধা পাঠক মাত্র শিহরিত হয় কবিতার রসোত্তীর্ণ ভাবের কারণে। প্রিয়মুখ দেখার এই ঐতিহ্যগত মনোবাসনা আসলে দেশজ ও মানবিক-বিশিষ্টতার প্রগাঢ় ছাপ এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ে নিমগ্ন হয়ে দেশকে এমন চিত্রকল্পময়ভাবে উপস্থাপনও উত্তর আধুনিক মতবাদ প্রশ্রয় দেয়। হৃদয় সংবেদ্যতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এই অনুপম সমন্বয় কবিতাকে করেছে অনবদ্য স্বাদ, ব্যাপক আবেদন ও ঐকান্তিক আত্মস্ফূরণে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস্য ও অকৃত্রিম এক মায়াবী ফল। কবির শিকড় সংস্থিত আত্মায়নে যে এ ধরনের কবিতা জন্ম ও বিকাশ সাধিত হয় তাতে কোন সন্দেহ থাকে না এবং কবির হাত দিয়ে মৌলিক উপাচার হিসেবে তাঁর প্রিয় দেশের এই স্পন্দিত রূপায়ণ আমাদেরকে একাত্ম হয়ে গ্রহণ করতে হয়। এই ব্যঞ্জনা কবির একান্ত এবং তার হাত থেকে সরাসরি এ উপাচারকে আমরা পাচ্ছি- এই সৃজনে যেহেতু কোনো মধ্যস্বত্ব নেই, কাজেই এটা একটি সার্থক কবিতা। আর সৃজনের এই সার্থকতার অপর নামই উত্তর আধুনিকতা। জনৈক হেডমাস্টার কর্তৃক প্রণীত গাইডবুক/নোটবুক-এর প্রচার-প্রসারের মত আমাদের দেশে উত্তর আধুনিকতার যেসব বুলি কপচানো হচ্ছে তা লক্ষ্যহীন নাকি নীতি বহির্ভূত নাকি বিচ্ছিন্নতাকে সমন্বিত করার রস প্রবৃত্তি তা ঠাউর করা যায় না। আর যাচ্ছে না বলেই প্রাথমিক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম, ঢাকা, বগুড়ার উত্তর আধুনিক চর্চা প্রকরণগত দিক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ শুদ্ধতা অর্জন না করে যে-যে দর্শনে লালায়িত, উত্তর আধুনিকতাকে সে সেই দর্শনের ঘাড়ে চাপিয়ে এগুতে চেষ্টা করছেন। ফলে, 'উত্তর আধুনিক' নামক এই মতবাদটি কখনো জাহাজে চেপে সাগর পাড়ি দেবার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন, কখনো দেখা যাচ্ছে, ধুলোবালির মাঝে ডাবল ডেকারে চেপে অজানার উদ্দেশ্যে গমন। কিন্তু 'উত্তর আধুনিক'- ডাবল ডেকারও না জাহাজও না। নতুন এক বাহন। যেখানে চড়লে জানা যায় সমকাল, পূর্বকাল, বিবর্তনশীল রূপ, বস্তুরবোধ ও ধারণার মহার্ঘ্যতম সমন্বয়ের মৌলিক মানবিক বিন্যাস। মানবিক ব্যঞ্জনা ও যুগদর্শনের সুন্দরতম অথচ অভঙ্গুর নিদর্শন এবং মানব প্রসারের এই অবক্ষয়ের যুগে জীবন সাধনার নতুন অথচ পুরাতন এক চমৎকার ঐতিহ্য উজ্জীবিনী নির্যাসের নাম উত্তর আধুনিকতা।

www.pathagar.com

শিল্পের শত্রু শিল্পের মিত্র

সাজ্জাদ বিপ্লব বন্ধুভাজনেষু,

১.০

বেশ ক'দিন হল ভাবছি শিরোনামের বিষয় নিয়ে লিখব। এ মুহূর্তে আবার বিদ্যুৎবিহীন রাত। মশা। কিন্তু লেখার অদম্য ইচ্ছা, অবশেষে মোমের আলোয়। লক্ষ্য করেছেন, আমাদের সাম্প্রতিক কবিতায় বাংলাদেশ নতুনভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। যেনবা স্বদেশের পুনর্জন্ম হচ্ছে। আমাদের স্বাজাত্যবোধ সম্প্রতি নিপীড়িত এবং ক্ষুণ্ন। এরই প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশে শিল্প-সাহিত্যের নির্মাণে নবআলোড়ন। মার্কস একদা গ্রীক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন : এপিক বা মহাকাব্য অনুন্নত সমাজে রচনা সম্ভব। আমরা নিজেদের সর্বব্যাপী প্রচারে লিপ্ত, আমরা আধুনিক সমাজের বাসিন্দা। কতটুকু জাতিসত্তা আমরা লালন করি হৃদয়ে? আমরা তো মুখে দেশপ্রেমের বুলি কপচাই অথচ আমাদের কাজে, আমাদের চিন্তার মারপ্যাঁচ কুটিলতায় ভরপুর। আমরা একই টেবিলে চা পান করি, এক গলায় গান গাই কোরাসঢঙে অথচ চোখের আড়াল হলেই শুরু করি বিরূপ সমালোচনা। আমাদের জীবন নিরীক্ষায় আমরা কি সৎ? এই যে সাহিত্যের অঙ্গন, ঐতিহ্যের ঝাঁপি খুলে আমাদের নজরবন্দী করেছে, সাহিত্য আজ আমাদের রক্তে মিশে শিরায় শিরায় ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু ভুবনের নোংরা, কর্দমাক্ত, দুর্গন্ধ আমাদের সুগন্ধময় পোশাকেও লাগছে ছিটেফোঁটা। শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনে আমরা শিল্প অন্বেষায় উপনীত, কাদা কেন রাজপথে? সাহিত্য একটা আলোকিত গহ্বর চায়, শেয়ালের গর্ত আর চিৎকার সাহিত্যে শুধু অস্তিত্বের শিকড়ে ঘুণ ধরায়, আর কিছু করতে পারে না। পতনশীল শক্তির শেকড়হীন পথযাত্রায় সমাজ বিবর্তন ঘটাতে অক্ষম। কবিতার ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ। চেতনার বৈচিত্র্যগামী চোখ সন্ধানী গতিময় জীবন্ত শব্দ মহড়া চায়। কবিতার চাকর-বাকর শ্রেণীর ঘর মোছা, টয়লেট পরিষ্কার করে যারা

www.pathagar.com

দু'বেলা যৎসামান্য অন্ন পায় মনিবের নিকট থেকে, চেতনার বৈচিত্র্যগামিতা তাদের মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারে না। সমাজ সত্যের গভীর অঙ্গীকারের চিরায়তিক স্মারক স্তম্ভে এদের কোনো ভূমিকা নেই, এরা যুগের প্রতিনিধিত্ব করে না। এরা মুখে মুখে থাকে, চা-টেবিলে অগ্রগামী বক্তা, দু'চার পংক্তি লিখেছে কোনোকালে, ব্যস, এরাই নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য আপনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে, তামাশার বাকোয়াজ শোনা যায়। অমুক নরেন এক মণ দধি খেয়ে দিব্যি হেঁটে গেল। ইত্যাদি।

১.১

আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল। মহাকাব্য লিখে একদা নেতিবাচক-ইতিবাচক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আমাদের অগ্রপথিক রবীন্দ্রনাথ এপিক লিখতে ব্যর্থ হয়ে ওপথ মাড়াননি। নজরুল 'বিদ্রোহী' লিখেছেন। এপিক না হলেও এপিক সদৃশ। আসলে কবিতার সজ্জনরা কবিতাকে নিয়েই ছিলেন হরহামেশা। দেখেন না, জীবনানন্দ পুরো জীবনটাই চুপি চুপি কবিতার পেছনে ব্যয় করেছেন। আমাদের দেশে কবিতার জন্য জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ কি-না করেছেন। পথসভা, বটতলা, আমতলা, জামতলা যেখানেই কবিতা সেখানেই তাঁরা পাগলের বেশে হাজির। নাগরিক কোলাহলকে দেখার চোখ আমাদের যে কবি লালন করেন তিনি শহীদ কাদরী। বাংলা সাহিত্যে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি মস্ত। দু'হাত খুলে এখনও লিখছেন, আবুল হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ওমর আলী, শহীদ কাদরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, দিলওয়ার, আজীজুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফরহাদ মজহার, নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ রফিক, মুহম্মদ নুরুল হুদা, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, আল মুজাহিদী, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, ময়ুখ চৌধুরী, আবু হাসান শাহরিয়ার, আবদুল হাই শিকদার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, রিফাত চৌধুরী, সরকার মাসুদ, তমিজউদ্দীন লোদী, কাজল শাহ্‌নেওয়াজ, বুলবুল সরওয়ার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মাসুদ খান, বদরুল হায়দার, হাসান আলীম প্রমুখ কবিবৃন্দ। কবিতা আসলে একটা সময় চায়। জীবন চায়। অনন্ত পথ পাশাপাশি হাঁটতে চায় কবি ও কবিতা। এ সময়ে কবিতাকে কেন্দ্র করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে একথা সত্যি, কিন্তু বন্যার স্রোতে পলিমাটির সাথে অনেক আবর্জনাও ভেসে আসে, তেমনি কবিসত্তার পাশাপাশি অকবিদেরও একটি বিশাল অংশ এ সময়ে ঘোরাফেরা করছে কবিতার সবুজ ভূমিতে। ঘাবড়ানোর কোন দরকার নেই, কারণ শীতকালে পাতা এমনিতেই ঝরে যায়, শুকনো হয়ে। কবিতার অঙ্গন মেধাবীদের অঙ্গন। মেধার বিস্তৃতি যার যত বিস্তৃত সে তত ভালো কবিতা লিখতে পারে। ধাপ্‌পাবাজি আর ছলচাতুরীর কোনো জায়গা নেই এ অঞ্চলে। এখানে অনুকরণ করে লাভবান হওয়া যায় না। অনুসরণ করলে হয়তো কিছুদূর যাওয়া যায়। এরপর পথ ভুলে আপনা আপনি বিদায়।

www.pathagar.com

সাহিত্যচর্চা বাস্তববাদী হতে শেখায়। জগৎ ও জীবনের নানাবিধ জটিল ও যন্ত্রণাদায়ক উত্থান-পতন হৃদয়ে দাগ না কাটলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। পড়াশোনা করে ডাক্তার হওয়া যায়, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়; কিন্তু কবি হওয়া যায় না। কবি হতে হলে তৃতীয় নয়ন থাকা একান্ত জরুরী। পড়াশোনা সাহিত্যে প্রয়োজন, সে এক অগ্রজ-অনুজ প্রচেষ্টা জানার জন্য। কিন্তু কবি হওয়ার জন্য প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান আর কল্পনার সাতরঙা লীলাময় স্ফূর্তি থাকা দরকার। আর সে কারণেই বলা হয়, 'কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ, মায়ার জগৎ'। কিন্তু বস্তু নিরপেক্ষ মায়া হয় না। অবাস্তব কাব্য অসম্ভব এবং কাব্যের কথা বস্তুর বস্তুপরতার লাঘবতা যদি তার রস আকর্ষণ শক্তির হীনতা ঘটায় তবে সে লাঘবতা কাব্যের দোষ। কথাবস্তুর লক্ষ্য বস্তু নয়, তার লক্ষ্য রস। কাব্য সে বস্তুকে চিত্রিত করে, সে তার বাস্তবতার জন্য নয়, রসঅভিব্যক্তির জন্য। বস্তুর বাস্তবতা অনন্ত। সুতরাং বাস্তবতা কতোটা কোন কাব্যে স্থান পাবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের উপর ও কবির প্রতিভার প্রকৃতির উপর। স্মৃতির সাহায্যে অথবা ভাববাদী দৃষ্টিতে যে সত্যবস্তু দর্শন হয়, তাই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের সত্য। এভাবে প্রত্যক্ষের দর্শন থেকে কল্পনার স্ফূর্তি ঘটে। সেজন্য দৃষ্টি বহির্ভূত হয়েও দৃশ্যমান বস্তুটি, স্মৃতি পথে, এসে কল্পনার অত্যাশ্চর্য মাধুর্যে অভিষিক্ত হয়ে পরম আনন্দময়, রসময় ও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আর সেজন্যই সাহিত্যে কবিতা যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করায়, তা অধিকতর সত্য। বাইরের বস্তুজগৎ থেকে আহত কবির হৃদয়গত ভাবটি তার অপূর্ব নির্মাণ কুশলতায় নানারূপে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে রসিক জনের হৃদয়বেদ্যরূপে মর্যাদা পায় এবং কবিগণ প্রকৃতপক্ষে বস্তুজ্ঞানের অটলভিত্তিতে কাব্য সৃষ্টি করেন। আমরা সে কারণেই কবিতা পাঠ করি, অতৃপ্ত কামনাকে তৃপ্ত করি জ্ঞানের জারক রসে চুবিয়ে।

১.২

এখন বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চা আসলে স্বার্থচর্চায় পর্যবসিত। কিংবা বলা যায়, নোংরা রাজনীতির হুকুমে লালিত-পালিত গৃহপালিত পশুসদৃশ। পৃথিবীতে রাজনীতি কখনো সাহিত্যকে হুকুম করার ধৃষ্টতা কোথাও প্রদর্শন করেছে কি-না আমার জানা নেই। কিন্তু সাহিত্য সবসময় রাজনৈতিক দুর্যোগকালে মৃদুভাবে, কখনো বা কঠোরহস্তে শাসন করেছে। এতে সাহিত্যের লাভ হয়েছে। দেখেন না, আমাদের নজরুল ইংরেজ বেনিয়াদের পশ্চাদদেশ পর্যন্ত গরম করে দিয়েছিলেন। একদিকে রুশোর বিদ্রোহাত্মক জীবন দর্শন, অন্যদিকে জার্মানীর ক্যান্ট-হেগেল প্রবর্তিত তুরীবাদ বা Transcentalism মানবজীবনের মাহাত্ম্য, প্রকৃতির সাথে মানব মনের সম্পর্ক, প্রেমের মাহাত্ম্য অন্যপক্ষে ফরাসী বিপ্লব সাম্য, মৈত্র সর্বত্র এক নবআলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরই মাঝে আমাদের কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বিশাল ভাবের জগতে আধ্যাত্মিক স্বরে আত্মমুক্তির পথ খুঁজে পান, আবার ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্কর পতিত, নীচ,

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ও ব্যথিত জনের হৃদয় কন্দরে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেন। পাশাপাশি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক মুসলমানদের অন্ধত্ব, ভাঁড়ামো, ডেপোগিরীর সংশোধন করে রেনেসাঁস ঘটান এ অঞ্চলে। বিভূতিভূষণ 'দাও ফিরিয়ে অরণ্য' শ্লোগান দেন। জীবনানন্দ দাশ কবিতার নতুন পথ খুঁজতে 'রূপসী বাংলা'র দুয়ারে দুয়ারে হেঁটে বেড়ান পদব্রজে 'হাজার বছর'। এসব সত্য জীবনমুখী প্রবণতা আমাদের শেখায়, ভাবায়। আমাদের কাব্যিক জীবনকে শাশ্বত করার ইচ্ছায় সর্বদা কাজ করে নীরবে-নিঃশব্দে-নিভৃতে। এতসব সত্য উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছে তারপরও আমাদের পিতামহের রক্তের বীজরা ভাববাদী রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে যায় আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে আবু জেহেল পরিবারে।

আজ যত রাতই হোক, প্রিয়বন্ধু আমার, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: লেখাটি অনেকখানি সামনে নিয়ে যাব। আপনার দেয়া বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বাংলাদেশের নমস্য পুরুষ আবদুল মান্নান সৈয়দের 'পু নর্বি বে চ না' গ্রন্থের কথা প্রাসংগিক কারণে মনে পড়ে গেল। শিরোনামে ছিল 'সেই সনাতন সমস্যা' (২৮ নভেম্বর ১৯৮৬) বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মান্নান সৈয়দের মার্কিন প্রবাসী বন্ধু ও কবি ওমর শামসের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খে য়া ব নামা'র প্রকাশনা উৎসব। আ. মা. সৈ. উল্লেখ করেছেন, কবি তাঁর (ও. শা) প্রথম গ্রন্থের নাম 'বো ধি বৃ ক্ষ ত লে'। তো ওই অনুষ্ঠানে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের ধরন ছিল এরকম, 'ওমর শামস কি অগ্রগমন করেছেন, না পশ্চাৎভ্রমণ করেছেন?' মান্নান সৈয়দ তার জবাবে বলেছিলেন ভাষণে, 'মাটির দিক থেকে (ভারতবর্ষ) আর ধর্মের দিক থেকে (আরব-ইরান) বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য বিমিশ্র, বিমিশ্র বলেই জটিল ও সমৃদ্ধ। হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, আর ইসলামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তো বটেই। হিন্দু বা (---) বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আমরা যখন ব্যবহার করি, তখন কথা ওঠে না, কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহার দেখলেই অনেকের মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর এটা হয় সম্যক জ্ঞানের অভাব। অন্ধ অনুবর্তনের ফলে। হ্যাঁ, আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি-মুসলমানের সাযুজ্য বাঙালিত্বে, বৈযুজ্য হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্বে (পুনর্বিবেচনা : পৃ: ২৪-২৫)। আসলে বন্ধু, একটি বিষয় আমাদের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে যাঁরা তথাকথিত প্রগতিধারার লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবী জীবিত আছেন তাঁরা বাস্তবিক অর্থে প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা জানেন না। আর জানেন না বলেই এরা ভাবে মুসলমানদের ধর্ম ইসলামকে আঘাত করলেই বুঝি প্রগতি ক্যাম্পে নিজের আসন পাকাপোক্ত হয়। প্রকৃত প্রগতিবাদী কবি ফরহাদ মজহার যখন 'এবাদতনামা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন তখনই প্রগতি যশপ্রার্থীরা অসূয়াবৃত্তিতে নিজেদের সমবেত করে। এদেশে সাম্যের দাওয়াত বোঝার ক্ষমতা সংস্কৃতির মুখোশপরা

www.pathagar.com

তথাকথিত এইসব প্রগতিশীলদের নেই। শ্রেণীসংগ্রাম আন্দোলন বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে। একজন গার্মেন্টস শ্রমিক কিংবা একজন ভ্যানচালক যে নামাজে পাবন্দি সেও শ্রেণীসংগ্রামের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সে শিক্ষায় দেয়। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে মুসলমান বংশোদ্ভূত সন্তানরা প্রগতি আন্দোলন করতে গিয়ে প্রথমেই ধর্মের শরীরে আঘাত করে বীরের তকোমা কপালে মাখে। এদেশে আজ তথাকথিত প্রগতিশীল আর তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজ-কারবার সাধারণ জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। কবিতার মত অরাজনৈতিক অবৈষয়িক বিষয়কে প্রগতি-প্রতিক্রিয়া গং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে কখনো কামিয়াব হবে না। একজন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার দেহাবয়বকে আধ্যাত্মিক চেতনায় লালিত করে হৃদয় মুক্তি খুঁজেছেন। এ কারণে কি রবীন্দ্রনাথ মৌলবাদী? তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার দোষে অভিযুক্ত করা যাবে? কক্ষনো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা স্রোতকে যে পথেই নিয়ে যাক না কেন প্রথমত বিচার্য তাঁর কবিতা; কবিতা হয়েছে কি-না। একশ বছর ধরে তাঁর কবিতা বাংলা ভাষাভাষী নর-নারীর সুখপাঠ্য। মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলেই এ অঞ্চলে পাঠ করে। এ কথা আমাদের ভাবতে হবে বন্ধু। আর একটা বিষয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি বঙ্কিম সাহিত্য অপছন্দ করি। কারণ এই লোকটা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ মূলত ভাববাদ হলে পরম রসময়ের স্পর্শধন্য এক আনন্দময় সত্তার বিচিত্রতা আবিষ্কার করে তারই বন্দনা গেয়েছেন ৮১ বছর ধরে। অথচ বঙ্কিম ছিলেন পুরোমাত্রায় মুসলমানবিদ্বেষী এক সাম্প্রদায়িক লেখক। মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর বিমাতাসুলভ আচরণ আজকের সাহিত্য বিচারে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

১.৩

কবিতার মূল্যবান চর্চা চলে একমাত্র লিটল ম্যাগাজিন জগতে। কারণ দৈনিক পত্রিকা তার বাণিজ্যনীতি ও কোম্পানীর আদর্শগত ফর্মুলা শুধু ধারাবাহিকভাবে নয়, সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। গোষ্ঠীবদ্ধতা দৈনিক পত্রিকার মূল পুঁজি। যে ব্যক্তির টাকায় পত্রিকা বের হয় তাঁর নির্দেশিত পথে সাহিত্য সম্পাদককে পা ফেলতে হয়। কথা বলতে হয় হিসাব করে। সাহিত্যের খেদমত বড় কথা নয়, মালিক/মহাজনকে তুষ্ট করাই আসল কথা। লিটল ম্যাগাজিন এসবের বালাই নেই। **চতুরঙ্গ, কবিতা, কৃত্তিবাস, কাফেলা, অগত্যা, মুক্তি, সীমান্ত, সমকাল, কবিকণ্ঠ, স্বাক্ষর, কণ্ঠস্বর, কবি** প্রভৃতি এমন অনেক ছোট কাগজের নাম বলা যায়, যেখান থেকে উঠে এসেছে আজকে প্রোথিতযশা অনেক কবি প্রাবন্ধিক-গল্পকার। ছোট কাগজ আসলে মোহকে ত্বরান্বিত করে। নিরীক্ষামূলক, ব্যতিক্রমধর্মী লেখা একমাত্র ছোট কাগজেই সম্ভব। আর তাই ছোট কাগজে লেখা ছাপাতে হলে প্রথম সাহিত্য পাঠ ভালোভাবে থাকতে হবে। টি এস এলিয়টের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল, লিটল ম্যাগাজিন ছিল। আর তাই The waste land

www.pathagar.com

কবিতা তাঁর মেধাকর্ষিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর পথে। সাহিত্যে সজ্জন ব্যক্তিদের চর্চা ও সাধনা চালাতে হলে ছোট কাগজের দুয়ারে হাজিরা দিতেই হয়। Experimental লেখা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত নিজ অবস্থান বোঝা যায় না। আজকের আবদুল মান্নান সৈয়দ ছোট কাগজের ফসল। 'সত্যের মত বদমাশ' কিংবা 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা' গল্পগ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো ছোট কাগজেই অধিকাংশ প্রকাশিত। এভাবে পঞ্চাশের দশকের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের কবিতা, বুদ্ধদেব বাবুর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে তাদের কবিত্ব জীবনের নবজাগরণ ঘটে। ছোট কাগজের দান অপরিসীম। লেখক তৈরি হওয়ার প্রাথমিক কাঁচামালের সন্ধান প্রাজ্ঞ ছোট কাগজ সম্পাদক-ই দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আমি একটি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি। আমি Alfred Tennyson (১৮০৯-১৮৯২), Robert Browing (১৮১২-১৮৪৯), Dante Gabriel Rossett (১৮২৮-১৮৮২), Algernon Charles Swin Burne (১৮৩৭-১৯০৯) ভিক্টোরীয় যুগের বিশিষ্ট কবিদের প্রসংগে যাচ্ছি না, আমাকে নিয়েই বলি। আমিও ছোট কাগজ কারখানা থেকে নিজেকে তৈরি করেছি। ১৯৯৩ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করলেও মূলস্রোতের সাথে মিশি ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে। এর পেছনে আপনার ধীমান পরামর্শ আমাকে সামনে চলার পথ দেখিয়েছে। সবচেয়ে সাহায্য করেছে আপনার পরিচালিত 'পুণ্ড্রনগর লিটলম্যাগ লাইব্রেরী'। পাঁচ হাজারের অধিকসংখ্যক বই, পত্র-পত্রিকার ঝাঁপি নিয়ে আপনার পাঠাগারে দুয়ার যেদিন আমার দিকে উন্মোচন করলেন সে-ই শুরু। এখন বুঝতে পারছি একজন সম্পাদকের সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকা কতখানি আবশ্যক। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ব্যাঙর ছাতার মতোন যে সকল ছোট কাগজ বেরুচ্ছে তার অধিকাংশ পাঠের অযোগ্য। বিজ্ঞাপনের মুনাফার লোভে অশিক্ষিত মানুষও রাতারাতি বনে যায় ছোট কাগজ সম্পাদক। কিংবা কিছুদিন শাহবাগে রাতকাটানো, আঁতেলপণা করা, পার্বণ-পড়ুয়ায় ঘোরাফেরা করে দু'চার অক্ষর দিয়ে শব্দ বানানোর পরিক্রমা শিখে ধুমধাম করে সিদ্ধান্ত নেয় পত্রিকা প্রকাশের। আসলে আমাদের অল্পতেই প্রাপ্তি ঘটে কি-না। পত্রিকা আদৌ প্রকাশিত হবে কি-না তার কোন হদিস নেই, অথচ বাজারী দৈনিকের মূর্খ সাহিত্য সম্পাদকের 'প্রকাশিতব্য পত্রিকা' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এদেশের শিক্ষালয়ে দুর্মর রাজনীতির অভিশাপ ছায়া অক্টোপাসের মতোন যেমন আচ্ছন্ন তদ্রূপ দৈনিকের বাণিজ্যিক পত্রিকায় সাহিত্য পাতা অশিক্ষিত, মূর্খ, চামচাদের দখলদারিত্বে সৎ সহিত্য নীরবে ঘোরাফেরা করে। হায় পণ্ডিত! স্বজাত চিন্‌লি না। লক্ষ্য করুন, পার্শ্ববর্তী দেশের বঙ্গ প্রদেশে। ওদের কাজ, চিন্তা-চেতনা সব কিছু কত পরিকল্পিত। সমাজ গঠনে কি অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। আর আমাদের অজাত-চুজাতরা অমুবক/রাজাকার, তমুক সম্প্রদায়িক এসব প্রোপাগান্ডা নিয়ে মত্ত আছে। আমাদের ছোট কাগজগুলোর এহেন অসহায় অবস্থার সুযোগে পাশের বাড়ির দেবতারা মেহমান হিসেবে সেই যে এলেন আর গেলেন না। বাংলাদেশের ৭৫% ছোট কাগজের

www.pathagar.com

সিংহভাগ পাতা এখন তাদের দখলে। আমরা লিখব কখন? আমরা তো ঝগড়া-বিবাদ আর পরশ্রীকাতরতায় দিনমান ব্যস্ত। আমাদের মেধা ব্যয় করে সম্পাদকীয়তে আচ্ছা দু'চার কলম উগ্র ঝাল-মরিচ পিষে মাখিয়ে দেই ছোট কাগজ পৃষ্ঠায়। আর তাতেই অনেক তথাকথিত ছোট কাগজ সম্পাদক মহাশয়ের পিত্তি জ্বালা-পোড়া শুরু হয়ে যায়। আবার অন্যে প্রস্তুতি নেয় উপযুক্ত জবাবের। সুতরাং কি গদ্য কি পদ্য সব জায়গার হালফিল অবস্থা করুণ! শুরুতে বলেছিলাম না, নবআলোড়ন দেখা যাচ্ছে। কথাটা সত্যি। কিন্তু তারপরও প্রচণ্ড দামামা বাজিয়ে কেউ গোলাপের মত প্রকাশিত হচ্ছে না। এই সকল নোংরামি হীনম্মন্যতার কারণে। তবুও আশার কথা, আমাদের নব্বই দশক ষাটের মত ভাংচুর শেষে নতুন সহস্রাব্দের দ্বারপ্রান্তে।

১.৪

আধুনিক কবিতার আধুনিক পুরুষদের বোহেমিয়ান কীর্তিকলাপ সাম্প্রতিক আধুনিকতাবাদীদের চোখে কেমন? আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ, অনেক প্রাবন্ধিকের নজরে বাক-সংযম একটা ফ্যাক্টর- বিশ্বসাহিত্যেও অনেক কবি নীরবে গোপন কাজ করতেন যা ছিল নিষিদ্ধ। আপনার বই দোকান আর বাক-সংযম কাব্যরীতি আমাকে বিশ্বসাহিত্যের অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনে 'পুণ্ড্রনগর লিটলম্যাগ লাইব্রেরী' নামক বাহনে চেপে। আমি জানতে পারি, বিশ্বসাহিত্যের অনেক কবি হয়েছিলেন প্রবাসী। ক্রিমিনাল জগতে ক্রীতদাস ব্যবসা ও বন্দুকের চোরাচালান দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন একজন আধুনিক কবি, যাঁর নাম Jaan Sans Terre অর্থাৎ John Landless। আবার আদ্রে র‍্যাঁবো ক্রিমিনাল দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বদৌলতে দেশে হয়েছেন নিষিদ্ধ। গৃহহীন-দেশহীন-সমাজহীন। এজরা পাউন্ডের ক্ষেত্রে নিজ দেশত্যাগ এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, আইনের ভাষায় তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেশদ্রোহিতা আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় উন্মাদনা অনিচ্ছায় নির্বাসিত লোরকা। আর নবোকফ্ শুধু দেশ থেকে প্রবাসী নন, তিনি তার 'Matchless Russian tongue' থেকেও নির্বাসিত। আন্না আখমাতোভার জীবন স্বদেশে কেটেছে প্রবাসীর মতোনই। অথচ এই লেখকের প্রথম বই প্রকাশ হওয়ার পর এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, তিনি হবেন সমাজ পরিত্যক্ত অনাথ এবং বিধবাদের কবি। হেনরি জেমস্, জয়স, পাউন্ড, এলিয়ট, অডেন স্বেচ্ছায় দেশত্যাগী আধুনিক কবি। আর এক বিশ্বসাহিত্যের নমস্য কবি পরিবেশের হিংস্র মুখরতায় স্বদেশেই প্রবাসী জীবন কাটিয়েছেন,তিনি বরিস পাস্তেরনাক। ভাষার অলৌকিক জাল বুনে জয়স ডাবলিন ছেড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন ত্রিয়েস্তে, জুরিখে, পারীতে। আবার গ্রীক কবি কাভাফি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটালেন আলেকজান্দ্রিয়ায়-যে শহর বহুভাষী আধা-প্রাচ্য শহর, যে শহরের ইসলামী ও মিশরী ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর কোন মর্মের যোগ ছিল না। নির্বাসনের ব্যথা যাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশি জোরালো ও অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে তিনি স্যাঁ-ঝঁ পার্স। তাঁর Anabase-এ আছে 'a pure

www.pathagar.com

distillation of rootlessness' আপনার সংরক্ষিত লাইব্রেরী এভাবে আমাকে জানতে সাহায্য করেছে বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক কবিদের আধুনিক জীবন-যাপন। কেউ স্বেচ্ছায় কেউ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ নির্বাসিত লেখককুলের এ সকল ব্রাত্যজন, আমাদের বাংলাদেশের অসাহিত্যিক মনোভাবের পরিচয়ে দেশান্তরী নন। মতাদর্শ ভিন্নার্থে প্রবাহিত করার নীল চালাকি আমাদের বোকামুল্লুকেই সম্ভব। নইলে বাংলাদেশে আল মাহমুদের 'কাবিলের বোন' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বাস্তব ও সঠিক চিন্তাক্লিষ্ট মুক্তিযুদ্ধের ফসল হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে হৈচৈ নেই কেন? আর শামসুর রাহমান। আমাদের নগরের শ্রেষ্ঠ কবি 'স্বাধীনতা তুমি', 'গুডমর্নিং বাংলাদেশ'-এর মতোন সৃজনশীল দেশপ্রেমের কবিতা রচনা করার পরও সারাদেশে যোগ-বিয়োগের গাণিতিক সমস্যায় পতিত। অথচ জার্মান, কিংবা ফরাসী মুল্লুকে এসব লেখা প্রসবিত হলে তা নিয়ে রীতিমত ডমরু বাজত। আমরা শিল্পের কদর বুঝি না। শিল্পীকে সম্মান করি না। অন্যের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করি। এসব কারণে আমাদের সাহিত্যিকসত্তা ক্রমশ ঢালুপথে পতিত। উপরে ওঠার পথ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এতসব বিটলামো, নোংরামোর মাঝে আপনার 'স্বল্পদৈর্ঘ্য' পত্রিকা প্রগতিমানসে এগিয়ে যাক। দুর্মূখদের শত সহস্র বিদ্রূপ বকুল ফুলের মালা হয়ে আপনার অঙ্গে শোভা পাক।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা

যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই

পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া

(অদ্ভুত আঁধার এক : জীবনানন্দ দাশ)

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা

প্রাসঙ্গিক বচন ঃ কাল-সমুদ্র চির বহমান, চিরচঞ্চলা এবং অনন্ত। অগণ্য ঘটনার পারম্পর্যে প্রবাহিনী যে-সমুদ্রে যে-বীচিমালা উল্লিখিত হয়, সে তরঙ্গবর্তের অভিঘাত তার তটে অনুভূত হয়, সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তারই নাম সময়। 'Time is a fraction of elernity' অর্থাৎ শাশ্বতের একটি খণ্ডাংশই হচ্ছে সময়। সময়ের স্রোতাবর্তে সংঘটিত ঘটনা পুঞ্জেরই সুসংবদ্ধ রূপ ইতিহাস। ইতিহাসও প্রবাহিনী, ইতিহাসের স্রোতও চিরপ্রবাহিনী কালের সমান্তরাল। সেই ইতিহাসকে আমরা সাধারণত আলোচনার সুবিধার্থে, বিভিন্ন স্থান, কাল, পাত্র ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন-ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে, ভিন্ন-ভিন্ন অনুখণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা করতে ক্রমে-ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, যেহেতু এই প্রাণময় গ্রহে আমাদের আয়ুর পরিধি সীমিত, আমাদের যৌবনের পরিসর অত্যন্তই পরিমিত। এবং এই একই কারণে, ব্যক্তিগত আয়ুর যে সময়বৃত্তে আমাদের অবস্থান, আমরা পছন্দ করি, অনাদ্যন্ত কালের অতন্তপ্রসারী সরল রেখাটিকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে সেই বৃত্তের অন্তর্গত করে নিতে, সমাংশী করে দেখতে, যদিও আমরা একথা এবং এ-সত্য, নিশ্চিতরূপেই জানি এবং মানি যে, নিরবধি কালের বিশাল বিস্তৃত পট-ভূমিকায় স্থাপন করলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়বৃত্তগুলোর স্বাতন্ত্র্য ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হয়ে যায়, ক্রমে ক্রমে সেই ব্যাপ্ত পট-ভূমিকার অন্তর্গত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সেগুলো তাতে অবলুপ্ত হয়ে যায়। অতীত পর্যবেক্ষণের এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে অতীতের অস্তগামিতায় অবসিত অসংখ্য ক্রমপ্রসারিত সময়বৃত্তের অন্তঃস্থ বিচিত্র ঘটনাবলীর এক আশ্চর্য সমন্বিত সমাহার।

প্রাথমিক উৎস : সাহিত্য একদা পণ্য হয়ে উঠেছিল, বলা যায় পণ্যসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল, তখন সেই পণ্যমুখীন সাহিত্য থেকে দূরে থাকার জন্য, সরে দাঁড়াবার জন্য অন্য সাহিত্য পত্রিকার মানসিকতা গড়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৮ শতকের অস্তমিত সন্ধ্যায়। ১৮৪০

www.pathagar.com

খ্রীস্টাব্দে র‍্যালফ ওয়ালডো এমারসন ও মার্গারেট ফুলার সম্পাদিত 'দি ডায়াল' পত্রিকাটি লিটল ম্যাগাজিনের আদি রূপ হিসেবে সাধারণত শনাক্ত করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রেমি দ্য গুরুশোঁ ফ্রান্স থেকে 'মেরকুর দ্য ফঁন্স' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। লিটল ম্যাগাজিন শব্দটি সম্ভবত প্রথম উচ্চারিত হয় ১৯৯৪ সালে শিকাগো থেকে প্রকাশিত মার্গারেট অ্যান্ডারসন সম্পাদিত 'লিটল রিভিউ' পত্রিকা থেকে। বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু লিটল ম্যাগাজিনের নাম 'পোয়েট্রি ঃ এ ম্যাগাজিন অফ ভার্স (১৯১২), লিটল রিভিউ (১৯১৪-২৯), ইগোইস্ট (১৯১৪-১৯২৯), ব্লাস্ট (১৯১৪-১৯১৫), ট্রানজিসন (১৯২৭-৩৮), ট্রান্সাল্যান্টিক রিভিউ (১৯২৪-২৫), হরাইজন ক্রাইটেরিয়ান।

লিটল ম্যাগাজিন কি ঃ 'ম্যাগাজিন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বারুদশালা'। ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে এডওয়ার্ড কেভ লন্ডনে প্রকাশ করেন Gentleman's Magazine আর আমেরিকায় ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে এ্যানড্রু ব্যাজফের্ড প্রকাশ করেন 'The American Magazine'.

আন্তরিক সততা, নিষ্ঠা ও গোষ্ঠীবদ্ধতাই লিটল ম্যাগাজিনের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে চালানো হয়। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের প্রেরণাই এর উৎস। 'লিটল ম্যাগাজিন' যখন বাংলায় তরজমা করা হয় তখন 'ক্ষুদ্র বারুদশালা' আভিধানিক অর্থে হতে থাকে। কিন্তু সারকথা, মার্গারেট অ্যান্ডারসন সম্পাদিত 'লিটল রিভিউ' পত্রিকা হতে শব্দটি আমদানী হয়। আবার অনেকে মত প্রকাশ করেন ইয়োরোপে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চের পাশাপাশি যে ছোট ছোট 'লিটল থিয়েটার' গড়ে উঠেছিল তার অনুকরণে বা অনুসরণে 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন পৃষ্ঠা সংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকেও সাধারণভাবে 'লিটল' হয়ে থাকে। 'কিন্তু লিটল শব্দটি আকার বা সীমিত পৃষ্ঠা সংখ্যা অর্থে প্রযুক্ত নয়। এখানে লিটল শব্দটি পুঁজিগত অর্থে প্রযুক্ত। লিটল ম্যাগাজিনে ঢালাও পুঁজি থাকে না। মুনাফাবাজদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকৃত 'লিটল ম্যাগাজিনে কাজ করে না। অর্থনীতিগত এই অর্থে লিটল। এখানে উল্লেখ্য, 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে 'বিগ ম্যাগাজিন' কিংবা 'বাণিজ্যিক ম্যাগাজিন' বা মুনাফাবাজদের বিশাল কাগজের কথা মনে আসে। এই 'বিগ' আসলে একটি প্রতিষ্ঠান। ক্যাপিটালিস্ট মনোভাব নিয়ে আধা সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনোদনকে মূল্যায়ন করে। এদের মূলকথা মুনাফা অর্জন। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনে এসব চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই। লিটল ম্যাগাজিনের সুরম্য প্রাসাদসম অট্টালিকার অফিস ঘরের প্রয়োজন পড়ে না। কিংবা অসংখ্য চাপরাশী, চাকর-বাকরসহ বেতনভুক্ত সাংবাদিক লিটল ম্যাগাজিনের দরকার নেই। নিজ ঘরে বসে একজন নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যসেবক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করে থাকেন। তাকে কেন্দ্র করে নগণ্যসংখ্যক সিরিয়াস লেখক (তরুণ/বৃদ্ধ)

www.pathagar.com

সেই পত্রিকায় লিখে থাকেন। তবে লিটল ম্যাগাজিনে সাধারণত তারুণ্যে উদ্দীপ্ত তরুণ সাহিত্যপ্রাণরই বেশি লেখালেখি করে থাকেন। নিজের চিন্তা-চেতনার স্ফূরণ বাণিজ্যিক পত্রিকায় সম্ভব নয়। প্রত্যেক বাণিজ্যিক পত্রিকা নিজস্ব মতাদর্শ মেনে চলে। তাই সেখানে ভিন্ন মতাবলম্বী লেখার কোনো কদর নেই। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন এর ব্যতিক্রম। এর জন্মই প্রতিবাদী সাহিত্য প্রসবের জন্য।

লিটল ম্যাগাজিনের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবসায়িক মানোবৃত্তির বিরুদ্ধে লিটল ম্যাগ কথা বলে।

২. নিজস্ব চিন্তা, চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

৩. বাজারী লেখকদের ব্যবসায়িক মনোভাব লিটল ম্যাগাজিন প্রশ্রয় দেয় না।

৪. সাহিত্যে নিবেদিত ও মেধাবীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল লিটল ম্যাগাজিন।

৫. সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা একমাত্র লিটল ম্যাগেই চলে।

৬. স্বল্প পুঁজিতে বৃহৎ আয়োজন (চিন্তার) প্রকাশ।

৭. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে চালিত ও সংগঠিত করে।

৮. নির্ভীক বক্তব্য এর সম্পাদকীয়র মূল বৈশিষ্ট্য।

৯. লেখার ব্যাপারে কোনো আপোস নেই।

১০. সময়কে ধারণ করা লিটল ম্যাগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. সৃজনের ও প্রতিবাদের দিক হিসেবে এটি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ নজর কাড়ে।

১২. লিটল ম্যাগাজিন গোষ্ঠীবদ্ধ এবং এই গোষ্ঠীবদ্ধতা বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী।

১৩. নিজের কষ্টার্জিত অর্থ ও বন্ধু-বান্ধবের জমানো টাকা এই প্রকাশনায় ব্যয় হয়।

চেতনার সবুজ ফসফরাস ঃ লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রাথমিক চিন্তার উদ্রেক হয় দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধ থেকে। হাজারো পণ্য ভিড়ে লিটল ম্যাগাজিন স্বতন্ত্রবোধ সৃষ্টি করে। বাজারী লেখকের সস্তা লেখার টু-পাইস ধান্ধার মাঝে একটি লিটল ম্যাগাজিন মলাটবন্দী করেন ঐ সকল লেখা যা বারোইয়ারীর আড্ডার চা-চপ-কাটলেটের মত সু-খাদ্য নয়; বরং বোধ ও বোধির, চেতনা ও চৈতন্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে, এমন মন-মানসিকতা নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশ এখানে জরুরী বিষয়; কিন্তু আত্মপ্রচার নয়। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং প্রাতিষ্ঠানিক লোভ-লালসা থেকে

www.pathagar.com

সরে যথার্থ সৎভাবে একটি গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, আদর্শ এমনভাবে প্রকাশিত হয়, যা অতিসহজে চেনা যায় পত্রিকাটির (লিটল ম্যাগাজিন) একটিভিটিস। আর্থিক মুমূর্ষুতাকে এড়িয়ে লিটল ম্যাগাজিন সর্বদা সবুজ সংকেত দেয়।

বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগ, ছোট কাগজ, সাহিত্য পত্রিকা ঃ বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা, গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে কলমের ফ্রন্ট লাইন লিটল ম্যাগাজিন। আর নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার এক দৃঢ় স্তম্ভের নাম সাহিত্য পত্রিকা। এ দুটোরই মূল প্রতিবন্ধক শেষ পর্যন্ত অর্থ। দেনার দায়ে কিংবা আর্থিক সমস্যার কারণে নিজ পকেট উজাড় করেও লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকার দেনা শোধরাতে ব্যর্থ। তবুও লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হয়, প্রকাশ হচ্ছে, প্রকাশ হবেই। উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে আমাদের সামনে কতগুলো লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্য পত্রিকার খানদানী চেহারা দৃশ্যগত হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কতক গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকার নামঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' (প্র. প্র. ১৯১৮), মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মাদী' (দ্বি. প্র. ১৯২৭), হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পাদিত 'বুলবুল' (প্র. প্র. ১৯৩৩), বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি', দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'কল্লোল', হুমায়ুন কবির সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ', সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা', কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'মৃত্তিকা', মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সম্পাদিত নবপর্যায় 'সওগত'(প্র. প্র. ১৯৫২)-এর নেপথ্য সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন হাসান হাফিজুর রহমান। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক 'সমকাল' (প্র. প্র. ১৯৫৭), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর (প্র. প্র. ১৯৬৫), শামসুর রাহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীন সম্পাদিত 'কবিকণ্ঠ' (প্র. প্র. ১৯৫৬), এনামুল হক সম্পাদিত 'উত্তরণ' (প্র. প্র. ১৯৫৮) [পরে ডক্টর প্রাক্তন জাতীয় যাদুঘরের প্রধান], রফিক আজাদ সম্পাদিত 'স্বাক্ষর' (প্র. প্র. ১৯৬৩), পরবর্তীতে 'স্বাক্ষর' পত্রিকার সম্পাদনায় দেখা যায় ষাট দশকের আরও ক'জন কবির নাম ঃ সিকদার আমিনুল হক, ইমরুল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, রণজিৎ চৌধুরীর নাম। জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত 'কালবেলা' (প্র. প্র. ১৯৬৫), ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত 'পূর্বলেখ' (প্র. প্র. ১৯৬৬), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'চরিত্র' (১৯৭৯), আনওয়ার আহমদ-এর 'কিছুধ্বনি', মোহাম্মদ রফিক সম্পাদিত 'অচিরা' (প্র. প্র. ১৯৬৮), অরুণাভ সরকার সম্পাদিত নিষঙ্গ (প্র. প্র. ১৯৬৯), ফারুক সিদ্দিকী সম্পাদিত 'বিপ্রতীক' (প্র. প্র. ১৯৬৭), মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত 'অধোরেখ' (প্র. প্র. ১৯৭০), ইউনুস আলী সম্পাদিত 'শব্দশিল্প' (প্র. প্র. ১৯৭০), শব্দশিল্পের একটি মাত্র সংখ্য প্রকাশিত হয়েছিল, নেপথ্যে সম্পাদক ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। জালাল

www.pathagar.com

আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত কিংশুক (প্র. প্র. ১৯৭৬), অরুণাভ সরকার সম্পাদিত 'ঈষিকা' (প্র. প্র. ১৯৭৯), আবিদ আজাদ সম্পাদিত কবি (প্র. প্র. ১৯৮০)। এরপরের ইতিহাস বিশ্বসাহিত্য, বাংলা সাহিত্য এক রেখায় পর্যবসিত। এ পর্বে খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত 'একবিংশ', সরকার আশরাফ সম্পাদিত 'নিসর্গ', এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত 'লিরিক', সরকার আমিন সম্পাদিত 'মঙ্গলসন্ধ্যা', মুহম্মদ নিযামুদ্দীন সম্পাদিত 'উপমা' (প্র. প্র. ১৯৯৪), সাজ্জাদ বিপ্লব সম্পাদিত 'স্বল্পদৈর্ঘ্য' (প্র. প্র. ১৯৯৭), ওবায়েদ আকাশ সম্পাদিত 'শালুক' (প্র. প্র. ১৯৯৯), কামরুল হুদা পথিক সম্পাদিত 'দ্রষ্টব্য' (১৯৯২), 'ছোটদের কাগজ' সম্পাদক লুৎফর রহমান রিটন (প্র. প্র. ১৯৯৫), কাজল শাহনেওয়াজ সম্পাদিত 'ফৃ স্কুল স্ট্রীট' (প্র. প্র. ১৯৯৫), আল হাফিজ সম্পাদিত শেকড় (১৯৯৬), তারেক মাহমুদ সম্পাদিত 'পথিক' (প্র. প্র. ১৯৯৭), তৌফিক জহুর সম্পাদিত 'উদ্যান' (প্র. প্র. ১৯৯৮), আহমদ ছফা সম্পাদিত 'উত্থান পর্ব' (প্র. প্র. ১৯৯৭), অনিকেত শামীম সম্পাদিত 'লোক' (প্র. প্র. ১৯৯৯), ত্রিদিব দস্তিদার সম্পাদিত 'অক্ষর' (প্র. প্র. ১৯৯৮), 'Anti clock' সম্পাদক মাঈন মজুমদার (প্র. প্র. ১৯৯৯), মাসুদ আশরাফ সম্পাদিত 'Coffin Text' (প্র. প্র. ১৯৯৮), মাসুদ পথিক সম্পাদিত 'মতিঝিল' (প্র. প্র. ২০০০), আরিফ নজরুল সম্পাদিত মসলিন (২০০১), খৈয়াম কাদের সম্পাদিত নেমিসিস (প্র. প্র. ১৯৯৭), মাহমুদ শাওন সম্পাদিত 'সুতরাং' (প্র. প্র. ১৯৯৮), হেনরী স্বপন সম্পাদিত 'জীবনান্দ' (প্র. প্র. ১৯৯৫), হাসান আলীম সম্পাদিত 'নাট্যমঞ্চ' (প্র. প্র. ১৯৯৬), শাহরিয়ার ইমতিয়াজ সম্পাদিত 'পত্তর' (প্র. প্র. ১৯৯৪), ইশারফ হোসেন সম্পাদিত 'সকাল', সরোজ দেব সম্পাদিত শতাব্দী (প্র. প্র. ১৯৯৩), গদ্য সাময়িকী সম্পাদক শাহাবুদ্দীন নাগরী (প্র. প্র. ১৯৯২), নোঙর, সম্পাদক মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন (প্র. প্র. ১৯৯১)। (ক্রমশ)।

শিল্প সাহিত্য, বলা বাহুল্য– ব্যক্তির সৃষ্টি, কাব্যের মূল প্রবর্তনা ব্যক্তির মধ্যদিয়েই সমাজে সঞ্চারিত হয়। আর এই সঞ্চারিত হওয়ার নিমিত্তে মাধ্যম প্রয়োজন। পাখির ওড়ার জন্য যেমন ডানা, বৃষ্টির জন্য যেমন কৃষ্ণ মেঘ, তেমনি সমাজের নির্যাস নিজের মধ্যে ধারণ করে শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় সোচ্চার হওয়ার প্রকৃত মাধ্যম লিটল ম্যাগাজিন। লিটল ম্যাগাজিনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ইতিবাচকভাবে কর্মের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় ছোট কাগজ ও সাহিত্যনির্ভর পত্র-পত্রিকায়। একটি মৌলিক সৃষ্টি ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে ডিঙিয়ে নিজস্ব চরিত্রে দাঁড়িয়ে যায়। বাণিজ্যিক পত্রিকা সেই নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাতে পারে না। এখানেই লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্র-পত্রিকার অহংকার। মত প্রকাশের বিশাল সুযোগ।

তথ্যসূত্র ঃ

i. প্রসঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন ঃ সন্দীপ দত্ত।

www.pathagar.com

ii. করতলে মহাদেশ ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ।

iii. সাহিত্য বাস্তবতা ঃ আজহার ইসলাম।

iv. তিরিশ পরবর্তী বাংলা।

কবিতার দিকচিহ্ন ঃ পরিমল চক্রবর্তী।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কবিতা

ভূমিকা ঃ আদতে কল্পনার মধ্যেই বাস্তবতা-লালিত মানুষের মুক্তি এবং এই মুক্তিই চিরকাল মনুষ্যত্বের আধেয়। চিরকাল মানুষের অন্বিষ্টও এই-ই। আর অন্যপক্ষে কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে সার্থকতম সমন্বয় কবিতার পক্ষে করা যেমন সম্ভব, অন্য মাধ্যমের পক্ষে তেমন সম্ভব নয়। কবিতা যেমন বস্তুনিরপেক্ষ নয়, তেমনি নির্দিষ্ট বস্তুর কাছে উৎসর্গীত প্রাণও হয়। বস্তুত কবিতার বিষয়বস্তু হলো, ইহজাগতিক, পারজাগতিক আবর্তের চেতন ফসল। নিশ্চিতভাবেই আমরা কাব্যে কবির মনকেই আস্বাদন করি; তাঁর আবেগ, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর দেখা, প্রেম-অপ্রেম, সুন্দর সম্পর্কের রুচি। কবিতার তত্ত্বের ওপর কবির মন আধিপত্য লাভ না করলে কবিতা কবিতাই নয়। কাব্যে দেশ, কাল, ঐতিহ্যের জীবননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কবিতায় কবির অস্তিত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

আমরা বলতে চাচ্ছি, যেহেতু কবিতার প্রেক্ষাপট হয় একটি নির্দিষ্ট অংশকে ঘিরে, সেখানকার পানি-আবহাওয়া, মাটি- নিঃশ্বাস সবকিছুই কবির নখদর্পণে। তাই কবি বিষয়বস্তুকে ক্ল্যাসিক বস্তুতে রূপান্তরিত করে স্ব-স্বভাবকেই অনুসন্ধান করে। কবিও একটি দেশের সামাজিক সম্মানিত নাগরিক। পৃথিবীর জটিল আশ্রয়ে ও অভিঘাতে মানুষের মেধা ও বুদ্ধিতে প্রতি মুহূর্তে যে বিচিত্র অভিক্ষেপ সূচিত হয়, তার ফলে কবি হয়ে ওঠেন অস্তিত্বজ্ঞান, তার মূল্যায়ন প্রবণতা নিজের অস্তিত্বের পটভূমিকে সামগ্রিকভাবে আবিষ্কার করতে চায়। আর সে কারণেই পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয়া প্রতিদিনের নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্তলীন ও আবহমান ইতিহাস, ঐতিহ্য চেতনা প্রবাহকে ঝালাই করতে হয়। শব্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে কোনো সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আধুনিক মানসের আদি ও অন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চেতনা স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস ও পরিপার্শ্বের অসংখ্য সমান্তরাল সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ে

www.pathagar.com

এবং ফলে এর বহুধা-বিস্তৃত রসের মধ্যে তার জাগরণ ঘটে। এ যেন বস্তুর স্থূল মাংসের স্তর থেকে স্তর অতিক্রম করে মূল শাঁসের দিকে অগ্রসর হওয়া, প্রতিষ্ঠিত প্রতীকগুলোকে অভিব্যক্তির নিবিড়তর পর্যায়ে একাত্ম করে স্তম্ভের মত ব্যবহার করা। সভ্যতার ক্রম-বিবর্তন-পরম্পরা ও মানব প্রতিভার পরিকর্ষণ মানবসমাজের ওপর সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থাজনিত প্রতিক্রিয়ায় লালিত।

আর একটি আপ্তবাক্য 'আন্তর্জাতিক আদর্শে আমাদের কাব্যের মুক্তি নেই। আমাদের কাব্যকে বাঁচাতে হলে প্রথমে জাতীয় হতে হবে। প্রথমত: দেশ গ্রহণ না করলে, দেশীয় লোকের প্রাণের বস্তু হতে না পারলে এর কোন মূল্যই নেই। তাই মূল কথা হলো, কবি তাঁর বিশিষ্ট যে প্রতিফলন তুলে ধরবেন তাকে মূলত দেশ, কাল, ঐতিহ্যের পাত্র উদ্ভূত হতেই হবে।' কবিতা কেন দেশ, কালের হতে হবে এ প্রসংগে হাসান হাফিজুর রহমান বলেছেন- 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক আত্মসাতের একাংশও তিরিশের কবিরা করেননি। রবীন্দ্রনাথের গ্রহণের সীমা সুদূর অতীত থেকে ত্রিশের কবিদের গ্রহণের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পার্থক্য বোধকরি এইখানে যে, বিশ্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যদিয়ে আবহমানের দেশের রসে জারিত হয়ে এসেছে। আমাদের বাঙালি স্বভাব ও প্রবহমান রসবোধ তাকে আপন করতে, গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। সঙ্গে সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে গেছে তাঁর কাব্যের সঙ্গে। আমরা জাতীয় জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ভূগোলে তাকালে দেখতে পাই নতুনত্ব, স্বাতন্ত্র্য রেখায় উদ্ভাসিত উত্তরাধিকারের প্রতিটি স্পন্দন। নতুন দেশজ শেকড়-বাকড়ে আচ্ছাদিত।

১.১

আমরা দু'টি বাক্য লক্ষ্য করি ঃ

কাব্যের অবিনশ্বরতার পেছনে যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা ও অচিন্ত্য অলৌকিকতা বিদ্যমান নয়, এর পেছনে যে পুরোপুরিই সমাজতাত্ত্বিক সংবেদনই ক্রিয়াশীল সে বিষয় সম্ভবত সন্দেহমুক্ত হওয়াই অধিকতর সমীচীন বলে হয়।

কবিতা সমাজ ও মানুষের এমন সব উন্নত চাহিদার শর্তাধীন যে এসব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না মিটিয়ে এর পক্ষে চিরন্তন শিল্প-সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

১৯৩০ সালে কবিতার ইতিহাসে যে আধুনিকতার ছোঁয়া আমরা পেয়েছি তা কালের বীক্ষায় কতোটা গ্রহণযোগ্য এবং কতোটা বর্জনীয়? সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত (আমি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী লোক নই) একদল কবি ইউরোপিয়ান ছাই-ঘাস তুলে এনে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যা ছিলো রীতিমত বেদনাদায়ক। হাজার বছরের বাংলা কবিতার আধুনিক নন্দন পুরুষেরা হলেন চর্যাপদের কবিসমাজ। বাংলাদেশের মানুষ যেদিন গুহা থেকে, নদীর পাড় থেকে এসে প্রথম জীবন

www.pathagar.com

শুরু করলো সত্যিকার অর্থে সেদিনই আধুনিকতার প্রথম বীজমন্ত্র রোপিত হয়েছিল। শিল্প ক্রমশ ধাবিত হয় নিজস্ব মৌলসত্তা নিয়ে। এই যে চর্যাপদের কবি থেকে নব্বই দশকের কবিবৃন্দ পর্যন্ত যে সমান্তরাল রেল লাইন চলে গেছে এখানে টিকে আছে শুধু প্রেক্ষাপট, নির্মাণ এবং বিষয়। দেশ, কাল, ঐতিহ্যের বাইরে গিয়েও কবিতা লেখা যায়; কিন্তু তা কালের চোরাবালিতেই হারিয়ে যায়। প্রত্যেক শিল্পেরই তাঁর নিজস্ব দেশ, কাল, ঐতিহ্যের ভিত্তি থাকতেই হবে। আর এই ভিত্তি যাঁর প্রজ্ঞাবলে যত মজবুত তিনি ততোটাই সময়ের চৌকাঠ ডিঙাতে সক্ষম। জাতীয় সমস্যার প্রতিটি স্তরকে স্পর্শ করেই প্রাণশক্তি অর্জন করে কাব্যে ফুটিয়ে তোলাই জাগতিক চেতনসম্পন্ন সত্তার দায়িত্ব। নিস্তরঙ্গ, আদর্শহীন জীবনবোধ স্ব-বিরোধী শিক্ষায় আত্মকেন্দ্রিক ও লক্ষ্যহীন উৎসাহে ভারাক্রান্ত জাতীয় জীবনস্বরূপের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণই কবির ঐকান্তিক কাজ। কবি আল মাহমুদ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। দেশের ক্রান্তিলগ্নে লিখেছেন 'ঊনসত্তুরের ছাড়' প্রসংগত একটি ইতিহাস ধুলো ঝেড়ে আবার সামনে আনা যায়। ১৪০১ বাংলা সনের শেষতম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়কেন্দ্রিক সাহিত্য সংগঠন 'মুক্তমন' ৫ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বসন্তকালীন কবিতা উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবের ৩য় পর্বে ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটে সুধী সমাবেশে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর শিরোনাম ছিলো- 'কবিতা দেশ, কাল, ঐতিহ্যের-কবিতা উত্তর আধুনিকতার'। এই সেমিনারে কবি ইশারফ হোসেন একটি লিখিত আলোচনা উপস্থাপন করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অগ্রজ-অনুজ খ্যাতিমান সকল কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক-গবেষক বক্তব্য রাখেন।

এই ইতিহাস ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে একটানে তুলে আনলাম এ জন্য ত্রিশ- উত্তর বাংলা কবিতার এটাই বোধকরি সবচে' বড় কবিতা বিষয়ক মুক্তমনের আদান-প্রদান (আমার জানা মতে)। এখানে মনসুর মুসা, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আলী রিয়াজ, আবদুল হাই শিকদার, সরকার আমিন (আরও খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ) বক্তৃতা করেন। যা কালের কবিতার বিশেষ সাক্ষ্য বহন করছে। কারণ কবিতার ইতিহাস পঠন-পাঠনের ইতিহাস। যে বিষয় থেকে কবির দুঃখ-যন্ত্রণা, সুখ-আনন্দ, ক্রোধ, ক্ষোভ সবকিছু থেকে অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে, সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত গ্রহণ-বর্জন, দর্শন, স্বাদ-আস্বাদের নতুন আবাসভূমি। যেখানে কবি দাঁড়িয়ে যান, মানুষের সমাজবদ্ধ অস্তিত্বের জীবনঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বহমানতাকে তুলে ধরার জন্য। এ জন্য কবির একটি দেশের প্রয়োজন। কবির দেশ, কবির কাল, কবির পরিচয়, মোহন সঞ্চয় বিকোতে হয় জাতির বিবেককে জাগ্রত করার জন্য। 'অহংকারের নিশান নিয়ে যে বিষয়গুলো কবির জমিনের উপর সারিবদ্ধ তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে-বাতাসে বাবুই পাখির বাসায় দোল ছড়াচ্ছে, নদী, খাল, বিল, জঙ্গল, সুন্দরবন, রাঙামাটি, সিলেট, মহাস্থানগড়, ষাটগম্বুজ মসজিদ, সোনারগাঁ, ঈশা খাঁ, মন্দির, গীর্জা,

www.pathagar.com

প্যাগোডা, সঙ্গীত, গজল, পুঁথিকাব্য এগুলো কি? আমাদের ঐতিহ্যের নিশানদার না? পেছনের সবুজ মাটির স্মৃতি, ক্যালেন্ডারের ধূলিময় দিনলিপি, আর বর্তমানের বাংলাদেশ এসবই একজন কবির শ্রেষ্ঠ কম্পাস। আর সে কারণেই কবির দেশ, কাল, ঐতিহ্য : এর অস্তিত্ব সংলগ্নতা, প্রাসঙ্গিকতা শিল্পহীন নয়। গ্রাম্য নয়, উত্তর-আধুনিক মহৎ শিল্পের নিখাদ সৌন্দর্য। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির জন্যই তার নিজস্বতা তার বড় বিষয়, প্রধান বিষয়। এই নিজস্বতা চর্চার মধ্যদিয়েই তাদের পরিচয়, শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা ব্যর্থতা বেরিয়ে আসে। টলস্টয়, ডিকেন্স, মিল্টন, হোমার, শেলী, কীটস, বায়রন, রবীন্দ্রনাথ পাঠে ইতিহাসবোধ থেকে আমরা এই শিক্ষা পেতে পারি। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। এর সকলেই শিল্পের মহান কারিগর। তাদের নিজস্ব শেকড় চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য। যা শিল্পের জন্য শিল্পীর হৃদয় উৎসারিত পংক্তিমালা। উনিশ শতকের সাহিত্যে আমরা দেখি, ইউরোপের চাকচিক্যময় নাগরিক ভ্রমণ শেষে মাইকেল শিকড়ের তালাশে মত্ত রইলেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলী' নিয়ে দাঁড়ালেন আধুনিকবাদীদের সামনে। ফররুখ আহমদ 'হাতেম তাই', 'সাত সাগরের মাঝি', 'পাঞ্জেরী'র মধ্যে খুঁজতে লাগলেন ঐতিহ্যের গুপ্তধন। আর জীবনানন্দ দাশ নিজেই বললেন- 'আলাওল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতা পড়ে নেয়া উচিত।'... আগাগোড়া বাংলা কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধই সবচে' আগে এবং সর্বদাই দরকারি।' জীবনানন্দের এই 'আত্মীয়তা' শব্দটিই দেশ, কাল, ঐতিহ্যের পথে আমাদের নিয়ে যায়। আমরা চিনতে পারি রূপসী বাংলাকে। যেখানে কাঁঠাল পাতা ঝরে পড়ে ভোরের বাতাসে।

www.pathagar.com

আধুনিক সাম্প্রতিক ও আমাদের কাল

প্রাককথন ঃ কবিতা বিষয়ক কথাবার্তা কিংবা আলোচনা করতে গেলেই আজকাল শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এই মুহূর্তে আমার অতিপ্রিয় একজন তরুণ কবির কবিতা আমি হয়ত আলোচনায় আনতে পারলাম না। ব্যস! শুরু হয়ে গেল আলোচনা-সমালোচনা– অবশেষে কঠোর বিষোদ্গার। বাংলা সাহিত্যের রাজধানী ঢাকা। অথচ ঢাকার তরুণ সাহিত্য যশোপ্রার্থীদের আজকের অবস্থানটা কি? দেখলে মনে হয় এক-একজন সাহিত্য পণ্ডিত হয়ে গেছেন। আবার শাহবাগের বইপাড়া আজ আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর মতো গোত্রে-গোত্রে বিভক্ত। কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে পানি, কোথাও জল। কেন এই বৈষম্য? এই বিমুখতা?

সাহিত্যচর্চা করতে হবে স্কুল জীবনের মত করে। শ্রেণীতে প্রথম/ দ্বিতীয়/ তৃতীয় স্থান পাবার জন্য মেধাবীদের সারা বৎসর অমানুষিক পরিশ্রম, অবশেষে আশানুরূপ ফলভোগ, কী তৃপ্তিদায়ক কিন্তু সাম্প্রতিক কবিতা চর্চাকারী তরুণ কবি যশোপ্রার্থীদের আচার-আচরণ আর কথাবার্তা যে ধরনের বাচালতা প্রতীয়মান হচ্ছে, এতে করে আগামী দিনের বাংলা কবিতার ভবিষ্যত কী বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবতেই শংকা জাগে হৃদয়ে।

আজকের সাহিত্য চর্চাকারীদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা দু'টি শব্দ। একটি প্রগতিশীল, অন্যটি প্রতিক্রিয়াশীল। বাংলাদেশের অস্থির নোংরামো রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যের মত অরাজনৈতিক, অবৈষয়িক প্লাটফর্মকে যেভাবে প্রভান্বিত করছে, তাতে আগামী দশকে কবিদের কলম থেকে কবিতার নামে যা কিছু বেরুবে তাঁর নাম হবে দলীয় শ্লোগান, স্তুতি. বন্দনা। কিন্তু কখনোই সেই পংক্তিগুলো কবিতা নয়। বর্তমান ঢাকাইয়া সাহিত্য অঙ্গনে যে ধোঁয়াটি বিরাজ করছে– তা মেধার যুদ্ধে কেউ যদি বুঝতে পারে পরাজিত হতে চলেছে তখনই শুরু করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি মহান শব্দ– মৌলবাদী।

www.pathagar.com

মৌলবাদী শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমি অস্বস্তি বোধকরি। কারণ নব্বই দশকে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা আমরা এই শব্দটিকে তস্‌বি জপার মত জপতে-জপতে সাহিত্য অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছি। পাশাপাশি যোগ করেছি 'রাজাকার' নামের আর এক শব্দকে। সাহিত্য যৌবনের কথা বলে। সমাজের কথা বলে। নীতির কথা বলে। চলমান সময়ের দুর্ভিক্ষ আর ক্লেদাক্তময় রাজনীতির বিপক্ষ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাহিত্য শাসন করে আপন বৈশিষ্ট্য দ্বারা। কিন্তু বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে মফস্বল ভায়া হয়ে অজপাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামে যে ঢাক-ঢোল পেটানো হচ্ছে তা আসলে মস্ত ফাঁপা। ভেতরটা অন্তঃসারশূন্য। প্রগতিশীল হতে হলে প্রথমশর্ত যেখানে উদারতা, সংকীর্ণবর্জিত মানবিকতা প্রয়োজন, আমাদের তরুণ প্রগতিবাজদের সেখানেই বিশাল ঘাট্‌তি। চলমান সময়ের তরুণ কবি যোশপ্রার্থী বুঝতেই পারছেন না প্রগতিশীল কিংবা মৌলবাদী, কোনো ক্যাম্পেই সদস্য হলে কবি হওয়া যাবে না। কবি একটি আলাদা সত্তার নাম। যা সমাজ থেকে সবসময় একশত বছর এগিয়ে থাকেন। কবি সমাজেই বসবাস করেন। মানবিক-আত্মিক-জৈবিক চাহিদা কবিরও থাকে। কবি সমাজকে স্বপ্ন দেখাতে থাকেন। সমাজের মানুষ কবির এ স্বপ্নকে লালন করে হৃদয়ে। মনকে করে আলোড়িত। অসম লড়াইয়ে যেখানে মানবিক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মানুষ দ্বিমুখী-ত্রিমুখী আচরণ করে সেখানে একজন কবি সবসময় নিজের দেখানো পথে চলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কবিদের ধর্মই একটাই। লেখা। লেখা। এবং লেখা। শ্রেণীর একজন ফাস্টবয়ের যেমন অন্যকোনদিকে নজর দেবার সময় থাকে না তেমনি একজন কবিরও তেমন সময় নেই অহেতুক সময় নষ্ট করা। কবিতার জন্য একজন কবিকে সারাজীবন সময় দিতে হয়। কেউ কেউ কবিতা নামক সেই মায়ামৃগের সন্ধান পেয়ে যান অল্পতেই আবার কোন কোন কবি যশোপ্রার্থী এক জীবন পার করে দেবার পরও সেই মায়ামৃগের দেখা পান না।

আধুনিক যান্ত্রিক এই সময়ে আমাদের সাহিত্যচর্চাও আজ যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কিংবা জীবনানন্দ দাশের সেই ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার জামানা এখন আর নেই। পঞ্চাশের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, ওমর আলী, ফজল শাহাবুদ্দীনসহ অন্যান্য কবিসমাজ পৃথিবীকে যে চোখে দেখেছেন, একবিংশ শতাব্দীর আজকের ঊষা পাদপীঠে আমরা সেভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ভূ-মণ্ডল দেখতে পাচ্ছি না। সদিচ্ছা থাকার পরও আমাদের সমাজটাকে আমরা কলুষমুক্ত করতে পারছি না। কিন্তু কবিসমাজ বলে কথা। কবিরা সত্য ও সুন্দরের পূজারী। কবিরা কখনোই অসুন্দরের দিকে সৃষ্টিশীলতার ঝাঁপি মেলে ধরতে পারেন না। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের গোত্র-গোত্র প্রাজ্ঞজন সভা বলে যে সকল গ্রুপিং-লবিং চলছে তা হতাশাজনক। কারণ তৈল মর্দন, গ্রুপিং-লবিং করে কবি হওয়া যায় না। কবিসত্তা যদি প্রকৃত অর্থে থাকে তাহলে কোনো পরাশক্তিরই সম্ভব নয় অহেতুক বিভ্রান্তি আর বদনাম রটিয়ে অসৎ ফায়দা লুটানো।

www.pathagar.com

প্রতিটি মানুষ আলাদা বৈশিষ্ট্যে, আলাদা রুচিতে সৃষ্টি। রুচিবোধ, আদর্শগত কারণ তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার। কবিসমাজও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। একজন কবিও আদর্শগত রুচি মোতাবেক ধর্মের দিকে ঝুঁকতে পারেন, নাস্তিকতাকেই শ্রেয় বলে মনে হতে পারে আবার ব্রহ্মচারীও হতে পারেন।

অগ্নি উপাসক, বৃক্ষ পূজারী, সূর্য পূজারী কিংবা সন্ন্যাসী হতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি কবিতার মত সবুজ ভূমিতে পদচারণা করবেন, তখন তার পরিচয় একটাই সে কবি। কবি কোন দলের, ব্যক্তির, গোষ্ঠীর মুখপাত্র হতে পারেন না। কবিরা স্রষ্টা, সৃষ্টির মাঝেই কবিদের আনন্দ। কবিসমাজ সৃষ্টি করে যুগরানী। যা পাঠে মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র নতুন চিন্তার রসদ খুঁজে পায়। আড়াই হাজার বছরের পুরাতন কবি সাফো'র কবিতা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানময় বিশ্ববাসী পাঠ করছে। গবেষণা করছে। কী তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে সাফো কবিতা লিখলেন যা পাঠে আজো আমরা পুলকিত। শিহরিত, উত্তেজিত। এক হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাসে আজো আমরা কালিদাস, মুকুন্দরাম পাঠ করি। আমাদের পাঠ করতে হয়। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি পাঠ না করলে আমাদের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

কবিতা হতে হয় সময় ডিঙানো দ্রুতগতিধর ঘোড়ার মত। শক্তি, সাহস, মেধা, চৌকস সবকিছুই একটি কবিতা জন্মের প্রাক্‌কথন মুহূর্ত।

রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা ও সাহিত্য অঙ্গন ঃ স্বাধীনতা- উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা সবচে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে আশির শেষপর্ব থেকে নব্বই দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত। সামরিক বুটের আওয়াজ, গণতন্ত্র আন্দোলন, শহীদ নূর হোসেনের আত্মত্যাগ, সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা দাঁড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের কাছে। প্রথমবারের মত বাংলাদেশের সবক'টি রাজনৈতিক দল এক হয়ে যায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। কবিতার অঙ্গন অরাজনৈতিক, অবৈষয়িক অঙ্গন। কিন্তু দেশের মৃত্তিকার স্বার্থে ১৯৭১ সালে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী অঙ্গন যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ কাতারে অংশ নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে, 'স্বৈরাচার হঠাও' আন্দোলনে দেশের প্রোথিতযশা লেখকসমাজ বিভিন্ন দলের গেরুয়া পরিধান করে আন্দোলনে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে কেউ প্রকাশ্যে রাজপতে নেমেছিলেন। আবার কেউ কেউ কলমের শক্তি দিয়েই লড়াই করেছেন। কিন্তু স্বৈরাচার পতনের পর লেখক অঙ্গন আর দলীয় লেজুড়বৃত্তি ছাড়তে পারেনি। প্রকাশ্যে শুরু হয় নতুন দ্বন্দ্ব। নতুন অধ্যায়। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি। কবিতা আবারও থমকে দাঁড়ায় এসময়। কারণ '৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যখন ক্ষমতায় যায় তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিখ্যাত জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায় ক্ষমতার মসনদে বসে বিএনপি। এসময় কবিতা কিছুদিন চলতে থাকে নিজস্ব গতিতে। তারপর 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিল নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন

www.pathagar.com

রাজপথ কাঁপিয়ে দিল. তখন কবিতা অঙ্গন আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মতন কবি সমাজও দিশেহারা হয়ে যান। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বিল পাস করে বিএনপি। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামীকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন ও নির্বাচন করে। এতে করে মুক্তচিন্তার কবি-সাহিত্যিক-লেখক-বুদ্ধিজীবী মহল হতবাক হয়ে যায়। দ্রুত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়ে যায়। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতার মসনদে বসে।

এভাবে বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে নব্বই দশকের সাহিত্য অঙ্গনের অঙ্কুর জেগে ওঠে।

নব্বই দশক ও আমরা ঃ ঘটনা, বিক্ষুব্ধ জনতা, রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মাঝে যে দশকের জন্ম, সেখানকার সাহিত্য অঙ্গনের কর্মীরা কেমন হবে এই ছিল পূর্ববর্তী দশকের অগ্রজদের কৌতূহল। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের পর লাভার স্রোত যেভাবে দ্রুত ধাবিত হয়, সেভাবে এই দশকের প্রারম্ভে একদল তরুণ কবি যশোপ্রার্থী নিজেদের মেলে ধরেন ছাতার মতো।

কবিতা লেখার যে পরিবেশ যে আবহ যে স্বপ্ন থাকা দরকার তা নব্বই দশকের কবি যশোপ্রার্থী সকলেই পেয়েছেন। বিশ্বরাজনীতির উত্থান-পতন, কাশ্মীর সমস্যা, আফগান সমস্যা, ফিলিস্তিন হত্যাযজ্ঞ সব কিছু মিলিয়ে নব্বই দশকের প্রারম্ভ থেকে বিশ্ব পরিবেশের ঘূর্ণায়মানতার সাথে আমাদের সাহিত্য অঙ্গনও ক্রমশ জটিল হয়ে এমন আকার ধারণ করে, আমরা ফল পেতে থাকি মৌলিক সৃজনে। কবিতা ক্রমশ দুর্বোধ্যতার মায়াজালে জড়িয়ে যায়। হত্যা, খুন, ধর্ষণ, রক্ত পাশাপাশি প্রেম, ভালোবাসা, প্রকৃতি সবকিছু একসাথে ভিড় করে কবিদের মস্তিষ্কের নিউরোনে। ফলে কবিতা নামে যা কিছু প্রকাশ পেতে থাকে, তা হয়ে যায় দুর্বোধ্য, দুর্বোধ্যতা এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করে কবিতা তার পরম্পরা হারায়। প্রতিটি পংক্তি এক একটি সত্তা হিসেবে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। ফলে একই কবিতার মাঝে রাজনীতি, সমাজনীতি, দেশ, কাল, প্রেম প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রাথমিক নব্বই আর মধ্যভাগের নব্বই দশক বিচার-বিশ্লেষণ একভাবে করা যায় না। কবিতার সাথে বসবাস করতে গিয়ে, কবিতাকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান জেনে যে নগণ্যসংখ্যক তরুণ কবি যশোপ্রার্থী কবিতার রাস্তায় চলতে লাগলেন, কালের কাছ থেকে তাঁরা যৎসামান্য মহার্ঘ্য লাভ করলেন। তবে এই কবি তালিকা দীর্ঘ নয়। দশকের শুরুতে যেখানে তিন থেকে সাড়ে তিন শত তরুণ কবি মিছিলের ন্যায় সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেন, সেখানে এক দশক পেরুতে না পেরুতেই চৈত্রের ঝরাপাতার মত অনেক কবি যশোপ্রার্থী ঝরে গেছেন। নব্বইয়ের কবিতার ডালে এখন যে কয়টি পাতা আছে তা অনায়াসেই গণনা করা যায়। বাঁধ ভাঙা জোয়ারের সাথে

www.pathagar.com

অনেক মূল্যবান রত্নও ভেসে আসে। যা কালের সীমানা ডিঙিয়ে মহাকালের মাইল স্টোন হয়ে যায়। নব্বই দশকের এ পর্বে সারা বাংলাদেশে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন কবি এখনো লিখে যাচ্ছেন। হয়তো এদের মাঝে সকলেই টিকে থাকবেন কালের ইতিহাসে। কিংবা এখান থেকেও অনেকে অকালে ঝরে যাবেন। কারণ, কবিতার ইতিহাস বিনির্মাণ ইতিহাস।

নব্বই দশকের কবিতার অনেকগুলো দিক নিয়ে আলোচনা করা যায়। যৎসামান্য প্রকৃত কবিসত্তা যে ক'জনের মাঝে বিদ্যমান, তাদের কবিতার শরীর গভীরভাবে খনন করলে যে বিষয়গুলো প্রতীয়মান হয়,

i) আধ্যাত্মবাদ ii) দেহতত্ত্ব iii) ছন্দহীনতা iv) পরাবাস্তবতা v) উল্লম্ফনতা vi) নানাবিধ জটিলতা vii) বাক্যঋণ।

নব্বই দশকের শুরুতে কবিতা চর্চার যে জোয়ার, তা ক্রমশ অস্তমিত হতে থাকে দশকের চাকা যতোই সামনে এগোয়। অসংখ্য কবি যশোপ্রার্থী বাক্যঋণে জর্জরিত হয়ে যান। দশকের পুরো সময়টা ম্যারাথন দৌড় থেকে পেছনে পড়ে যেতে যেতে অবশেষে হারিয়ে গেছেন কালেরগর্ভে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রকালের কথা স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে কবিকে অনুসরণ করতেন কিংবা তাঁকে সূর্যভেবে সৌরমণ্ডলের গ্রহের ন্যায় চতুর্দিকে ঘিরে থাকতেন একঝাঁক কবি। তৎকালীন সকলেই জনপ্রিয় ছিলেন। অথচ কালের চোরাবালিতে আজ তাঁরা কোথায়? বর্তমান সময়ের অনেক প্রতিভাবান কবি যশোপ্রার্থী হয়তো কালের বন্দিশে হারিয়ে যাওয়া ঐ সকল প্রতিভাবানদের নামই জানে না। সাহিত্য অঙ্গন এমনই। মেধার যোগ্যতা দিয়ে টিকে থাকতে হয়। নব্বই দশকের শুরুতে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর না হলেও পরে ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পায়। আর তখনই দেখা যায় কবিতা ও কবির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো জন্মলাভ করা অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন ধীরে নয় বেশ দ্রুতই বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেগুলো টিকে থাকে সেগুলোর পদক্ষেপ হয় ছেঁচড়িয়ে-ছেঁচড়িয়ে। অর্থাভাবে কখনো বছরে এক সংখ্যা আবার কখনো বছরে না দুই বছরে এক সংখ্যা প্রকাশ পেতে থাকে।

নব্বই দশকের যে বিষয়টি সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়, তা বাণিজ্যিক পত্রিকার সাহিত্যপ্রীতি। তরুণদের উৎসাহ দেবার জন্য জাতীয় দৈনিকগুলো পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি করে। এতে কোরে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

বাণিজ্যিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ফলশ্রুত অনেক বাজে লেখা প্রকাশ পায়। পাশাপাশি অনেক মানসম্পন্ন লেখাও প্রকাশ পায়। যা ইতিবাচক।

এই দশকের শুরুতে 'উত্তর আধুনিক' আন্দোলন নামে নতুন এক মতবাদ সাহিত্য অঙ্গনে

www.pathagar.com

বেশ আলোড়ন তোলে। মডার্নিজম অরিয়েন্টালিজম প্রভৃত ধারাবাহিকতা চললেও উত্তর আধুনিক মতবাদটি 'নানা মুনির নানা মত' ধারায় চলতে থাকে। ফলত: কম্যুনিজম, ইসলামিজম, আস্তিক-নাস্তিক প্রত্যেকেই উত্তর আধুনিক নিয়ে যার যার মত ব্যাখ্যা প্রদান করে। ফলে ধারাটি আলোচনা-সমালোচনায় বিভক্ত হয়ে যায়। এভাবে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়া'র উত্তর আধুনিক আন্দোলনকারীদের মুখপত্র পাঠে বিদগ্ধ সমাজ হত-বিহব্বল হয়ে পড়ে প্রকৃত উত্তর আধুনিক তত্ত্বের সন্ধানে। যা এক দশক পার হলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতেই অবস্থান করছে।

মোদ্দকথা, নব্বই দশকের প্রতিটি সময় জটিলতার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। ফলে এখন যে সকল কবি লিখে চলেছেন, কালের মানদণ্ডে তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে, একথা বলা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন, পড়াশুনা, পড়াশুনা শুধু পড়াশুনা।

www.pathagar.com

কবির ভাষা কবিতার কথা

প্রাক্‌কথন ঃ মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজ হচ্ছে বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিত বহন করছে। আমরা যদি কখনো আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ-বিমুখ হই তাহলেও সমাজ আমাদের অনুসরণ করবে ভাষা হয়ে কখনো জাগরণে, কখনো স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতাকে ধারণ করে আছে। শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। যিনি চিরটাকাল আকাশে স্বপ্ন ছড়াতে চায় তিনি তাঁর শব্দকে মানব সমাজের চেতনার আড়ালে নিতে পারেন না। প্রতিদিনের গতিবিধিতে যতোটা অঞ্চল আমরা ভ্রমণ করি, শব্দরূপে আমাদের ইচ্ছাগুলো তাঁর চেয়েও অধিক অঞ্চল ভ্রমণ করে। এই ইচ্ছাগুলো যাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে পথে-পথে, সবুজ বাগানে কিংবা আকাশে সোনালী ডানার চিলে উড়ে বেড়ায় তিনি একজন কবি। কবিতার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। নীহারিকার মতো পরস্পর সংলগ্ন অনেকগুলো অনুভূতি কবি হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে কবি লিখে ফেলেন একটি কবিতা। এই লিখে ফেলার পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত প্রসব বেদনার মতো ছটফট করে কবিসত্তা। কবি শব্দ নিয়ে খেলা করেন। আর কবির নিকট শব্দ হচ্ছে রাজ-রাজড়ার দাবা খেলার ঘুঁটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির স্মৃতিতে যতগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই চলে তাঁর বহু বিচিত্র কথা- কথা খেলা। নতুন শব্দ যোগ করে আবার পুরাতন শব্দভাণ্ডার অস্বীকার করে নয়, বরং আয়ত্তগত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিন্যাসে নতুন-নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তোলে কবির ভাষার নির্মাণশৈলী। যা পাঠে পাঠক হয়ে যায় বিমুগ্ধ। হৃদয়ে ওঠে কম্পন। বিশ্বাসের উষ্ণতায় হৃদয়কে করে উন্মোচিত।

১.১

কবিতার প্রকাশ রূপ শিল্পায়ও শব্দের বিশেষ বিন্যাস মাত্র। যদিও সৃষ্টির আবেদনের

www.pathagar.com

পশ্চাতে ব্যক্তি মানসের রহস্যতত্ত্ব বর্তমান। একথা সত্য মানুষ সৌধ নির্মাণ করেছে বসবাসের প্রয়োজনে। মানুষ সভ্যতার যে স্তর বা বর্বরতার যে পর্যায়ে বাস করেছে, যে দেশ বা যুগেই তা হোক না কেন, সে শব্দে বা রেখায়, বর্ণে বা ধ্বনিতে এমন কিছু সর্বদাই সৃষ্টি করেছে, পার্থিব হিতবাদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে যার ব্যাখ্যা করা চলে না। কবিতা এমন এক শিল্প। দেশ, কাল, সীমানা এসবে কখনো কবিতার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। কবিতা কোনো নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। কবির হৃদয়ে বুদ বুদ হয়ে ওঠা আবেগের মহাবিস্ফোরক কবিতা। ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, এবাদতের এক মহামিলন সমাবেশ হলো কবিতার পটভূমি, কবির ভাষা চিরদিনই রহস্য, সংসক্ত, স্বপ্নে মত অনির্ণীত ও কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ব্যক্তি-মনীষার অসাধারণ উল্লাস। আর তাই কবির ভাষাময় কারুকার্যখচিত রত্নটির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা চলে শুধু সৃষ্টির প্রকাশরূপটিকে। কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ধার অসম্ভব।

কবির ভাষা কবিতার ভাষা ঃ শব্দের অর্থ কবিরা নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার করেন। ভাষাকে জাতির চৈতন্যোদয়ের কুশল সম্ভাষণ মনে করে কবিসমাজ লিখেন মনের মাধুরী মেশানো বাক্য পরম্পরা। কবিতা বুঝতে হলে আগে কবিকে বোঝাও জরুরী। কবির মেজাজ, মননশীলতা, চর্চা, গভীরতা এসব বিষয়গুলোতে তীক্ষ্ণ নজর বুলালে কবির কবিতার ধরন-ধারণ ও রসবোধ কাব্যগত ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হলে সেই কবির কাব্যের শব্দরূপ এবং বাণী-মূর্তির দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। কেননা শব্দ এবং ধ্বনির প্রশ্রয়েই কবিতার অর্থ ধরা পড়ে।

কবির বক্তব্য কাব্যের শব্দ মূর্তির সঙ্গে বিজড়িত, অনেকটা অঙ্গাঙ্গি সংযোগের মতো। কাব্য রহস্য সৃষ্টি করতে পারে, মানব মনে অনুপ্রেরণা আনতে পারে, সাধারণের উপভোগের অতিরিক্ত একটা আনন্দ জাগাতে পারে; কিন্তু কবিতা প্রধানত এবং মূলত ভাষার সম্ভাবনা নির্ণয় করে থাকে। কবিতায় রূপ বা আঙ্গিকের কথা কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু এর অর্থ অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। কবি কোন একটি তত্ত্ব বা দৃশ্য ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন এবং তত্ত্বটি যথেষ্ট মূল্যবান- কবি এখানে সেই মূল্যবান তত্ত্বটিকে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপনের যে কারিশমা দেখান সেটিই কবির ভাষা বলে বিবেচিত। কাব্যের রস-নিবেদন জীবনের প্রয়োজন বা প্রকাশের সাথে মধুর ভাষাগত সংযোজন যেখানে সত্য আসে কঠিনতম উলব্ধির পর; তাকে আত্মস্থ করে কবির পথচলা। ভাষাগত মসৃণ পথ বেয়ে শিল্পের জন্য শিল্পীর শিল্পগ্রামের মডেল অঙ্কন। কল্পনার লাগামহীন বল্গা হরিণীর দৌড়ে আবেগকে পুঁজি করে এই নিরন্তন পথচলা, যেখানে সমাজ, সংসার, জীবন গৌণ হয়ে যায়– শুধু ভাষার শৈলীতা নির্মাণে, কবি এগিয়ে যান সামনে। কখনো আঙ্গিকগত কারণে কবিতা হয়ে যায় লোকজ ধারা কখনো বা আধুনিক, ঐতিহ্য, উত্তর আধুনিক, আধ্যাত্মিক, প্রেম, দর্শন, সমাজ, সংস্কার, রাজনৈতিক, দেশাত্মবোধক অথবা উদ্দীপনামূলক কবিতা। কবিতা বারে-বারে, ফিরে-

www.pathagar.com

ফিরে নির্মিত হয়। একই কবিতা একাধিক কবির হাত বেয়ে প্রসবিত হয় ভিন্ন আঙ্গিকে। ভাষার তারতম্যে। কারণ কবি সমাজ থেকে চিন্তা-চেতনের দিক দিয়ে সর্বদা একশ' বছর সামনে এগিয়ে থাকেন। জীবনের কোলাহলকে ভুলে কবি শান্তি ও নিভৃত আশ্রয় খুঁজতে লোকালয়ের অন্তরালে বাস করে মনের এক মানবিক নির্জন হ্রদের তীরে। কবির আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা সবটুকু ছিম-লতার বাগানের ছবির মতো মাটির প্রশান্তিময় ঘরে সীমাবদ্ধ। যে ঘর কবিতার। শুধু কবিতার। জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকগত ব্যঞ্জনা এঁকে চলেন কবি। প্রতিনিয়ত এই আঁকা ছবি আঙ্গিক ও বিষয়গত কারণে পাঠকের হৃদয়মন্দিরে কড়া নাড়ে। বোধের আঙ্গিনায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে যায়। আন্তরিক ও সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় স্বপ্নময় অধ্যায়কে।

i. হালায় আজকা নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপট্টির খান্‌কি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতের তামাম গতরে। পাও দুইটা কেমুন
আলগা আলগা লাগে, গাঢ়া আবরের সুনসান
আন্দর মহলে হাঁটে। মগর জমিনে বান্ধা পাও
আবে, কোন্ মামদির পো সামনে খাড়ায়। -

[এই মাতোয়ালা রাইত : শামসুর রাহমান]

ii. আমার আরম্ভের উগ্রতায় খড়খড়িতে নিঃশব্দে বেড়ে উড়েছে
মানি প্লান্ট, শিকের ওপর পরাশ্রয়ী গুল্ম আর
গৃহস্থালির পাশে নিঃশব্দ সার্জারীর মতো নরম বুক;
এখন শব্দ ও সুরের শিহরণে তার স্থান বদল করবে।
মানি প্লান্টের পাতায় আমার জন্য নেতির দোলা। কম্পিত সবুজে
না না আওয়াজ। আর নরম বুক দুটি, পুঞ্জীভূত অভিমান।
যে ওঁৎ পেতে থাকা মাংস সহসা সংগীতের পর পরই শব্দ করে ওঠে
তাকে কেবল স্তন বললেই কী করে পোষায়? আমি তাকে
সংগীতই বলি। গানের বিরুদ্ধে গান। ঐ তো
ব্লাউজে উঁচু হয়ে আছে বাণীর আভোগ।

www.pathagar.com

বন্দিসের বিরুদ্ধে বন্দিস।

[দোয়েল ও দয়িতা : আল মাহমুদ]

iii. যারা সমুদ্রের গর্জন থেকে মানুষের পৃথক করতে পারে
তারাই শুনুক, আমি শুনতে চাই না ভেসে আসা মহাসিন্ধুর গান।
যারা বৃষ্টিপাত থেকে মানুষের অশ্রুপাতকে পৃথক করতে পারে
তারাই বৃষ্টির সৌন্দর্য দেখুক, তাদের স্বপ্নের মধ্যে বর্ষিত হোক
সুরাবৃষ্টি, তারাই কণ্ঠভরে পান করুক মদ। আমি মাদকতার
মধ্যে ভুলতে চাই না আমার বাস্তবতার দুঃখ।

[প্রত্যাবর্তন : নির্মলেন্দু গুণ]

iv. তুমি সেই লোক শ্রুত পুরাতন অবাস্তব পাখি,
সোনালী নিবিড় ডানা ঝাপটালে ঝ'রে পড়ে যার
চতুর্দিকে আনন্দ, টাকার থলি, ভীষণ সৌরভ।
রোমশ বালুকা-বেলা খেলা করে রৌদ্রদগ্ধ তটে;
অস্তিত্বের দূরতম দ্বীপে এই নিঃসহ নির্জনে
কেবল তোমার জন্য ব'সে আছি উন্মুখ আগ্রহে–
সুন্দর সাম্পানে চ'ড়ে মাধবী এসেই বলে– যাই।

[মাধবী এসেই বলে : যাই : রফিক আজাদ]

v. নিরাপত্তা খুঁজে নিতে হয়।
মানুষের আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই।
প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে এই সান্দ্র যোগাযোগ
অনেক দিনের
মানুষ পারে না শুধু মানুষের সাথে।

[মানুষ পারে না শুধু মানুষের সাথে : আসাদ চৌধুরী]

vi. রক্তে আবার অগ্নি জ্বলেছে বেজেছে ঘোড়ার চিঁহি

www.pathagar.com

সাত-সাগরের তরঙ্গ-ডাকে দুয়ার ভেঙেছে গৃহী।
সবচেয়ে বড় বিস্ময় আনে শিশ্নের উচ্ছিতি
তোলপাড় আর আকুল করেছে শীরের সামগীতি
শুধু জেগে আছে মানুষ- মানুষী, স্নায়ুর ঝনন-রণন
ওগো বাহুবন্ধন।
কাকাতুয়া আর টিয়ে পাখিদের কেবলই স্বনন-ক্বনন
ওগো উরুবন্ধন।

[বাহুবন্ধন উরুবন্ধন : আবদুল মান্নান সৈয়দ]

vii. উঠুন জাগুন দেখুন আগুন
আপনার চারিদিকে
সারা পৃথিবীতে কেউ ভালো নেই
স্বাস্থ্য ও শারীরিকে।

এখানে মানুষ ওখানে ফানুস
হাওয়ায় উড়ছে ঘুড়ি;
পাথুরে দিনের তেজপুঞ্জের
যুদ্ধগ্রস্ত নুড়ি।

ওভারব্রিজের ক্যাকটাস চেপে
দাঁড়িয়েছিলে কি তুমি
তোমার করোটি অক্ষিকোটর
মূর্ত সে জন্মভূমি।

[ওভারব্রিজে ক্যাকটাস : আল মুজাহিদী]

viii. সজীব গাউন পরা অই গাছগুলো কী রগড় করে যে

www.pathagar.com

হাওয়ার সাথে প্রতিদিন।

সবুজ পাতার মুদ্রা তুলে তুলে নাচে, বক্ষোবাস খুলে খুলে নাচে

নিপুণ নটীর সহোদরা।

সকালে কাঠের খোপ থেকে বের হয় মুরগীগুলো

যখোন শস্যকণা খোঁজে,

কাক ও চড়ুই চঞ্চু দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে আনে

টাটকা সুগন্ধী ভোর;

[গাছগুলো : আবুল হাসান]

অসাধারণ চাঞ্চল্য, জীবন সচেতনতা, বক্তব্যের সচল গতিধারায় সে সব কবিতা প্রসবিত হয়ে থাকে তা অনেকটা ঘোরের মাঝে সৃষ্টি হয়। এক ধরনের স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিবেশে কবি নিজেকে উপস্থিত করার পরই কেবল সম্ভব মহৎ কবিতা রচনার। যা কালের সীমানা ডিঙিয়ে মহাকালের জন্য গ্রথিত হয়ে থাকে।

এবং একথা চরমতম সত্য, কোনো কবিকে বিচার করতে চাইলে তাঁর আদর্শ দ্বারাই তাকে শনাক্ত করতে হবে। নিরূপণ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে। যে ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় তাঁর বক্তব্য মূর্ত হয়েছে, যে আশ্বাসে তাঁর মননশীলতা পরিপুষ্ট হয়েছে, যে জীবন বোধের পরিধিতে তাঁর কাব্যের উদগম, তাঁর কাব্যবিচার এগুলোর নিরিখেই হবে। আদর্শ কবির থাকে একটিই। ভাষা আর শব্দের উপাদান এবং কল্পনার প্লট। যে কবির কবিতায় সন্ধ্যার রক্তিম সূর্যালোক বিজলির আদলে জ্বলে ওঠে তিনি যথার্থ সংবেদনশীল কবি। আর এক্ষেত্রে যে কবির ভাষা যত সহজ ও সাবলীল তিনি ততোটাই প্রাণময় ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নিজস্ব বক্তব্য। কবিরা কল্পলোকবাসী কিন্তু ধরণীতেই তার বিকাশ অধিষ্ঠান। আর তাই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অন্তরের অনুভূতির যৌথ নির্মাণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবির ভাষা যদিও আত্মগোপন করে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে। তারপরও রহস্যের গূঢ় আবরণ উন্মোচন না করে যে কবি যত দ্বিধাহীন সত্তায় কল্পনার মাঝে ভেসে যান তাঁর ভাষা আমরা ততোটাই উজ্জীবিত স্বরে পাই। এবং সে কবিই কল্পনার সত্য পৃথিবীটাকে বয়ে বেড়ান নিজস্ব মোহন ইন্দ্রজাল বেষ্টিত অচিন্ত্যনীয় এক ভূ-লোকে। সাধারণ মানুষের ভাষা যেখানে স্পর্শ করে না। সাধারণ মানুষের চিন্তাস্তর যে উচ্চতায় উঠতে পারে না কবির চিন্তা, চেতনার স্তর অবলীলায় সে আসনে সমাসীন। কারণ তাঁর অনুভূতি সৌন্দর্যহেতু।

যাযাবর সময় ও কবিতার বাক ঃ কবিসত্তা সময়ের উর্মিতালে নিজেকে জড়ায়ে নেন।

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিক কিংবা প্রেক্ষাপট তৈরির মঞ্চে আবেগের ঘুড়ি উড়তে থাকে অনেক উঁচুতে। এ সময় যা কিছু বোধের দরোজায় কড়া নাড়ে তাই প্রসবিত হয়। মানুষ এগিয়ে যায় সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে। আর কবি এগিয়ে যায় মেধার সাথে সময়, পরিবেশ এবং চাকার সমন্বয় ঘটিয়ে। এই সমন্বয় সাধনের যে কবি যত বেশি পারঙ্গমতা প্রদর্শন করবে, তিনি ততোটা সফল এবং তাঁর কবিতার নির্মাণশৈলী ততোটাই ঋদ্ধ। কবিতায় যে অভিজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট হয়, তা একই সঙ্গে এক মহূর্তের এবং চিরকালের। মানব জীবনের যে কোন প্রগাঢ় অনুভূতির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। প্রথম মুহূর্তে এ অনুভূতিকে মনে হয় অনবদ্য এক বিষয়। কারণ কবি জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে অনুভূতিময় পংক্তিমালা আবিষ্কার করেন।

আমরা এ পৃথিবীতে প্রকৃতি, ঘটনা, ইতিহাস বা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করি। আমাদের একাকী কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের চিন্তা ও আমাদের মানসলোকে বিভিন্ন সম্পর্কের বিচিত্র প্রতিবিম্ব। কণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনি, দৃষ্টিতে গৃহীত চিত্রছায়া, চিন্তার জন্য চিত্তে স্মৃতির অবলম্বন- আমাদের সঙ্গে ধরিত্রির বিভিন্ন সম্পর্কেরই বিকাশ। একজন প্রকৃত কবি যিনি, তিনি এ সত্য সর্ব মুহূর্তেই উপলব্ধি করেন। এ জীবনে আমাদের যা কিছু জ্ঞানার্জন তা আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কেরই সঞ্চয়। প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক তাতে আমরা পাই নিশ্বাস, আলো, তাপ এবং স্নায়ুর সজীবতা; মানুষের সাথে যে সম্পর্ক তাতে আমরা পাই মমতার উচ্চারণ এবং ইতিহাসের সাথে সে সম্পর্ক তাতে আমরা পাই বুদ্ধি, চিন্তা এবং যুক্তি। আমাদের প্রতিদিনের কর্ম, এ সকল সম্পর্কের উপলব্ধিতে নিয়ন্ত্রিত। এ সকল সম্পর্কের উপলব্ধি কবি প্রকাশ করেন নিজ ভাষার সু-শৈলতে।

i. তুমিতো মায়াবী শিল্প! সহিষ্ণু বৃক্ষের গাঢ়

হরিৎ শ্যামল ছায়া কারো আঙিনায়

ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রে কি খরায় সারাক্ষণ পল্লবিত

ক্লোরোফিলে শুদ্ধ করো পাপদগ্ধ, সংসার সভ্যতা।

আমি শ্বাসকষ্টে আছি অক্সিজেনহীন;

সারাক্ষণ বৃক্ষের প্রতিমা চেতনায়

আমাকে জাগিয়ে রাখে কল্পনা-শ্যামল ছায়া

আমি জল ঢালি তারই ছায়ার আশায়

[কল্পনা শ্যামল ছায়া : নাসির আহমেদ]

www.pathagar.com

ii. নদী ছাড়ছে, সিটি বাজছে হাওয়ায়
বরফ কন্যারা গেছে সমুদ্র ভ্রমণে
টিকিট চেকার মেঘ তাড়া দিলে
ন'ড়ে বসে ঢেউ যাত্রীগণ
ও নদী ও মাটি সহোদরা
আমার টিকিট নেই, আমাকে নেবে না?

[নদী, মেঘ ও ঢেউ যাত্রীগণ : আবু হাসান শাহরিয়ার]

iii. মানুষ এভাবেই শরীর ফেলে রাখে
নিকট-আত্মীয় দু'হাত মেলে ডাকে
স্মৃতির ভাঁজ খোলে- কি কলরব ছিলো
একটু আগে যার- পরনে সব ছিলো
বিছানা আলমিরা কাপড় কতো তার
রয়েছে স্মৃতি পড়ে হাজার সততার।

[যে আমি চলে যাব : সালেম সুলেরী]

iv. তর আল্লার কসম লাগে, ন্যাকামি করিস না
রূপচান্দার মতো তর শরীর দ্যাখ ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁকে
চান দ্যাখার মতো আমাকে দ্যাখে
শুধু তুই দেখিস না:

[লোকজপ্রেম: জাকির ইবনে সোলায়মান]

v. দেহের ভিতরে বসবাস করে
অন্য দেহে গড়ো নিসর্গ নগর
তবুও তোমার ঘরে চুপচাপ সুর তোলে
ঘুণ পোকা আর যত সাপুড়ে দোসর।

[বাস্তু সাপের গৃহস্থালি : শান্তা মারিয়া]

www.pathagar.com

vi. এই দেশে একদিন
রূপালি সোমও নদী ছিল
হারানো সে সব স্মৃতি হাঁসেদের ব্যথিত করেনা
দুঃখ শুধু স্মৃতিচারী মানুষের
যারা ত্রস্তপায়ে বয়ে নিয়ে যায়
পাটিবদ্ধ হাঁসদের ঠ্যাঙের গ্রন্থিল গোছা।

[হাঁসদের সুখ-দুঃখ : জামাল উদ্দিন বারী]

vii. মধ্যরাতে আলোড়িত করে অনায়াসে বলে যেতে
কীভাবে কেটেছে দিন, কতোটা উল্লাসমুখর
কতটুকু বেদনায় শীর্ণ হয়ে যাওয়া স্রোতবাহী মন
শুধু আমাকেই বলতে যদি
এই বোধগুলো এখনও বলিনি যেন
এই সাধগুলো কখনো উড়বে না আকাশে
মকর রাশিতে লেখা আছে তার- প্রেমিক ভাগ্য খুব বেশি।

[মকর রাশির মেয়ে : শাকিল রিয়াজ]

viii. যে শহরে আমি নেই, তুমি তাকে বোলো না শহর।
দোহাই আইউব নবীর, সুরে ভেজা গলার দোহাই;
যে শহরে আমি নেই, তুমি তাকে বোলো না শহর

[যে শহরে আমি নেই : আল হাফিজ]

ix. শীত ছিলো তো গত বছর- শীতের কথা বলি
হাতের মুঠোয় কুড়িয়েছিলাম ছোট্ট শহরতলি

শহরতলির স্মৃতি মানেই বাঁধিয়ে রাখা ছবি
এক বছরেই বুড়ো হলাম- আজ শহরের কবি

www.pathagar.com

কবির কথা? কথা তো নয়, মৌনব্রত বাড়ি

জায়নামাজে চেয়েছিলাম একটি নিভাজ শাড়ি

[বন পলাশের পদাবলী : টোকন ঠাকুর]

x. কফি কাপ থেকে উঠছে ধোঁয়া

কইলাম কি পুড়ছে ভাবী?

মোহাম্মদপুর থেকে পেশোয়ার

[কফি কাপ : ফাহিম ফিরোজ]

xi. উড়তে যেয়োনা! কতটুকু জানো?

তারাদের ঘর কাছাকাছি মানো?

ই-মেইল দিন অথবা তড়িৎ

এতটুকু গোল ফরসা হরিৎ

মেয়ে কাঁদে একা।

[মেয়ে কাঁদে একা : জুনান নাশিত]

xii. আমাদের স্বপ্ন ছিলো হিমায়িত মাছের মতন।

আপনারা সৈয়দ হোসেন ঝিল চিনেন কেউ?

এখানে একটি মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে সে

সবুজ গেটের কাছে প্রতিক্ষায় থাকুন–

[একটি মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে : নয়ন আহমেদ]

xiii. দৃশ্যের আদর মাখা আঙ্গুলে অদৃশ্যের মায়া?

নাকি আবার লতাগুল্ম জড়িয়ে ধরবে আমায়

আবার হবে দেখা এক কৃষ্ণনয়ন গ্রামের সাথে?

যেখানে হাঁটতে হাঁটতে তুমি এক গ্রাম হয়ে যাও

হয়ে যাও মহাস্থান গড়ের প্রত্নতত্ত্বের ধূসর ইমারত।

[ইতিহাসের সখি : কামাল আহসান)

www.pathagar.com

কবির ভাষা এবং প্রকাশ ভঙ্গিমা ঃ আমেরিকার কবি হুইটম্যান কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন- 'কবি শুধু সুন্দর সুসংবদ্ধ কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হবেন না; তিনি হবেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, দূরদর্শী, চারণ ও নীতিবাদী। অবশ্য নীতিবাদী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি ন্যায়নিষ্ঠা এবং সাধুতার বাণী মাত্র প্রচার করবেন। তিনি নীতিবাদকে প্রশ্রয় দেবেন 'প্রচারণা'র ক্ষেত্রে, হুইটম্যানের প্রিয় কথায়- ভবিষ্যৎ ও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। কবির লক্ষ্য হবে দাসত্ব জর্জর যারা তাদেরকে আনন্দিত করা এবং তাদেরকে শঙ্কিত করা যারা স্বেচ্ছাচারী। তিনি আধ্যাত্ম গুরুর পদও অলংকৃত করবেন। কেননা ধর্মের যুগ অতীত হয়েছে; এক্ষেত্রে কবিকেই ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। মানসিক ও দৈহিক স্বাভাবিকতায় তিনি নিজেকে পূর্ণতম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। 'মানব জাতির মধ্যে মহৎ কবি সুষম মানুষ। তাঁর মধ্যে নয়, বরং তাঁর বাইরের সকল বস্তু অদ্ভুত, ঔৎকেন্দ্রিক বা কাণ্ডজ্ঞানহীন। ----তিনিই বিভিন্নতার মধ্যে সমতা বিধায়ক এবং তিনিই মূল কুঞ্জিকা।' কবি তাঁর সমাজেরও প্রবক্তা। তাঁর বাণী শুধু ব্যক্তির নয়– সমগ্র জাতির। তিনি ভৌগোলিক পরিবেশ, জীবনযাত্রা, নদ-নদী ও হ্রদের নব রূপকার। বরং তার চাইতেও বেশি। 'দৃশ্যমান জগতের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা উপলব্ধির মাধ্যমে' তিনি সনাতন উপকথা ও গতানুগতিক কাব্যধারাকে পরিমার্জিত করে 'ভাবীকালের দৃঢ় ও শোভন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।' এর দ্বারা তিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বদেশী চিন্তার মৌলিক আদর্শ স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা এবং এমন এক ভাবজগতের সন্ধান দেন, যা সম্পূর্ণ নতুন ও অজ্ঞাত সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে থাকে। একজন কবিত তাঁর কবিতায় জীবনের কোনও সত্যকে অস্বীকার করেন না; কিন্তু তিনি 'বাস্তববাদী' নন। তাঁর কাব্য সর্বাতিক্রমী ও নবীন এবং তা বর্ণনাত্মক, বীররসাত্মক বা প্রত্যক্ষ না হয়ে হবে পরোক্ষ।' কবিতার গঠন ও নির্মাণশৈলী হবে সহজাত এবং গুল্মশীর্ষে প্রস্ফুটিত অনবদ্য ও নিখুঁত গোলাপ বা লাইলাক পুষ্পের তুল্য মুক্তছন্দের অনুপ্রকাশক। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানবজীবন বিষয়ে অক্ষয় মমত্ববোধ যে কবি হৃদয়ে লালন করেন, তিনিই বিজয়ীর বেশে ভাষাগত বন্দনা গাইতে পারেন। অগ্রজদের ভাষা ও নির্মাণের দরোজায় কড়া নেড়ে অনুজ সম্প্রদায়ও গাইতে থাকে নতুন গান, ওড়ায় নতুন পতাকা। সংগ্রামের পথে সৃষ্টি ও আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হয় কবির নব প্রকাশ ভঙ্গিমা।

i. আমাকে বিশ্বাস করো বা না করো
আমি এক অবিরাম বার্তা বাহনের গীতি,
মানুষের আত্মীয় এবং পাখির সজন।

www.pathagar.com

দ্যুতির জারণ থেকে পুঁথিঘর ভাঙি, মদিনা সনদ
খুঁড়ে অনায়াস তুলে আনি ম্যাগনাকার্টার
নব ইতিহাস, অনার্য রক্তের মৌল রঙ।

[ফেনায়িত দীর্ঘশ্বাসে আমি সহস্র বর্ষের জ্ঞাতি : খৈয়াম কাদের]

ii. বিস্তৃত মাঠের সরু সিঁথিতে দাঁড়িয়ে
মাতাল দোলায় দোলে এক বধূমন
সারা গায়ে মাখে মাঠের উল্লাস
মৃতগাছে নেচে ওঠে ক্লোরফিল
ওড়ে প্রজাপতি ডানা
ভেসে যায় রাজহাঁস।

[ফসল : ফাতিমা তামান্না]

শেষ কথা ঃ শব্দের অর্থ কবিরা নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার করেন। ভাষাকে একজন কবি জাতির চৈতন্যোদয়ের কুশল সম্ভাষণ বলে মনে করে। কবি ভাষাকে বের করে আনেন বোধের গোপন কুঠুরি থেকে। আর এ কারণেই অনেক সময় কবিতাকে নিছক আবরণের মত মনে হয়, যেন তা বর্ণিত একটি বিষয়ের আচ্ছাদন, কিন্তু আচ্ছাদনও দেহকে সুষম মাধুর্যে উদঘাটিত করে, আচ্ছাদনেরও বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে এবং আচ্ছাদনও দেহকে স্বীকার করেই মূল্যবান, কবিকে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে আবরণের চাপে বিষয়টি বিকৃত না হয়, অর্থাৎ আবরণ যেন বিষয় বা দেহের সত্যকে বহন করে। আবরণ আকর্ষণ করবে, আমন্ত্রণ জানাবে একটি আবেগের চর্চায়। যেভাবে নববধূ সুসজ্জিতা হয়ে একটি স্পর্শের অপেক্ষায় থাকে, তেমনি কবিতা তার ছন্দ ও ধ্বনির আচ্ছাদ নিয়ে পাঠকের বিশ্বাস ও আনন্দের স্পর্শ কামনায় আকুল থাকে। ছন্দ ও ধ্বনিকে ধারণ করেও অনেক সময় গদ্যের ভাষায় কবিতা কথা বলে পাঠকের সাথে। যা তাঁর একান্ত নিজস্ব ফর্ম বা স্টাইল। এইভাবেই কবিতার ভাষা যুগে-যুগে প্রতিবারে রচিত হয়, এবং প্রসবিত কবিতা পাঠকের আঙিনায় উপস্থিত হয়ে সলাজ ভঙিমায় দাঁড়িয়ে থাকে অষ্টাদশী সুন্দরীর ন্যায়,

www.pathagar.com

জীবনানন্দের ভাষায়–

'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন

সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন'

(বনলতাসেন : জীবনানন্দ দাশ)

www.pathagar.com

www.pathagar.com